ব ঙ্কি ম সা হি ত্য

বঙ্কিমসাহিত্য

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

এম্. এ., পি. আর. এস্., পি. এইচ্. ডি.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিভাগ

বিশ্বভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক

শ্রীতপনকুমার ঘোষ

সাহিত্যশ্রী

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ

অজয় গুপ্ত

প্রকাশ

বৈশাখ ১৩৫৮

এপ্রিল ১৯৫১

মুদ্রক

শ্রীদিলীপকুমার দে

দে প্রিণ্টার্স

১৫৭ বি, মস্‌জিদ বাড়ি স্ট্রীট

কলকাতা ৬

সম্পাদক-

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দের

যথার্থ উত্তরসাধক

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের অবিসংবাদিত কর্ণধার

কর্মযোগী প্রবাদপুরুষ

শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ

শ্রদ্ধাভাজনেষু

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৫৮

প্রস্তাবনা

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আমার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৪৪ সালে। তারপরে দীর্ঘ প্রায় সার্ধদশক কাল অতিবাহিত হল। এই সময়পর্বের মধ্যে বঙ্কিমবিষয়ে আমার রচিত দুটি গ্রন্থ এবং সম্পাদিত আরো দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আমার পঞ্চম পুস্তক।

দিনের পর দিন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে হারিয়ে যাওয়া তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ভারতের জাতীয় সংগীতের স্রষ্টা, বঙ্গীয় সাহিত্যকুলগুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দশখানি ফোটো-চিত্রও আজ আমাদের হাতে নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান ঘটেছে কবে? ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেত্রিশ। এই কাল-পর্বের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কত অজস্র ছবি আমরা পেয়েছি, তাঁর নানাবিধ রচনার কত বিচিত্র পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে; কিন্তু দুর্ভাগ্য, দু-চারখানির বেশি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি-চিত্র আমাদের দেশে আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না— তাঁর পাণ্ডুলিপি, বইয়ের প্রেসকাপি বা সংশোধিত প্রুফ ইত্যাদি তো দূরের কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান এবং ব্যাপক গবেষণার যে প্রয়োজন আছে— একথা আমরা এখন সকলেই অনুভব করি।

রবীন্দ্রনাথের জন্য বিশ্বভারতী আছে, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা আছে, রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসমূহ ও তাঁর রচনাবলী সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের জন্য কলকাতায় গ্রন্থনবিভাগ আছে; তাছাড়াও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি আরও কত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা রয়েছে। অপরদিকে জাতীয় মন্ত্রের উদ্গাতা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য কি দেশবাসীর পক্ষ থেকে কিছুই করবার নেই?

আজ এ-কথা আমাদের স্পষ্টভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বঙ্গভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব না ঘটলে বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবেশ এত ত্বরান্বিত হত না কখনই।

রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে। 'আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোনো কালে বিস্মৃত না হন। বঙ্কিমের প্রতিভা যদি আমাদের পথ খনন করিয়া না দিত তবে আমরা এতদিনে শিশুপাঠ গ্রন্থের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় ভাগ শেষ করিয়া বড়োজোর চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ভাগে গিয়া উপনীত হইতাম। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইত না। আজ আমাদের কোনো লেখা যদি বয়স্ক লোকের পাঠযোগ্য, শিক্ষিত লোকের সমাদরযোগ্য, বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদযোগ্য হইয়া থাকে, কোনো রচনার একটি অংশও যদি সর্বদেশে ও সর্বকালে স্থায়ী হইবার উপযোগী সুসম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া থাকে, তাহা অনেকটা পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসাদে।'

আর সার্ধ দশকের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর শততম বর্ষ পূর্ণ হবে। তাঁর তিরোধানের পর দীর্ঘ চুরাশি বৎসর কাল অতিক্রান্ত হল— আজও পর্যন্ত বঙ্গদেশে কোনো বঙ্কিমচর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠল না, তাঁর সমগ্র রচনা সংগ্রহ করে—প্রতিটি গ্রন্থের সকল সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করে অদ্যাবধি প্রকাশিত হল না একটি আদর্শ প্রামাণিক বঙ্কিমরচনাবলী।

এ-প্রসঙ্গে আচার্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের অভিমত উদ্ধারযোগ্য। মৎসম্পাদিত 'বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সাহিত্য সমালোচনা : দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'বঙ্গদর্শন প্রকাশের পরে এক শতকের অধিক কাল চলে গেল, কিন্তু আজও বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা একত্র সংকলিত হল না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বঙ্কিমরচনাবলীর যে শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশ করেছেন, তাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনা, বিশেষত তাঁর সমালোচনা-প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয় নি।'

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য বিষয়ে মৎপ্রণীত কয়েকটি প্রবন্ধের সংগ্রহ বর্তমান গ্রন্থ। এর মধ্যে অধিকাংশ রচনা সাময়িকপত্রে মুদ্রিত, দু-একটি প্রস্তাব এখানেই প্রথম প্রকাশ করা হল। সাময়িকপত্রে ইতঃপূর্বে প্রকাশিত এই বিষয়ক কোনো কোনো প্রবন্ধ নানা কারণে এই গ্রন্থে গ্রহণ করিনি। প্রবন্ধ ছাড়া বর্তমান পুস্তকে সংকলিত হয়েছে তিনটি তথ্যপঞ্জী। ক. বঙ্গদর্শনে সমালোচিত পুস্তক ও সাময়িক-পত্রের তালিকা, খ. সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাপঞ্জী, এবং গ. বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জী।

ইতঃপূর্বে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন' গ্রন্থে সমগ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ রচনাপঞ্জী সংকলিত হয়েছিল। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রায় প্রতিমাসে গ্রন্থসমালোচনা বিভাগে

তৎকালীন কত অজস্র গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার ছোট বড় সমালোচনা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের উক্তি, 'বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোক যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে, অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এক দিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন, আর-এক দিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।' বঙ্গদর্শনে সমালোচিত সকল গ্রন্থই যে ছিল বঙ্কিমের নিকট মূল্যহীন—শুধু ধূলি শুধ ছাই— তা নয়। অনেক গ্রন্থই সম্পাদক কর্তৃক সবিশেষ প্রশংসিত হয়েছে এবং অনেক নবীন লেখককে সাদরে বরণ করা হয়েছে। গ্রন্থসমালোচনা বিভাগে প্রকাশের কাল অনুসারে বঙ্গদর্শনে সমালোচিত পুস্তক ও সাময়িকপত্রের তালিকা প্রস্তুত হল।

সংবাদ প্রভাকর, সমাচার দর্পণ, ক্যালকাটা রিভিউ, মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন, বঙ্গদর্শন, সাধারণী, ভ্রমর, প্রচার, নবজীবন প্রভৃতি পুরাতন পত্রপত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হত। প্রতি মাসে কোন্ কোন্ পত্রিকায় তিনি কি কি রচনা লিখেছেন তারই বিস্তারিত নির্দেশ আছে— সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাপঞ্জীতে। সাময়িকপত্র ব্যতীত অপর কোনো কোনো সংগ্রহে তাঁর কয়েকটি রচনা মুদ্রিত হয়; সেগুলিও এই তালিকার মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জীতে বৎসরের ক্রম অনুসারে নির্দেশ করা হয়েছে— প্রতি বৎসরে তাঁর কোন্ কোন্ গ্রন্থের সূচনা ঘটেছে সাময়িকপত্রে, গ্রন্থাকারে কি কি গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে এবং সেই বৎসরে তাঁর অপর কোন্ কোন্ পুস্তকের কোন্ কোন্ সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর দুটি একটি গ্রন্থের কোনো কোনো সংস্করণের প্রকাশ কাল জানা যায় নি।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমার পূজনীয় শিক্ষাগুরু শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে একটি চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন, 'নতুন কোনো কাজে হাত দিয়েছ কি? ভালো কথা, বঙ্কিমের একখানি ভালো জীবনী লেখ না কেন? শচীশ চাটুজ্যে ছাড়া আর কেউ তো লেখেননি— যদিও যথেষ্ট উপকরণ রয়েছে। এ সম্বন্ধে তোমাকেই যোগ্য বলে মনে করি।' বস্তুতপক্ষে অধ্যাপক মহাশয়ের পত্র পেয়ে সেদিনই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী রচনার কাজে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলাম— কি

সাধ্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও ; যেহেতু শিক্ষাগুরুর আদেশ আমার পক্ষে একান্তই অলঙ্ঘনীয়। নিজের ক্ষুদ্র শক্তিকে সম্বল করে ধীরে ধীরে সে-কাজে অগ্রসর হয়ে চলেছি— জানি না কবে সম্পূর্ণ হবে। যোগ্যতর কোনো লেখক কর্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রামাণিক জীবনী যদি কখনো রচিত হয় তবে বঙ্কিমবিদ্যার পথ যে অধিকতর প্রশস্ত ও সুগম হবে, বঙ্কিম-গবেষণা ও অনুশীলনের কাজ যে ব্যাপকতর ও সমৃদ্ধতর হবে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বর্তমান গ্রন্থের পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত রজনী উপন্যাসের আদি পাঠ সংযোজিত হল। রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিক মুদ্রিত হয়েছিল। পরে প্রায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে রজনী যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমের ভাষায় তা এক 'নূতন গ্রন্থ'। অদ্যাবধি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রজনী উপন্যাসের প্রথম পাঠ পুরাতন বঙ্গদর্শনের ফাইল থেকে শতবর্ষকাল পর এই প্রথম উদ্ধার করা হল। আমার সম্পাদনায় রচনাটি শ্রীরমাপদ চৌধুরীর আনুকূল্যে ১৩৮৪ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, এখন বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হল।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণাকর্মে লেখককে সর্বদা উপদেশ ও প্রেরণা দিয়েছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমচর্চায় আমাকে সতত প্রোৎসাহিত করেছেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভূদেব চৌধুরী, শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীজীবেন্দ্র সিংহরায় ও শ্রীগোপিকানাথ রায়চৌধুরীর সঙ্গে নানা সময়ে আলাপ-আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। গ্রন্থরচনার বিভিন্ন পর্বে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী অপর্ণা ভট্টাচার্য ও কল্যাণীয়া সূর্যাণী। মুদ্রণকার্য পরীক্ষায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন আমার পরম স্নেহের কৃতী ছাত্রী শ্রীমতী শুভ্রন্তী পাল। 'সাহিত্যশ্রী' কর্তৃপক্ষের আগ্রহ যত্ন ও তৎপরতায় এই গ্রন্থ সুচারুরূপে প্রকাশিত হল।

অ. ভ.

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

ব ঙ্কি ম সা হি ত্য

১

বাল্যরচনা ঃ গদ্য

বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশবকালের গদ্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা—সে ভাষা 'অত্যন্ত আড়ষ্ট' 'অপাঠ্য' ও 'বিষম'। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় বলা হয়েছে, 'আদিপর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা যদি বা পড়া যাইত, তাঁহার গদ্য ছিল অপাঠ্য বিষম।' রবীন্দ্রনাথও এই মনোভাব পোষণ করেছিলেন। বাংলা-ভাষা-পরিচয় গ্রন্থে লিখেছেন, 'ঈশ্বর গুপ্তের আমলে বঙ্কিমের কলমে যে গদ্য দেখা দিয়েছিল তাতে যতটা ছিল পিণ্ডতা, আকৃতি ততটা ছিল না। যেন ময়দা নিয়ে তাল পাকানো হচ্ছিল, লুচি বেলা হয় নি।'

বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশবপর্বের গদ্যরচনা সম্বন্ধে এরূপ ধারণা ও মন্তব্য সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি না।

সংবাদ প্রভাকর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের দুটি গদ্য রচনা উদ্ধার করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সেই রচনা দুটি সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণের বঙ্কিম রচনাবলীর 'বিবিধ' খণ্ডে সংকলিত হয়। আমরা সাধারণভাবে বঙ্কিমের শৈশব-কালের গদ্য বলতে এই দুটি রচনাকেই বুঝে থাকি। দুটি রচনাই ক্ষুদ্র; একটির প্রকাশ ২৩ এপ্রিল, অপরটি ১০ জুলাই—১৮৫২।

২৩ এপ্রিলের রচনার থেকে অংশবিশেষ[১] উদ্ধৃত করে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় বলা হয়েছে, 'কপালকুণ্ডলা, কমলাকান্ত, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম লেখকের উপরোক্ত রচনা আজিকার দিনে আমাদের ভীতি ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।'

রবীন্দ্রনাথও একই সূত্র থেকে সংবাদ প্রভাকরে মুদ্রিত বঙ্কিমের ২৩ এপ্রিলের

১ যে লপনেন্দু শতং শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দম মণ্ডিত হওত মৃন্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অণুরেণু অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক।

রচনার কিয়দংশ[২] উদ্ধৃত করলেন তাঁর গ্রন্থে। উদ্ধৃতি শেষ হলে কবি বললেন, 'আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি ঈশ্বর গুপ্তের আসরে প্রথম হাত পাকাচ্ছিলেন অত্যন্ত আড়ষ্ট বাংলা ভাষায়, সেই ভাষারই বন্ধন মোচন করেছিলেন সেই বঙ্কিম। তিনিই তাকে দিয়েছিলেন চলবার স্বাধীনতা।'

আমরা এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালে রচিত যে-ক'টি গদ্য-নিদর্শন উদ্ধার করব তার মধ্যে দুটি ২৩ এপ্রিলেরও পূর্ববর্তী। আমার দৃঢ় ধারণা রবীন্দ্রনাথের হাতে বঙ্কিমের এই রচনাগুলি থাকলে বঙ্কিমের বাল্যরচনা সম্পর্কে কবি তাঁর ব্যক্ত মন্তব্যের অবশ্যই পরিবর্তন করতেন।

পাঠক লক্ষ্য করবেন, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে উদ্ধৃত বঙ্কিমরচনা এবং নিম্নে উদ্ধৃত বঙ্কিমের গদ্যরীতির মধ্যে প্রভেদের পরিমাণ কতখানি। স্টাইল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। আমরা বঙ্কিমের যে-লেখাটির কথা উল্লেখ করছি সেটি একটি চিঠি, সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তকে লিখিত বালক বঙ্কিমচন্দ্রের পত্র। চতুর্দশবর্ষীয় বালক বঙ্কিম, কিন্তু পত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য প্রকাশ।

এই পত্রটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—'বিরলে বাস' নামে বঙ্কিমের একটি কবিতা ২৮ ফেব্রুঅরি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সমাচার দর্পণ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। সম্ভবত কবিতাটি বঙ্কিম প্রথমে সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সম্পাদক সেটি প্রকাশ করেন নি। তখন বঙ্কিম কবিতাটি সমাচার দর্পণে পাঠান। সমাচার দর্পণে তা প্রকাশিত হয়। (কবিতার শীর্ষে যে গদ্য অংশ মুদ্রিত হয় সেটিকেই বঙ্কিমচন্দ্রের আদি গদ্য-নিদর্শন[৩] হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।) সমাচার দর্পণে বঙ্কিমের কবিতায় অনেকগুলি ছাপার ভুল থেকে যায়। কিংবা সেটা সম্পাদকের ইচ্ছাকৃত পরিবর্তনও হতে পারে। এতে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ রুষ্ট হয়ে আবার সংবাদ প্রভাকর সম্পাদককে পত্র লেখেন। এই পত্র ১০ মার্চ ১৮৫২ সংবাদ প্রভাকরে মুদ্রিত হয়। পত্রটি উদ্ধৃত হল—

'শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ অত্র অকিঞ্চন মূঢ়তা প্রযুক্ত তল্লিখিত পত্রে প্রেরিত পত্রাদি অপ্রকাশ

২ গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পা সঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিম্বুপম জীবনে চন্দ্রার্ক সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে সে সব উৎসব শব হইলে কি হইবে।

৩ শ্রীযুক্ত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু। অনুগ্রহ পূর্বক আমার কএক পংক্তি

'বিষয়ে কিঞ্চিৎ রূঢ় ভাষা প্রয়োগ হইয়াছিল, এইক্ষণে কৃতাপরাধী দয়াবীর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। পত্র প্রকাশেই সন্তুষ্ট থাকিবেক।

সংপ্রতি সমাচার দর্পণ সম্পাদক মহাশয় আমার বিস্তর হানি করিয়াছেন। মহাশয়ের আশ্রয়ে তদ্বিপক্ষে লেখনী ধারণ করিতেছি অনুকম্পা সম্পাদনে আশ্রয় প্রদান করিবেন, অর্থাৎ নিম্নলিখিত বিষয় প্রভাকরে প্রকটনে পরম বাধিত করিবেন।

দর্পণ

'দর্পণ পারাহারা হইলে' কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব সুন্দররূপে দৃষ্ট হয় না।

'শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'* [পাদটীকায় তারকাচিহ্ন দিয়ে লেখা 'My own name'] অস্মন্নাম ইত্যঙ্কিত মৎকরণক অনুবাদিত বিষয় ৪৪ সংখ্যক দর্পণে প্রকটিত হইয়াছিল। সম্পাদক সাহেবের সংশোধনের গুণেই হউক বা মুদ্রাঙ্কনের দোষেই হউক, সেই অনুবাদের উল্টা শ্রী হইয়াছে, তাহা পাঠমাত্র দন্তে কপাট লাগিবেক, আর অন্য পাঠ থাকিবেক না।

দর্পণের ৩৫২ পৃষ্ঠায় চতুর্থ স্তম্ভে তাহার প্রথম চরণ নিম্ন প্রকার প্রকাশ হইয়াছে।

বিষয়ে রিক্ত হয়া স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে।

সম্পাদক মহাশয় আপনি ও পাঠক সুপণ্ডিত বটেন, ইহার অর্থ কি বলিতে পারি না, আপনারা কহিবেন যে ইহা প্রকৃত nonsense আরো ত্রয়োদশ অক্ষরে পয়ার কখন শুনিয়াছেন? আমি প্রথম চরণে লিখিয়াছিলাম।

বিষয়ে বিরক্ত হয়ে স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে॥

কিসে কি হইয়াছে 'দেব গঠিতে বানর' হইয়াছে।

অপিচ নবম পংক্তিতে।

অভিমানেতে জন্মে, যে প্রশংসা বায়।

ত্রয়োদশাক্ষরে পয়ার। আরো honour অর্থ কি অভিমান। এবং অভিমানে কি প্রশংসা জন্মায়? আমি লিখিয়াছিলাম।

তুচ্ছমান হতে জন্মে, যে প্রশংসা বায়।

ভাল। ভাল!

অন্যান্য সামান্য দোষের তালিকা ৪ পংক্তিতে 'মহাপ্রেম' পরিবর্তে 'নিত্যপ্রেম' হইবেক।

১০ পংক্তিতে 'মলয়াতে' হইবেক। ১১ পংক্তিতে 'পুষ্প' পরিবর্তে 'পুষ্পে' হইবেক।

অতএব দর্পণ সম্পাদককে অনুরোধ করি যে আগত সংখ্যায় ভ্রম সংশোধন করিবেন এবং ভবিষ্যতে এই প্রকার না হয় এমত···বেন ইতি।'

চিঠির এই গদ্য দুর্গেশনন্দিনী রচয়িতার নয়; বরং বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত্র, সাম্য যাঁর রচনা, এ ভাষা সেই বঙ্কিমের বাল্যবয়সের নিদর্শন।

বঙ্কিম সংবাদ প্রভাকরে যে-দুটি গদ্যরচনা লিখেছিলেন তা রীতিমত সংস্কৃতানুকারী, কৃত্রিম এবং আড়ষ্ট। কিন্তু আমার বক্তব্য, এ দুটি রচনায় যে গদ্য প্রকাশ পেয়েছে, তা বঙ্কিমের তৎকালের স্বাভাবিক গদ্য নয়। বিশেষ কোনো কারণে বঙ্কিমকে ওইরূপ কৃত্রিম ভাষায় দুটি ক্ষুদ্র রচনা লিখতে হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমের তখন নবীন বয়স, চতুর্দশবর্ষীয় বালক, অন্তরে সাহিত্য রচনার জন্য গভীর ব্যাকুলতা। উল্লেখযোগ্য পত্রিকা দুটি—সংবাদ প্রভাকর ও সমাচার দর্পণ। সম্পাদকেরা সকলের সব লেখা ছাপান না। বঙ্কিমের একটি কবিতা ১৮৫২-র ২৫ ফেব্রুঅরি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হল, আবার সেই সঙ্গে একটি কবিতা অমনোনীত হল। সমাচার দর্পণ কবিতা ছাপাল, কিন্তু মূলের সঙ্গে মিল রইল না। এ অবস্থায় বালক লেখকের স্বাধীনভাবে সাহিত্যচর্চায় অবশ্যই কিছু অসুবিধা ছিল। হয়তো পাঠকের রুচির দিকে তাকাতে হয়েছে, হয়তো প্রচলিত রচনারীতির সঙ্গে নিজেকে, চেষ্টাকৃতভাবে মানিয়ে নিতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে বঙ্কিমের হাতে সে বয়সে যে গদ্য এসেছিল সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত উক্ত রচনা দুটি সেই গদ্যে রচিত নয়। ওটা নিতান্তই একটা experiment-এর ব্যাপার বলে মনে হয়। এই দুটি রচনায় ঈশ্বর গুপ্তেরও কোনো প্রভাব আছে বলে মনে করি না। অর্থাৎ ওই রচনারীতির জন্য ঈশ্বর গুপ্তের আমলকে বিশেষভাবে দায়ী করার যুক্তিসংগত কারণ নেই। ২৩ এপ্রিল বঙ্কিমের গদ্য রচনা প্রকাশিত হলে, রচনার নীচে ঈশ্বর গুপ্ত মন্তব্য লেখেন, 'ইহার লিপিনৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন। প্রভাকর সম্পাদক।' মনে রাখা আবশ্যক, ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য গুপ্ত কবির কাব্যরীতির সঙ্গে তুলনীয় নয়। গদ্যে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর নিজের কালকে অতিক্রম করেছিলেন। সংবাদ প্রভাকরের রচনা দুটি বাদ দিলে বঙ্কিমের বালক বয়সের আরও যে-সকল গদ্যের নিদর্শন পাই তাকে কোনো মতেই 'অ-বঙ্কিম' বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। বালক বঙ্কিমচন্দ্রের যে ভাষা আমরা পাচ্ছি তা শাণিত সংযত ও ঋজু। ব্যক্তিত্বের আলোক রচনাগুলিকে আরও উজ্জ্বল করেছে। বালক বঙ্কিম ও পরিণত বঙ্কিমের রচনার রীতির মধ্যে মূলগত কোনো প্রভেদ নেই, কেবল কালক্রমে রীতির স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছে মাত্র।

বঙ্কিমের বাল্যকালের কবিতার ভাষা তাঁর সংবাদ প্রভাকরের মুদ্রিত গদ্যের তুলনায় অনেক সরল ও স্বাভাবিক। কবিতায় চলিত ক্রিয়াপদের যথেষ্ট ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত (২৫ ফেব্রুঅরি ১৮৫২ খ্রী) বঙ্কিমের প্রথম কবিতায় ('পদ্য' শীর্ষক) 'হোয়ে' 'হোয়েছে' 'হোলে' 'বোলে' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের সহজ ব্যবহার আছে।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিম যখন হুগলী কলেজের জুনিয়ার বিভাগের ছাত্র সেই বৎসর তাঁদের বাংলা পরীক্ষার ফল অত্যন্ত খারাপ হয়। অধ্যক্ষ মহাশয় সেজন্য পরীক্ষককেই দোষারোপ করেন।

'The Principal explained it, probably with perfect truth, as due to 'some bias in the mind of the examiner in regard to what he considers a good vernacular style'. The examiner for that year was Iswarchandra Vidyasagar, who,as a product of the Sanskrit College had 'imbibed the notion that that only is a good Bengali style in which there is a considerable infusion of high Sanskrit words.'

অধ্যক্ষের যে রিপোর্ট পাচ্ছি, তা আমার বক্তব্যের অনুকূলেই আসে। অর্থাৎ বঙ্কিম ও তাঁর সহপাঠীদের রচনার ভাষা সংস্কৃতবহুল না হওয়ার জন্যই পরীক্ষায় তাঁদের নিদারুণ অসাফল্য।

ইতিপূর্বে ২৮ ফেব্রুঅরি ১৮৫২ ও ১০ মার্চ ১৮৫২-য় প্রকাশিত বঙ্কিমের গদ্য নিদর্শন উদ্ধৃত করেছি। অতঃপর ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩-য় প্রকাশিত তাঁর গদ্যের নমুনা উদ্ধার করি। সংবাদ প্রভাকরে 'কালেজীয় কবিতার মারামারি / বিষম বিচিত্র নাটক' কবিতার পাদটীকায় বঙ্কিম গদ্যে লিখেছেন—

'শুনিতে পাই প্রভাকরে না কি দুটো বীর আসিয়া বড় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে? একটি না কি আবার আশে পাশে কামড় মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেশ আমিও একবার এই সময় সাহেবদের সেলাম ঠুকিয়া যাই, কিন্তু নিজে বীর নহি, যুদ্ধ করিব না, চড়টা চাপড়টা মারামারিই ভাল।'

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের গদ্যরচনা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এই সকল রচনার প্রতি কখনো দৃষ্টিপাত করা হয় নি।

অতঃপর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দেও বঙ্কিমের যে-গদ্যের নিদর্শন পাই তার সঙ্গে প্রভাকরের (২৩ এপ্রিল ও ১০ জুলাই ১৮৫২) গদ্যরচয়িতা-বঙ্কিমের আত্মীয়তা নেই বললেই চলে।

১৮৫৬-য় বঙ্কিমের প্রথম পুস্তক, কাব্যগ্রন্থ—ললিতা পুরাকালিক গল্প তথা মানস প্রকাশিত হয়। পুস্তকের অভ্যন্তরে গদ্যে লিখিত গ্রন্থকারের যে 'বিজ্ঞাপন'টি পাই, তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করি।

'সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতা দ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধু মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জনসমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্মার্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন। গ্রন্থকার।'

এই রচনারীতির সঙ্গে বিবিধ প্রবন্ধের 'বিজ্ঞাপনে'র মূলগত প্রভেদ কতখানি?

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুনের প্রভাকরে বঙ্কিমের বইয়ের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সেই বিজ্ঞাপন বঙ্কিমের নাম স্বাক্ষরিত। বিজ্ঞাপনটি এখানে উদ্ধারযোগ্য।

'বিজ্ঞাপন

ললিতা ও মানস

উক্ত উভয় পুস্তক পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে মৎকর্তৃক বিরচিত হইয়া সংপ্রতি প্রকাশ হইয়াছে। যাঁহার প্রয়োজন হয় প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার ৮৬নং নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরিতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। ঐ পুস্তকদ্বয় একত্রে বান্ধন হইয়াছে। মূল্য ছয় আনা। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

বঙ্কিমের এই রচনাই তাঁর শৈশবের স্বাভাবিক গদ্যরীতি। বঙ্কিম বাল্যকালে কবিতার যেরূপ অনুশীলন করেছিলেন গদ্যের ক্ষেত্রে সেরূপ করেন নি। তাই তাঁর বাল্যকালের গদ্যরচনা আমরা পরিমাণে বেশি পাই না। সে বস্তু আজ নিতান্তই ইতিহাসের সামগ্রী। তবু যে ক'টি গদ্যের নিদর্শন আমরা এখানে উদ্ধার করলাম তার থেকে এ কথা সহজেই প্রমাণিত হয়, প্রভাকরে তাঁর যে দুটি গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়েছিল তা তাঁর তৎকালীন স্বাভাবিক গদ্যরীতির ফসল নয়। মনে হয় বাল্যকালের কবিতা অপেক্ষা গদ্যের ক্ষেত্রে মানসিকতার দিক দিয়ে বঙ্কিম ছিলেন অনেক বেশি

পরিণত। বঙ্কিমের পরিশীলিত মনটির স্পষ্ট পূর্বাভাষ ধরা পড়ে তাঁর শৈশবের গদ্য রচনাতেই ।।

বঙ্কিমের বাল্যকালের গদ্য, ক্রমিক প্রকাশ তালিকা।

২৮ ফেব্রুঅরি ১৮৫২—সমাচার দর্পণ

১০ মার্চ ১৮৫২—সংবাদ প্রভাকর

২৩ এপ্রিল ১৮৫২—সংবাদ প্রভাকর

১০ জুলাই ১৮৫২—সংবাদ প্রভাকর

২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩—সংবাদ প্রভাকর

১৮৫৬—ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস-এর ভূমিকা

৩০ জুন ১৮৫৬—সংবাদ প্রভাকর। উপরিউক্ত পুস্তকের বিজ্ঞাপন।

২

কৈশোরে কবিতাযুদ্ধ

'শুনিতে পাই প্রভাকরে না কি দুটো বীর আসিয়া বড যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে? একটি না কি আবার আশে পাশে কামড় মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেশ আমিও একবার এই সময় সাহেবদের সেলাম ঠুকিয়া যাই, কিন্তু নিজে বীর নহি, যুদ্ধ করিব না, চড়টা চাপডটা মারামারিই ভাল।'

—সংবাদ প্রভাকরে পঞ্চদশবর্ষীয় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ।

তিনজনের তখন তরুণ বয়স, তিন কলেজের ছাত্র। সময় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। কারোরই কোনো গ্রন্থ তখনও প্রকাশিত হয় নি। হুগলী কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র, হিন্দু কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র আর কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে এই তিন কবিবরের কাব্যযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। সেকালে এই কবি-সংগ্রাম 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' নামে পরিচিত হয়, তৎকালীন পাঠক সমাজের অতিশয় কৌতূহল-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিবনাথ শাস্ত্রীর উক্তি, 'তখন প্রভাকরে উত্তর প্রত্যুত্তরে কবিতা লেখা যুবক লেখকদিগের একটা মহা উৎসবের ব্যাপার ছিল। এই সকল বাগ্‌যুদ্ধ কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ নামে গ্রথিত হইয়াছে।' বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, 'ইঁহারা যখন উভয়েই বালক তখন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইয়া প্রভাকরে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন তের কি চোদ্দ বৎসর হইবে। উভয়েই কবিতা লিখিতেন। কখনও দেখাশুনা নাই, চোখাচোখি নাই, পত্রের দ্বারা এই সময় ইঁহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল। সর্বদাই উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা থাকিত, আদরের কবিতা কখনও গালাগালির কবিতা থাকিত। প্রভাকরে দ্বারকানাথ

দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র কবিতাতে পরস্পরকে গালি দিতেন, সংবাদপত্রে উহাকে কবিতাযুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিত।'

তিন কবির যুদ্ধ সন্দর্শনে তৎকালীন প্রভাকরের কুরুক্ষেত্রে একবার উপস্থিত হওয়া যাক।

কবিতাযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে দ্বারকানাথের রচনা দিয়ে। দ্বারকানাথ নিজেই তা উল্লেখ করেছেন—'বিবাদের সূত্রপাত আমা হইতেই হয়'।

তিন কবি-সংগ্রামীর মধ্যে দ্বারকানাথ অধিকারী কে? ইনি উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসে 'সুধীরঞ্জন' (১৮৫৫ খ্রী) কাব্য-প্রণেতা হিসেবে পরিচিত। দ্বারকানাথের মৃত্যু ঘটে অকালে, 'সুধীরঞ্জন' তাঁর রচিত একমাত্র গ্রন্থ। কবিতাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে এই তিন কবির একটা কবিতা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায়। সেটা তখন ১৮৫৩-র মার্চ মাস। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পত্রে লিখছেন, 'হিন্দু কালেজের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত দীনবন্ধু মিত্র, হুগলি কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র শ্রীযুত দ্বারকানাথ অধিকারী, এই ছাত্রত্রয়ের বিরচিত গদ্য পদ্য পরিপুরিত তিনটি প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি. এই সকল রচনায় কিছুমাত্র পরিবর্তন ও সংশোধন না করিয়া অবিকল প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের সহযোগিগণ এবং গুণগ্রাহক গ্রাহক ও পাঠকগণ বিশেষাভিনিবেশ পূর্বক দৃষ্টি করিয়া যাহার রচনা যেরূপে ও যেভাবে উৎকৃষ্ট বোধ হইবেক, তাঁহাকে সেইরূপে সেইভাবে পুরস্কৃত করিবেন।' এই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পান দ্বারকানাথ, সম্মানমূল্য ত্রিশ টাকা; দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র সমমূল্যের পারিতোষিক লাভ করেন, কুড়ি টাকা।

এই দ্বারকানাথ সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি [ঈশ্বর গুপ্ত] বিশেষ উৎসাহ দিতেন।···কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনাপ্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল—সরল স্বচ্ছ—দেশী কথায়, দেশী ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন।'

দ্বারকানাথ ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর কবিতা পুস্তক রচনা করেন। 'সুধীরঞ্জনে'র ভূমিকায় কবির নামের নীচে 'কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র' এই উল্লেখ আছে। ভূমিকার

শেষে কবি জানিয়েছেন, 'এই স্থলে অবশ্য কর্তব্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করত মুদ্রিত করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন।'

দ্বারকানাথ প্রথম যে কবিতাটি লেখেন তার নাম 'সরস্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ'। সংবাদ প্রভাকরের সম্পূর্ণ ফাইল অদ্যাবধি আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হই নি। কবিতাযুদ্ধের সূত্রপাতে দ্বারকানাথ প্রথম যে কবিতাটি লিখেছিলেন সেটিও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। ভবতোষ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' শীর্ষক আলোচনাটি সম্পাদন করে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তার পরিশিষ্টে দ্বারকানাথের কিছু দুষ্প্রাপ্য রচনা পুনর্মুদ্রিত করেছেন। কবিতা-যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে দ্বারকানাথের সন্ধিপত্র দিয়ে। সেই পত্রের একস্থানে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে কবি বলছেন, 'আমি আপনাদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রথম প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম কিন্তু আলাপ করিতে গিয়া অদৃষ্টক্রমে বিষমতর বিলাপ উপস্থিত হইল।

চাহিয়া অমৃতফল, পাইলাম হলাহল,
খুঁজিয়া সকল রত্ননিধি॥'

সন্ধিপত্রে যে-কথাই বলুন, বিরোধ-বিদ্বেষের বীজ যে নিশ্চয় ছিল তা অনুমান করা যায়। তারই উত্তর দেবার প্রয়োজনে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

দ্বারকানাথের প্রথম কবিতার উত্তরে দীনবন্ধুর কবিতা 'সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয়' প্রকাশিত হল ১৮৫৩-র ২৫ মে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে দ্বারকানাথের কবিতা ২৫ মে'র কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু তাঁর কবিতায় কল্পনা দেবীর সঙ্গে কবি দ্বারকানাথের কথোপকথন করিয়েছেন। দ্বারকানাথের প্রথম কবিতার সূত্র ধরে কল্পনা দেবী যেন দ্বারকানাথকে প্রশ্ন করছেন—

কোথায় শুনেছ তুমি, সত্য পরাজয়।
পাপে কি কখন হয়, মনোসুখোদয়॥
ধরায় পাপেতে হয়, সম্পদ নির্বাণ।
'যথা ধর্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥

দেবীর উক্তির উত্তরে দীনবন্ধু দ্বারকানাথের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন—

পাইয়ে কবিতা এক, আমি এক দিন।
ভাব বুঝিবারে ভাবে, হলেম বিলীন॥

ভাবিতে ভাবিতে ঘুমে, হইয়ে অজ্ঞান।
স্বপনেতে করিলাম, তার পরিমাণ॥
রচনা সরস বটে, ভাব বটে খাঁটি।
কঠিন ভাষার জন্যে করিয়াছি মাটি॥

তখন দেবীর উক্তি—

স্বপনের বিবরণ, বুঝিয়াছি সার।
দিও না দ্বেষের ফুট, নয়নেতে আর॥
নিজ আভা নিজ গুণে, না হোলে প্রবল।
পর আভা ঢাকা দিলে, কি হইবে বল॥
ভাষা আগে এইবার, ভাবে দেও মন।
দেখ না দেখ না আর, শুয়ে কুস্বপন॥

এই কথা বলে দেবী অন্তর্হিত হলেন। কবিতার শেষে দীনবন্ধুর নিজের উক্তি—

উপদেশ দিয়া দেবী, বাতাসে মিশায়।
মাথা নেড়ে কবিবর, নিজবাসে যায়॥
কোথা যাও কবি ভাই, ভাবিতে ভাবিতে।
আমরা পেরেছি কিন্তু, তোমায় চিনিতে॥
ব্যানা বনে বাস তব, বুনো কবি নাম।
বিলাতী তালের গাছ, ভাব দেখে থাম॥

২৭ মে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হল। কবিতার নাম 'বিচিত্র নাটক'—তিন মিত্রের কথোকপথন। কবিতা পড়ে অনুমান করা যায় প্রথম মিত্র দীনবন্ধু দ্বিতীয় মিত্র দ্বারকানাথ ও তৃতীয় মিত্র বঙ্কিম স্বয়ং। বঙ্কিম দ্বারকানাথের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

অনিত্য সকল সুখ, নিত্য কারে বলি।
সকল সংসার সুখ, স্বপনে কেবলি॥
পৃথিবীতে আছে সুখ, কেবলি স্বপনে।
স্বপ্ন বিনে আর সুখ, নাহি জানি মনে॥
স্বপনে স্বকরে পাই, সংসার মণ্ডল।
স্বপনে নারীর দেখি, লপন কমল॥

ভারত জনম ভূমি, সতীত্ব অঙ্গনা।
শশিমুখী সরস্বতী, আর কত জনা॥

প্রথম মিত্র দীনবন্ধু রসিকতা করে বলছেন—

এখন হে জানিলাম, স্বপ্নে যত সুখ।
এসো মিত্র স্বপ্নে মোরা, ঘুচাইব দুখ॥

আর তৃতীয় মিত্র অর্থাৎ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন—

সময় হোতেছে নাশ, যাই নিজ নিজ বাস
কি করিব ভেবে দেখি মনে,
তুমি যাও এই বেলা, কর গিয়া ফুল খেলা,
যামিনীতে কামিনীর সনে॥
তুমি ত্যজিবে না বনে, ভাবো গিয়ে নিজ মনে,
আজিকে দেখিবে কি স্বপন।
আমি বাড়ী গিয়ে ভাই, মনসুখে নিদ্রা যাই,
স্বপন কি, না জানি কখন॥
তবে গো বিদায় হই, প্রণয়েতে যেন রই,
এই আশা করে মোর মন।
যদি কোন কথা মোর, হয়ে থাকে অতি জোর,
then beg your pardon.

এই কবিতাযুদ্ধের আসরে বুনো কবি শহুরে কবি ও চটো কবি এই তিনটি নাম পাব। এখানে বুনো কবি হলেন দ্বারকানাথ, শহুরে কবি দীনবন্ধু এবং চটো কবি বঙ্কিমচন্দ্র। দীনবন্ধুকে কোনো কোনো সময় মিত্র কবিও বলা হয়েছে।

২৫ জুলাই দ্বারকানাথের কবিতা প্রকাশিত হল—'সরস্বতীর খেদ ও দ্বিতীয় বরপুত্রের সহিত কথোপকথন'। সরস্বতীর অনুরোধে কল্পনা দেবী দীনবন্ধুর অনুসন্ধানে বেরিয়েছেন। কি করে কবিবরের সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব? সরস্বতী কল্পনা দেবীকে বলছেন—

শুন শুন প্রাণ সই, তোমার নিকটে কই,
যে উপায়ে তার দেখা পাবে।
অতি সুমধুর রবে, সদা এই কথা কবে,
যখন যথায় তুমি যাবে॥

ভারতে ভারত ব্যাস দেবী পুত্র কালিদাস
ইঁহারা কবির শিরোমণি।
যদ্যপি শুনিতে পায়, না সহিবে তার গায়
অবশ্যই আসিবে তখনি ॥
স্বভাব তাহার বেশ, মনে পরিপূর্ণ দ্বেষ,
শহরের মিত্র কবি নাম।
শুনিয়া কল্পনা সতী চলিলেন শীঘ্রগতি
দেবী পদে করিয়া প্রণাম ॥

এর পরেই দেখি সরস্বতী ও মিত্র কবির মধ্যে কথোপকথন।

কবি মিত্র বলে আর, কহিয়া কি করি।
ইচ্ছা হয় জননী গো বিষ খেয়ে মরি ॥
বুনো কবি নাম ধরে, বেণাবনে বাস।
আমার কবিতা রত্নে, করে উপহাস ॥

সরস্বতী অভয় ও আশীর্বাদ জানিয়ে মিত্র কবিকে বলেন—

গ্রাম্য কবিগণে আর নাহি তব ভয়।
আমার বরেতে সবে হবে পরাজয় ॥
আজি হোতে নাম তব গ্রামের কেশরী।
মন সুখে নাশ কর আপনার অরি ॥
লেখনী তোমার অতি, লিখিবে জলদ।
কবির মাঝারে তুমি হইবে বলদ ॥*

দ্বারকানাথ 'বলদ' শব্দের পাশে তারকা চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় জানাচ্ছেন 'যিনি বল দেন'। যাই হোক, শেষে সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত শহুরে মিত্র কবির সঙ্গে বুনো কবির সাক্ষাৎ ঘটল। দুজনের মধ্যে তীব্র কথা কাটাকাটি, বাগ্‌যুদ্ধ। বুনো কবি দ্বারকানাথ. অবশেষে শহুরে কবি দীনবন্ধুকে প্রস্তাব দিলেন—

বৃথায় আমার প্রতি, করিয়াছ রোষ।
সে নয়, আমার, তব বুঝিবার দোষ ॥
এসো যাই দোঁহে আদি কবির নিকটে।
যদ্যপি বলেন তিনি, তবে দোষ বটে ॥

এখানে 'আদি কবি' হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। দ্বারকানাথ ও বঙ্কিম প্রায় সমবয়সী। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতি দ্বারকানাথের অনুরাগ এখানে প্রকাশ পায়। বুনো কবির প্রস্তাবের উত্তরে শহুরে কবির উক্তি—

বল দেখি তার চেয়ে, কিসে আমি কম।
তাহার নিকটে যাব, শুধিবারে ভ্রম॥

বিরোধ সহজে মেটে না। ৯ আগষ্ট দীনবন্ধু কবিতা লিখলেন—'চোখে আঙুল দিয়ে বুঝাইয়ে দিই'। এই কবিতায় প্রথমেই দেখি সরলতা দেবীর ক্রোড়ে স্তন্য পান করছেন সরল কবি দ্বারকানাথ। কিন্তু একদা সরলতা দেবী তিন দিনের জন্য সরল কবিকে রেখে তীর্থ পর্যটনে গেলে সপত্নী হিংসা দেবী এসে সরল শিশুর সরল রসনায় গরল দান করেন। হিংসা দেবীর কুমন্ত্রণায় 'সরল কবি' হলেন 'বুনো কবি'তে পরিণত। হিংসা দেবী নানা পরামর্শ দিয়ে বললেন—

যদি কারো ভাল দেখ,
তার পক্ষে মন্দ লেখ,
সবার নীচেতে ফেলো তারে।
অপরের সুকিরণ,
করিবারে নিবারণ,
এই বিধি আমার বিচারে॥

হিংসা দেবীর সঙ্গে কথোপকথন কালে 'পরিহাস নামে জনেক বয়স্য আসিয়া তাহাকে [বুনো কবিকে] বেড়াইতে ডাকিয়া লইয়া গেল।' দ্বারকানাথ দীনবন্ধুকে পূর্বের কবিতায় বলেছিলেন—কবির মাঝারে তুমি হইবে বলদ। এর উত্তরেই পরিহাসের মুখ দিয়ে দীনবন্ধু বলছেন—

বলদেতে সেই অর্থ, সকলে লয়েছে।
যাতে লোক অধিকারী, বাছুর হয়েছে॥

অর্থাৎ দীনবন্ধু যদি বলদ হয় তো দ্বারকানাথ বাছুর।

পরিহাস চলে গেলে সরলতা দেবীর ভবনে সরলতার সঙ্গে তিন মিত্রের একত্র সাক্ষাৎ হয়। এই অংশের কবিতার রস অত্যন্ত মধুর; রাগ-দ্বেষ-ঘৃণার ভাব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এখন আর দ্বারকানাথ বুনো কবি নন—তিনি সরল কবি।

সরল কবি

প্রিয়বন্ধু কবি ভ্রাতা, দেখি দুই জন।
তোমার প্রাসাদে মাতা, হইল মিলন ॥

চট্টো কবি

মোহিত হইল মন, সরল মিলনে।

মিত্র কবি

এই স্থানে অদ্যাবধি, রব তিন জনে ॥

সরলতা [দেবী]

এমন মিলন বাঞ্ছা, হবে কাযে কাযে।
স্বভাব অভাব নহে, তোমাদের মাঝে ॥
বিশ্বপাতা বিশ্বপিতা, ভেবে দেখ মনে।
সে কারণ ভাই ভাই, তোরা তিন জনে ॥
তিন বিদ্যালয় হয়, এক সভাধীন।
হইয়াছ ভাই ভাই, তাহাতেও তিন ॥
বিচরণ করি তিনে, দেহ এক ঠাঁই।
এতেও তোমরা তিনে, হও ভাই ভাই ॥
কবিতায় উপদেশ, লহ রবি কাছে।
ভাই ভাই বাঁধাবাঁধি, ইথে আরো আছে ॥
করো না করো না তাই আর দ্বেষাদ্বেষ।
তিনে মিলে কর চেষ্টা, তুষিতে স্বদেশ ॥

যতই শান্তি-বচন পাঠ হোক না কেন—এখানে আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবের মত অবস্থা। ঠিক এক মাসের মাথায় ৯ সেপ্টেম্বর দ্বারকানাথ আসরে উপস্থিত হলেন। 'অসভ্য ও তদীয় পালকপুত্রের বৃত্তান্ত'র শেষে গদ্যে দ্বারকানাথ লিখলেন—

'হে মিত্র, বারম্বার এরূপ বিচিত্র করিয়া আর স্বীয় কালেজের সুখ্যাতি বিস্তার করিবেন না, ঈশ্বরের পরম পবিত্র প্রেমলাভ বিষয়ে যত্নবান হউন। আমি আপনার রাজ্য যে অভিপ্রায়ে আক্রমণ করিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া আপনি স্বীয় রচনা মধ্যে কতকগুলি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, সে ভালই, রাহু সূর্যদেবকে গ্রাস করিলে তাহার মানের হানি হয় না, বরং রাহুকে

সকলে ঘৃণা করে। আপনি অসভ্যতা বিষয়ে উত্তমরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছেন, ও বিষয়ে আপনার সহিত সংগ্রাম করা মাদৃশ লোকের উপযুক্ত নহে, অতএব বিনীত ভাবে নিবেদন সাম্প্রতি আর ঈদৃশ দুর্বাক্যবাণ প্রহার করিবেন না, আমি বিশেষরূপ জ্বালাতন হইয়াছি, ভাবিয়া দেখুন ইহাতে উভয়েরই মূঢ়তা প্রকাশ ব্যতীত অন্য কোন গৌরব নাই, যদি পুনরায় আপনি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন, আমি তাহার উত্তর প্রদান না করিয়া কেবল করুণাকর ঈশ্বরের নিকট এই মাত্র কহিব, যথা—নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।'

২৭ সেপ্টেম্বর আসরে অবতীর্ণ হলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। লিখলেন—কালেজীয় কবিতার মারামারি/বিষম 'বিচিত্র নাটক'/অর্থাৎ/কবিদের মজলিশ এবং ঐ নাটক দর্শন। ঐ 'নাটকে' আছে কবিদের মজলিশ, বিদ্যা, কুবিদ্যা, কবি ঈশ্বর, মিত্র কবি, বুনো কবি ও চট্টো কবি। বঙ্কিমের কবিতায় মধ্যস্থতা করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, যদিও মুখ্যতঃ তিনি দীনবন্ধুর পক্ষই সমর্থন করেছেন ও দ্বারকানাথকে আক্রমণ করেছেন। কবিতার শেষে বিদ্যা বুনো কবি অধিকারীকে প্রশ্ন করেছে—

কিসে তুমি শ্রেষ্ঠ কবি, নিজ মনে লাগে।
কবিতা কাহাকে বলে, বল দেখি আগে॥

অধিকারী

যে জন মিলায় শব্দ, সুকোমল ভাষে।
সেই ত সুকবি বলি, আপনা প্রকাশে॥

এর উত্তরে বিদ্যার মুখ দিয়ে পঞ্চদশবর্ষীয় বঙ্কিমের উক্তি—

তা নয় কবিতা বাছা, তা নয় তা নয়।
রামায়ণ পোড়ে তত, সুকবি না হয়॥
মুগ্ধ যদি, প্রকৃতির, মোহন বদন।
যেই মনোমত ভাবে, করে দরশন॥
সুখ দুখ রিপু রসে, হৃদয় মাঝার।
প্রকৃতির মোহসনে, জন্মে যে বিকার॥
যেই ভাষে যেই ভাব, স্বরূপ প্রকাশে।
যে ভাষে আপনা সনে, হৃদয় সম্ভাষে॥
যথার্থ কবিতা সেই, সদা মোহময়।
শুধু রাম রাম বলা, কবিতা তো নয়॥

১৭-১৮ নভেম্বর 'হাতে হাতে পাপের ফল' কবিতার শেষে দীনবন্ধু গদ্যে দ্বারকানাথের সর্বশেষ কবিতার (অসভ্য ও তদীয় পালক পুত্রের বৃত্তান্ত) উত্তরে লিখলেন, 'যাহা হউক, তাঁহার [দ্বারকানাথের] গালাগালি মনে না করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলাম।'

এরপরেই সন্ধিপত্র রচিত। দ্বারকানাথ লিখলেন। প্রকাশ ৩১ জানুআরি ১৮৫৪। সন্ধিপত্রের শেষাংশ উদ্ধৃত হল—

'বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব পূর্বকৃত দোষসকল মার্জনা করিয়া সাম্প্রতি নামের গুণ ব্যক্ত করিলে পরম পরিতুষ্ট হই। আমারদিগের হুগলি কালেজীয় নবীন সুকবি শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে আমি সংপূর্ণ অপরাধী নই। তিনি স্বীয় মনঃকল্পিত দোষে আপনাকে কলঙ্কিত বোধ করিয়া মধ্যে একবার হানা দিয়া নানারূপ কটু কহিয়া গিয়াছেন। প্রথমে বোধ ছিল বঙ্কিমবাবু যুদ্ধবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী নন। কিন্তু সে দিবসের বিক্রম দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশারদ বলিয়াছেন। এ দেশে অনেকেই কহিয়া থাকেন 'যে গরুটা দুধ দেয় সে চাট মারিলেও সহ্য হয়'। বঙ্কিমবাবু সুকবি, বিশেষ সুবোধ, তাঁহার কথায় রাগ করিবার বিষয় কি? যদিও গালাগালি বিষয় কবিভ্রাতার নিকট সংপূর্ণ অপরাধী নই তথাপি তিনি আমার অন্যান্য দোষ পাইয়া থাকিবেন। যাহা হউক, তাঁহার নিকটেও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, এবং বোধ করি তিনি অবশ্যই আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। আমরা কবিতা বিষয়ে তিনজনেই একজনের শিষ্য। ইহাতে পরস্পর কলহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে, ববং অন্য কাহারো সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনজনে ঐক্য হইয়া তাহার নিরাকরণ করা কর্তব্য। যাহা হউক, আমি আপনাদিগের মিত্রতা লাভের নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইয়া অদ্য এই সন্ধিপত্র প্রেরণ করিতেছি, মহাশয়েরা কৃপা বিতরণ পূর্বক এ দীন অপরাধীর দোষ সকল মার্জনা করত প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইয়া পরম বাধিত করিবেন, সুকবি মহোদয়েরা দুর্গন্ধ পঙ্ক পরিহার পূর্বক তজ্জনিত পঙ্কজ লইয়াই আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন, আপনারা উভয়েই সুকবি। অতএব মল্লিখিত পঙ্কস্বরূপ দুর্গন্ধ দোষসকল পরিহার পূর্বক অবশ্যই সদুপদেশ রূপ সরোরুহ গ্রহণ করিবেন।'

এই কবিতাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তৎসহ দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের সাহিত্য জীবনের সূচনাপর্বের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হই। দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুর পর তাঁর জীবনী লিখতে গিয়ে 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' প্রসঙ্গে বঙ্কিম

বলেছিলেন, 'তাহাতে গৌরবের কিছু নাই, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। তরুণ বয়সে গালি দিতে কিছু ভাল লাগে; বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রায় পরস্পরকে গালি দিয়া থাকে। দীনবন্ধু চিরকাল রহস্যপ্রিয়, এজন্য এটি ঘটিয়াছিল।' রসের বিচারে এই সকল কবিতার মূল্য যা-ই হোক, এই তিন কবির জীবনেতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে শৈশব জীবনের ইতিবৃত্ত রচনায় 'কবিতাযুদ্ধে'র গুরুত্ব অনেকখানি।

দুর্গেশনন্দিনী ঃ সমকালীনের চোখে

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী কি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল? অনেকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে আছে, '১৮৬১ সালে দুর্গেশনন্দিনী লিখিত ও পর বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল।' আবার শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিখ্যাত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৮৬৪ সালে তাঁহার প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী নামক উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়।' ১৩২৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক গ্রন্থে অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত লিখছেন, 'খ্রীষ্টীয় ১৮৬৪-৬৫ (বাঙ্গালা ১২৭১) অব্দে দুর্গেশনন্দিনী প্রথম প্রকাশিত হয়।' দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশকাল নিয়ে কেন এই মতভেদ জানি না। আমরা এখানে দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করি—

দুর্গেশনন্দিনী।

ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

মুজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮।৫

বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ইং ১৮৬৫।

মূল্য—১৲ এক টাকা।

শুধু প্রকাশকাল নয়, দুর্গেশনন্দিনীর রচনাকাল নিয়েও বঙ্কিম-সমকালীন লেখকদের মধ্যে কিছু মতান্তর আছে। বঙ্কিম-জীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬২-তে অর্থাৎ তাঁর ২৪ বছর বয়সের সময় দুর্গেশনন্দিনী রচনা আরম্ভ করেন। এবং ১৮৬৩-তে খুলনায় অবস্থানকালে শেষ করেন। কিন্তু বঙ্কিম-সহকর্মী কালীনাথ দত্তের বিবৃতিতে অন্য তথ্য পাচ্ছি। কালীনাথ জানিয়েছেন, দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সম্পূর্ণ হয় নি। ১৮৬৪-র মার্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে কর্মভার গ্রহণ করেন। দুর্গেশনন্দিনী লেখার কাজ তার আগে থেকেই চলেছিল, বারুইপুরে তা সম্পূর্ণ হয়।

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের পর সমসাময়িক সমালোচক মহলে দুই পরস্পরবিরোধী মত প্রচারিত হয়েছিল। কারুর মতে, দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের একটি নিকৃষ্ট রচনা। আবার কেউ কেউ উপন্যাসটিকে শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন।

জীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র নাকি তাঁর কোনো উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পূর্বে কাউকে পড়তে দিতেন না। কেবল দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি তিনি নিজে তাঁর দুই দাদাকে পড়ে শোনান। শচীশচন্দ্র লিখছেন, 'দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়া তিনি স্থির করিতে পারিলেন না, গ্রন্থখানি প্রকাশের যোগ্য হইয়াছে কি না। পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তিনি তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে আদ্যন্ত শুনাইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিমর্ষ ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার আত্মনির্ভরতা জন্মে নাই—তখনও তিনি তাঁহার শক্তি বুঝিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কর্মস্থানে প্রস্থান করিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধে এই পাণ্ডুলিপি পাঠের চিত্রটি বিস্তৃত করে এঁকেন। আজ এক শো বছর পরের পাঠকের কাছে এ চিত্র কৌতূহলোদ্দীপক হবে বলে আমরা এখানে তা তুলে দিচ্ছি। পূর্ণচন্দ্র লিখছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোনও পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্বে কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতেন না।...কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার পূর্বে উহা কাঁঠালপাড়ার বাটীতে অনেককে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার নিজের লেখনী শক্তির প্রতি তখন তাদৃশ বিশ্বাস জন্মে নাই, সেজন্য অন্যের মতামত জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। আমাদের পিতাঠাকুরের সহিত ও ভ্রাতৃপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অনেক ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিতেন, ভাটপাড়ার খ্যাত্যাপন্ন পণ্ডিত-

গণও আসিতেন।...এক সময়ে বড়দিনের কি মহরমের ছুটিতে আমার ঠিক মনে নাই, অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার হস্তলিখিত দুর্গেশনন্দিনী তাঁহাদের নিকট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন ; কেহ ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেও শ্রোতৃগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। একটি দুই বছরের শিশু ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার নিকট দাঁড়াইয়া খড়খড়ির পাখি টানিতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া ঐ ছেলেটিকে কোলে লইয়া বাহিরে চাকরদিগের নিকট রাখিয়া আসিলেন। শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অহিফেন-ভোগী ছিলেন ; মুহুর্মুহু তাঁহাদের তামাক আবশ্যক হইত ; তাঁহারা তামাক ডাকিতে ভুলিয়া গেলেন। পণ্ডিত-মহাশয়েরা নস্যের ডিব্বা খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন কি না, সেটি আমি লক্ষ্য করি নাই, কেননা, আমিও অনন্যমনে পাঠ শুনিতেছিলাম। একজন প্রাচীন ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে চিৎকার করিয়া বলিতেছেন, 'আ মরি, আ মরি! কি বক্তৃতাই করিতেছেন!' এইরূপে দুই দিনে গল্পপাঠ শেষ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতে ধারণা ছিল যে, দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা ব্যাকরণ দোষে দূষিত। সেজন্য তিনি গল্পপাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাষায় ব্যাকরণ দোষ আছে—উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন?' মধুসূদন স্মৃতিরত্ন বলিলেন, 'গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, আমাদের সাধ্য কি যে অন্য দিকে মন নিবিষ্ট করি!' বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলিলেন যে, 'আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ দোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে।' দুর্গেশনন্দিনী প্রচারিত হইবার পূর্বে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং সে-কালের বিখ্যাত সমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য উহা পাঠ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'তোমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিবে, কিন্তু এই উপন্যাসটি যেমন সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিবে, তেমন অন্য উপন্যাস করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।'

দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করে শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র যে তা প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন, এ-কথা পূর্ণচন্দ্র স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র যখন দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন, তখন সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি অনুজের উপন্যাসখানি শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্যামাচরণও পরে উহা পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।'

দুর্গেশনন্দিনীর মূল ঘটনা ও বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর চরিত্র স্কটের আইভ্যানহোর প্রভাবিত, এমন একটা অপবাদ গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রচারিত হয়েছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল ও ১৫ মে সংখ্যার 'Hindoo Patriot'-এ আইভ্যানহো সংক্রান্ত অপবাদ আলোচিত হয়। এই আলোচনা বঙ্কিমের মনের ওপর গভীর রেখাপাত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও কালীনাথ দত্তের কাছে বলেছিলেন, দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে তিনি আইভ্যানহো পড়েন নি। চন্দ্রনাথ বসু 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'দুর্গেশনন্দিনী পড়িয়া মনে হইল, উহা স্কটের আইভ্যানহো পড়িয়া লিখিত। অনেকদিন পরে বঙ্কিমবাবুকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার আগে আইভ্যানহো পড়ি নাই।' আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমিই হিন্দু পেট্রিয়টে দুর্গেশনন্দিনীর নিন্দা করিয়াছিলে? আমি বলিয়াছিলাম, না, হিন্দু পেট্রিয়টে যে সমালোচনা হইয়াছিল, তাহা তোমার কাছে প্রথম শুনিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, সমালোচনা অন্যায্য হয় নাই এবং পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম, উহা তোমারই লেখা—প্রতিকূল হইলেও অমন সমালোচনা পড়িয়া সুখ হয়—সমালোচক জানিতেন না যে, তখনো আমি আইভ্যানহো পড়ি নাই, তাই নিন্দা করিয়াছিলেন।'

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম-সহকর্মী কালীনাথ দত্তের বিবৃতি সংগ্রহ করা যেতে পারে। কালীনাথ লিখছেন, দুর্গেশনন্দিনী রচনার সময় 'বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমনকি, সাক্ষীর এজাহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার Study room-এ প্রস্থান করিতেন, চিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না। দুর্গেশনন্দিনীর লেখা সমাপ্তপ্রায় হইলে, কিংবা মুদ্রিত হইবার প্রাক্কালে, আমি তাঁহার পাঠকক্ষের টেবিলে কয়েক ভলুম স্কটের ওয়েবর্লী উপন্যাস সজ্জিত দেখি। তিনি হয়ত কোনও বন্ধুকে তাঁহার দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতে দেন; বন্ধু তাঁহাকে Ivanhoe উপাখ্যান-ভাগের সঙ্গে তাঁহার পুস্তকের উপাখ্যান-ভাগের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া থাকিবেন। তাহাতে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সম্ভবত নূতন ওয়েবর্লী উপন্যাসাবলী বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইবার পূর্বে তিনি Ivanhoe পড়িয়াছিলেন কি না, তাহা আমি ঠিক বলিবার অধিকারী নই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা সত্যের অনুরোধে অবিকল প্রকাশ করিলাম। আমি অগ্রে

দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করি। তাহার অনেকদিন পরে Ivanhoe অধ্যয়ন করি। বলিতে কি, আমি উভয়ের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম। আমি ইহুদী রমণীর (Rebeca) চিত্র পাঠ করিবার সময় আয়েষাকে একটি মুহূর্তও ভুলিতে পারি নাই। অন্যান্য পাঠকেরাও দুর্গেশনন্দিনীর চিত্রাবলীকে Ivanhoe-র ছায়া বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। Ivanhoe-র ছায়া লইয়া যে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হয় নাই, ইহা বঙ্কিমবাবু নিজমুখে শতবার ব্যক্ত করিয়াছেন। আমার নিজের যাহাই ধারণা হউক না, আমি বঙ্কিমবাবুর কথায় বিশ্বাস করিয়া সে ধারণাকে অপসৃত করিয়াছি। কেননা, আমি তাঁহার honesty unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি।'

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন, দুর্গেশনন্দিনী আইভ্যানহোর ছায়ায় রচিত নয়। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'যে প্লট সার ওয়ালটার স্কটের মাথায় খেলিয়াছিল, তাহা কি বঙ্কিমের মাথায় আসা অস্বাভাবিক? লোকচরিত্রে অন্তর্দৃষ্টির হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে কোনও অংশে স্কট অপেক্ষা ন্যূন মনে করা যায় না। প্রথম উপন্যাস হইলেও দুর্গেশনন্দিনী যে একজন প্রতিভাশালী ও আত্ম-ক্ষমতায় স্থির আস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির রচিত, তাহা ঐ উপন্যাসের গোড়া হইতেই একরূপ সুপ্রকাশ।'

সমকালীন অনেক লেখক বলেছেন, দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশে বঙ্কিমের কোনো যশ হয় নি। জীবনীকার শচীশচন্দ্র লিখছেন, দুর্গেশনন্দিনী 'প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু যশ হইল না। না হউক, গ্রন্থকার আপনাকে কতকটা চিনিলেন।' এই প্রসঙ্গেই অন্যত্র লিখেছেন 'বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন ও বুঝিতেন, দুর্গেশনন্দিনী একখানি তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস মাত্র। তাহা রচনা করিয়া অথবা তাহার রচয়িতা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরব কিছুমাত্র বর্ধিত হয় নাই।' হারানচন্দ্র রক্ষিতও জানিয়েছেন, 'দুর্গেশ-নন্দিনীতে বঙ্কিম যশোলাভ করিতে পারেন নাই—বরং তদানীন্তন সাহিত্য-সমাজ তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণে নিরুৎসাহ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। পত্র-সম্পাদকগণ প্রায় সকলেই একবাক্যে দুর্গেশনন্দিনীর নিন্দা করিয়াছিলেন; —দুই-একখানি কাগজ প্রশংসা করিয়াছিল মাত্র।'

দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র যশোলাভ করেন নি, এ তথ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। তা আমরা পরে লক্ষ্য করব। তার আগে এই উপন্যাস সে যুগে কিরকম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তা দেখা যাক। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় তাঁর সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে দুর্গেশনন্দিনীরই সর্বাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শচীশচন্দ্রের প্রদত্ত তালিকা থেকে জানা যায়, দুর্গেশনন্দিনীর ১২৫০০, কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষের প্রত্যেকটি

৭০০০, আনন্দমঠ ও মৃণালিনীর প্রত্যেকটি ৬০০০, দেবীচৌধুরাণী ও রজনীর প্রত্যেকটি ৫০০০ এবং কৃষ্ণকান্তের উইলের ৪০০০ খণ্ড বিক্রী হয়। শচীশচন্দ্রের বইতে আছে, '১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন দুর্গেশনন্দিনীর একাদশ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া গৃহে আসিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—এই পুস্তকখানির লোকে যত নিন্দা করিয়াছে, তত আর কোন পুস্তকের করে নাই; তাই এ পুস্তকের বিক্রি বেশি।'

ইংরেজিতে লিখিত 'Bengali Literature' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আদিযুগ থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন। এটি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের 'The Calcutta Review' পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রবন্ধ-রচয়িতার নাম ছিল না। তাই লেখক নিজের বইয়ের প্রসঙ্গও উল্লেখ করতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

'Among the romance writers, Babu Protap Chandra Ghose, author of Bangadhip Parajay, has recently been noticed at length in this review. The only other writer of this class whose works it seems necessary to notice, is Babu Bankim Chandra Chatarji, whose Durgesnandini, Kapal Kundala and Mrinalini are among the most popular of Bengali books.'

বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই প্রবন্ধ লিখছেন, তার মধ্যে দুর্গেশনন্দিনীর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল।

ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস-গ্রন্থ 'The Literature of Bengal'-এ (১৮৭৭ খ্রী) লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভার আলোচনা করেন। এই আলোচনা থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি—

'The new school of fiction, which he has introduced, although in imitation of the historical novels of Sir Walter Scott, will, we venture to assert, scarcely lose much by a comparison even with the gorgeous creations of the Lion of Scotland. We all remember how, about ten or twelve years ago, the Bengali reading community was taken by surprise by the Durges Nandini, the first work of the author and a masterwork of creative imagination...Durges Nandini is the best of Bankim Babu's historical novels, while Bisha Briksha is the only tale of social life in Bengal which he has yet written.'

রমেশ দত্ত যখন এ-কথা লেখেন বঙ্কিমের তখনও শেষ পর্বের উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয় নি।

দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাব-কালের চিত্র রমেশচন্দ্রেরই অপর একটি লেখা থেকে পাচ্ছি। চিত্রটি নিখুঁত। 'যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ক-কিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।'

সমকালীন 'The Calcutta Review' পত্রে দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক মন্তব্য করেছেন, উৎকর্ষের দিক থেকে কপালকুণ্ডলা ও দুর্গেশনন্দিনী যদিও একই পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু জনপ্রিয়তায় দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলাকে অতিক্রম করেছিল। গ্রন্থ সমালোচক লিখছেন—

'Durgeshnandini was the first and is unquestionably the best novel in Bengal. The Kapal Kundala, though equally good, is not so well spoken of by native readers. The style is essentially Babu Bankim's own ; and we meet with the same witticisms, the sly hits, and the same displeasing combination of the grave with the ludicrous.'

অধ্যাপক Cowell, 'Macmillan's Magazine'-এ দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি লেখেন—

'We have now before us an historical prose romance (Durgeshnandini) by a Bengali author, which rejecting all the mythological times, has fixed its scene in the days of the great Emperor Akbar, and, without a single marvel of magic or metempsychosis, seeks its sole interest in human passion and life's daily struggles with adverse circumstances. The book has already reached its fourth edition and we may therefore fairly consider it as the successful inaugurator of a new kind of literature in Bengal. He [Bankim Chandra] has

since written several novels in Bengali but the one which we have taken as our subject is the most successful with his countrymen ; and we think it is well worthy of some notice in England, as the first attempt to transplant into India our own historical novel.'

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের অল্প পরেই ১৮৬৫-র এপ্রিলে 'সংবাদ প্রভাকরে' উক্ত গ্রন্থের দীর্ঘ সমালোচনা মুদ্রিত হয়। সমালোচক লিখেছেন, 'বাঙ্গালা ভাষায় নূতন উপাখ্যান এ পর্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই, দুর্গেশনন্দিনী-গ্রন্থকার বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদিও স্বপ্রণীত পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে ইংরাজী ভাব সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তথাপি যখন ইহা অনুবাদিত পুস্তক নহে, তখন ইহা অবশ্যই নূতন।

পাঠকগণ যেন এরূপ মনে না করেন যে, আমরা ইংরাজী উপাখ্যান সমুদয়ের সহিত দুর্গেশনন্দিনীর উৎকর্ষের তুলনা করিতেছি। ইংরাজীতে যেরূপ উত্তম উত্তম উপাখ্যান আছে, বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ নাই, এই নিমিত্ত আমরা এই উৎকৃষ্ট ও প্রথম বাঙ্গালা উপাখ্যানকে গৌরবস্থানীয় করিলাম। বাস্তবিক বঙ্কিমবাবু এই পুস্তকে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালার প্রথম উপাখ্যানকার (First Novelist) উপাধির অধিকারী হইয়াছেন।'

দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশ উপলক্ষে ১৮৬৫-র সেপ্টেম্বরের 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখক —বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে একটি অভিনন্দনপত্র মুদ্রিত হয়। তাতে বলা হয়েছে, 'আপনি এক্ষণে আমাদিগকে নবপল্লবিত অক্ষয়বৃক্ষের অমৃতফলের রসাস্বাদন করাইলেন।' নভেম্বরের 'সংবাদ প্রভাকরে' দু'জন মহিলা চিঠিতে দুর্গেশনন্দিনীর প্রশংসা করেন।

'সোমপ্রকাশ' পত্রে ১২৭২ বঙ্গাব্দের ১৩ বৈশাখ দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনা মুদ্রিত হয়। সমালোচনার কিছু অংশ উদ্ধার করা গেল।

'যাঁহারা আরব্যোপন্যাস পড়িয়াছেন, আসিয়ার লোকের অদ্ভুত উপন্যাস রচনা শক্তি কেমন প্রবল, তাঁহারা তাহা জানিতে পারিয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনী রচনাকার সেই শক্তিকে প্রতীচ্যদিগের প্রদর্শিত নৈসর্গিক রচনারীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রস্তাবিত উপন্যাসের সবিশেষ মনোহরতা সম্পাদন করিয়াছেন। মনোহর উপন্যাস পাঠ চিত্তকে যেরূপ আকর্ষণ করে, দুর্গেশনন্দিনী আমাদিগের চিত্তকে সেইরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল। আমরা ঔৎসুক্যসহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি।

পাঠকালে অনেক স্থলে গ্রন্থকারের নায়ক নায়িকা প্রভৃতির রূপবর্ণনাদি ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছে। সে-স্থলে যে

ব্যক্তি বা যে বস্তুর সম্ভাব অথবা যে-রূপ বর্ণনা অত্যাবশ্যক, গ্রন্থকার তত্তৎ স্থানে যথোচিতরূপে সে-সকলের সন্নিবেশাদি করিয়াছেন। জগৎসিংহের নায়কোচিত সাহসিকতা, উন্নত ভাব, বিনয়, আয়েষার সৌজন্য ও বিমলার বুদ্ধিচাতুর্য দেখিয়া পাঠকগণের মন যেমন বিস্ময় ভক্তি ও কৌতুক প্রভাবে স্তিমিত হইবে, গজপতি দিগ্‌গজের কাপুরুষোচিত ব্যবহার দেখিয়া তেমনি অধৈর্য হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ওসমান জগৎসিংহের প্রতি তাঁহাকে অনুরক্ত অনুমান করিয়া ঈর্ষান্বিত হন এবং নির্জন অরণ্য মধ্যে জগৎসিংহকে লইয়া গিয়া তাহার প্রাণবধে উদ্যত হন। জগৎসিংহ পূর্ব উপকার স্মরণ পূর্বক ক্ষমা করিয়া রজঃপূত জাতিসুলভ যে মহামনস্কতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা চিকিৎসক ঔষধের সঙ্গে বিষপান করাইবেন এই পত্র পাইয়াও আলেকজাণ্ডার ঔষধ সেবন করিয়া যে মহামনস্কতা প্রকাশ করেন, তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। বিমলা বুদ্ধিকৌশলে দুরাত্মা কতলু খাঁর প্রাণবধ করিয়া যেরূপে স্বামিবধবৈর শোধ এবং আপনার ও তিলোত্তমার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে কে না বিস্মিত হইবেন?

শুক্ল কৃষ্ণ, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, পরস্পর সন্নিহিত না হইলে পরস্পরের মহিমা ও শোভা বৃদ্ধি হয় না। আমরা অতঃপর দুর্গেশনন্দিনীর দোষগুলি পার্শ্বে সন্নিবেশিত করিতে চলিলাম। এদেশের লোকের এক বিষয় লইয়া অধিক বর্ণন করিবার যে একটি রোগ আছে, গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কয়েকটি স্থানে অতিবর্ণন দোষে বিরস হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে পতৎপ্রকর্ষতা দোষ ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষেরও বিন্দুপাত হইয়াছে। ভাষাটিও ললিত ও সর্বজন হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই।

যাহা হউক, যদি কেহ, তুলামানে দুর্গেশনন্দিনীর গুণদোষের পরিমাণ করেন গুণভার গুরু হইবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানি মৃজাপুর অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮।৫ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা।'

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের পর 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকায় (২ পর্ব। ২১ খণ্ড। সংবৎ ১৯২১) 'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা' বিভাগে উপন্যাসটির বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ-সমালোচক লিখছেন, 'আমরা বঙ্গীয় সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইয়াও বাঙালী গদ্যকাব্য পাঠে অত্যন্ত অনুরাগবিহীন। পরন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করায় সে বিরাগের দূরীকরণ হইয়াছে। আমরা তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহার কল্পনা, গ্রন্থন, রচনা সকলই নূতন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং তাহাতে কাহাকেই চর্বিত-

চর্বণের ক্লেশ পাইতে হয় না। যাঁহারা ইংরাজী গদ্যকাব্য পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মনে দুর্গেশনন্দিনীর অনেক স্থানে ইংরাজী নভেলের প্রতিভা লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রতিভার কোন বিশেষ হানি হয় না। যাঁহারা নূতন সরস মনোমুগ্ধকর গল্পের অনুরাগী; যাঁহারা বীর্যবৎ বাক্যের আদরকারী; যাঁহারা বিনানুপ্রাসে রচনার চাতুর্য হইতে পারে এমত জ্ঞান করেন; যাঁহারা মহদ্‌গুণে পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা দুর্গেশনন্দিনীতে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন; কারণ ইহা তাঁহাদের সকল অভীষ্টের সম্যক প্রকারে পোষক, সন্দেহ নাই।' সমালোচক তাঁর প্রবন্ধের প্রায় সর্বত্রই দুর্গেশনন্দিনীর প্রশংসা করেছেন, তবে সংক্ষেপে দু-একটি ত্রুটির কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, 'গ্রন্থকার ইংরাজী গদ্যকাব্যের ভাবে আর্দ্র থাকায় কোন কোন স্থলে হিন্দু ও মুসলমান সম্বন্ধে ইংরাজী বা বিলাতী আচার-ব্যবহারের আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে স্বভাব-বর্ণনার ব্যাঘাত হইয়াছে। ইউরোপ খণ্ডে কোন দুর্গ-পতির কন্যা অনায়াসে রাজপুত্র বা সম্মানবিশিষ্ট কোন বন্দীর শুশ্রূষা করিতে পারেন; দেশাচারে তাহা প্রশংসনীয়ও হয়, কদাপি নিন্দনীয় বোধ হয় না। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকারের বর্ণনায় প্রধান সেনাপতি কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা যে প্রকারে জগৎসিংহের বন্দী ও পীড়িতাবস্থায় সেবা করিয়াছে তাহা কদাপি কোন যবন সম্বন্ধে সংলগ্ন বোধ হয় না। আশমানির চরিত্রও স্থানে স্থানে ইউরোপীয় প্রতিভাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অপর, আশমানির রূপ ব্যাজস্তুতিতে যে প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃত বর্ণনে তাহার লক্ষণ রক্ষা করা হয় নাই, পরস্পর অত্যন্ত অসংলগ্ন বোধ হয়। গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে বক্তব্য যে, তাহা সাধারণতঃ শুদ্ধ ওজোগুণবিশিষ্ট এবং স্বভাবসিদ্ধ হইলেও স্থানে স্থানে চ্যুত সংস্কৃতিত্বে আক্লিষ্ট আছে। কয়েক স্থানে গ্রন্থকার 'লম্ফ ত্যাগ করিয়া' পদ লিখিয়াছেন, ইহা পরিশুদ্ধ গৌড়ীয় নহে। লোকে লম্ফ 'প্রদান' করিয়া থাকে, কদাপি 'লাফ ছাড়িয়া' থাকে, বোধ হয় বঙ্কিমবাবু তাহারই অনুবাদ করিয়া থাকিবেন।'

'রহস্য সন্দর্ভে'র এই সমালোচনা বঙ্কিমের মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আশমানির রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে সমালোচক যে মন্তব্য করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা মেনে নেন। দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম সংস্করণে ব্যাজস্তুতিতে আশমানির রূপ বর্ণনার পর ছিল, 'এই বর্ণনায় যদি কোন অরসিক পাঠক আশমানির স্বরূপ নিরূপণ করিতে না পারিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে সোজা কথায় বলিয়া দিতে পারি। বিমলার অপেক্ষা আশমানির বয়স প্রায় সাত বৎসর ন্যূন; মুখ, চোখ, নাক, কান, সামান্য

মত ; বর্ণ শ্যামোজ্জ্বল ; মুখখানি একটু হাসি হাসি, চক্ষুও সেই ভাব ; দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে, শ্রী আছে। আকার খর্ব ; গঠন স্থূল ; বেশ বিন্যাসের বড়ই পরিপাট্য।' পরবর্তী সংস্করণে দেখি কেবল ব্যাজস্তুতিতেই আশমানির রূপের বর্ণনা আছে, প্রকৃত রূপের অংশটি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে।

সমকালীন সমালোচনা বঙ্কিম-সাহিত্যের পাঠ-পরিবর্তনের একটি বড় কারণ। আমরা এখানে দুর্গেশনন্দিনীর প্রসঙ্গে আর একটি সমালোচনা-প্রবন্ধের উল্লেখ করব। সমালোচকের নাম রামগতি ন্যায়রত্ন। রামগতি তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে দুর্গেশনন্দিনী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে তিনি মন্তব্য করেন। ভাষা আলোচনাপ্রসঙ্গে রামগতি বলেন, 'বঙ্কিমবাবুর এ গ্রন্থের ভাষায় অনেকগুলি দোষ আছে।' সমালোচক এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে ছিল, 'আমাদিগের আত্মপরিচয় আপনারা দিবার রীতি নাই।' রামগতির মতে, 'বাক্যটি অনন্বিতত্বদোষে দূষিত, উহার অন্তর্গত 'আপনারা' এই কর্তৃপদের সহিত কাহারও অন্বয় হয় না ; উহার পরিবর্তে স্বয়ং দিবার রীতি নাই, এইরূপ লিখিলে ভাল হইত।' তৃতীয় পরিচ্ছেদে ছিল, 'পাঠানেরা পুনর্বার মস্তকোন্নত করিল।' সমালোচক বলছেন, 'মস্তকোন্নত—এরূপ একপদ হইতে পারে না—'মস্তক উন্নত' এইরূপ পৃথক রাখা কর্তব্য। কারণ ঐ দুই পদে কোন সমাস হয় না—অসমাসে সন্ধি করা সংস্কৃতে নিয়ম আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় সে রীতি নাই—বাঙ্গালায় সেরূপ করিলে 'যত্নপোবৎসর আম্যেকশত টাকা পাইলাম, তথাপ্যেকচালাখানি হইল না, ইত্যাদিবৎ উপহাসাস্পদ হয়।' তৃতীয় পরিচ্ছেদেরই শেষে ছিল, 'তিনি বর্ষাপ্রভাতে।' রামগতি জানাচ্ছেন, 'প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ—প্রভাত শব্দ প্রাতঃকালভিন্ন সামান্য শেষবোধক নহে ; সায়ঙ্কালবোধার্থ 'দিবাপ্রভাতে' এরূপ প্রয়োগ করা যায় কি ?' দশম পরিচ্ছেদে ছিল, 'ততক্ষণ নিদ্রাগমন করিও না।' সমালোচকের বক্তব্য, 'নিদ্রাগমন করিও না,—এরূপ প্রয়োগ সাধু কি অসাধু ? তাহা বিবেচনা করিবার ভার পাঠকদিগের উপর অর্পণ করিলাম ; 'তিনি নিদ্রা গিয়াছেন' 'সে নিদ্রাগত' ইত্যাদি প্রয়োগদর্শনে 'নিদ্রাগমন করিও না' এরূপ প্রয়োগও সাধু বলিতে তাঁহাদের রুচি হয়—হউক।'

'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার লিখছেন, 'আমরা প্রথম সংস্করণে দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাগত কতিপয় দোষের প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং আশা করিয়াছিলাম যে, পুনঃ সংস্করণে সেগুলি

সংশোধিত হইবে। কিন্তু সপ্তম সংস্করণেরও পুস্তক দেখিলাম, সে সকল দোষ তদবস্থই রহিয়াছে! বঙ্কিমবাবুর পুস্তকগুলি বাঙ্গালা সাহিত্য-সাগরের উজ্জ্বল রত্ন—সে সকল রত্নকে ওরূপ কীটানুবিদ্ধ দেখিলে আমাদের ক্লেশ বোধ হয়। বঙ্কিমবাবুকে অনুনয় করিতেছি, তিনি ঐরূপ দোষসকলের সংশোধন করিয়া আমাদের ক্লেশ দূর করুন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালের সর্বশেষ সংস্করণে দেখি, ঔপন্যাসিক নিজেই রামগতি -প্রদর্শিত ভাষাগত ত্রুটির কোনো কোনো অংশ সংশোধন করে দিয়েছেন।

'পাঠানেরা পুনর্বার মস্তকন্নোত করিল'র স্থানে ত্রয়োদশ সংস্করণে আছে, 'মস্তক উন্নত করিল।' 'ততক্ষণ নিদ্রাগমন করিও না'র স্থানে ত্রয়োদশ সংস্করণে পাচ্ছি, 'ততক্ষণ নিদ্রা যাইও না।'

আমরা এখানে কেবল দুর্গেশনন্দিনীর কথাই আলোচনা করলাম। কিন্তু কেবল দুর্গেশনন্দিনী প্রসঙ্গে নয়, সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যের পাঠ-পরিবর্তনে সমকালীন সমালোচনা কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখা আবশ্যক।[১]

১ বর্তমান লেখকের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্কিমসাহিত্যের পাঠান্তর' শীর্ষক অধ্যায় এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৪

ইন্দ্রিয় ও প্রণয় ঃ পাপপুণ্যবোধ

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষকাম-ক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপুকর্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি মহাত্মা ; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি।'

এই উক্তিটি তাঁর বিষবৃক্ষ উপন্যাস থেকে সংকলিত হলেও, এর যা বক্তব্য তা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাসেরই মুখ্য বাণী বলে মনে করি। মনুষ্যমাত্রেই ইন্দ্রিয়াধীন—এটি মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও ধর্ম। মনুষ্যপ্রকৃতির মধ্যে এমন কে আছে যে কোনরূপ রিপুর আক্রমণে কখনো বিচলিত না হয়েছে। আমরা যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিই, তেমনই ইন্দ্রিয়গুলিও নিত্যসঙ্গীর মত সর্বদাই আমাদের কাছে কাছে থাকে। মানবসংসারের মধ্যে বাস করে তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে থাকবে কে? মনুষ্যমন বিচিত্র মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত। আমার মনের ভিতর কামনা বাসনা তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষার যে আলোড়ন চলে, বহির্জগতের নিকট তার খবর কতখানি পৌঁছোয়? যে ব্যক্তি 'মহাত্মা', তাঁর মধ্যে কি রাগদ্বেষকামক্রোধাদির বীজ নেই? বঙ্কিম এ-কথা বিশ্বাস করেন না। রিপুশূন্যতা মনুষ্য মাত্রের স্বাভাবিক প্রকৃতি নয়। তবে মহাত্মা অথবা পুণ্যবান্ কে, আর পুণ্যহীন এবং পাপীই বা কে? আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল যিনি সংযত ও দমন করতে পারেন তিনিই পুণ্যাত্মা আর যে তা পারে না, চিত্তকে সংযত করবার শক্তি যার নেই সেই নীচাত্মা এবং পাপী। তুমি বিদ্বান কিংবা জ্ঞানবান, জমিদার কিংবা সম্রাট—এই দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিম মনুষ্যচরিত্র বিচার করেন নি। তুমি ধনী হও বা দরিদ্র হও, পণ্ডিত হও বা মূর্খ হও,

সমাজের মধ্যে যে-শ্রেণীভুক্ত মানুষই হও না কেন—চিত্তসংযমের যথার্থ অধিকারী কিনা এটাই তাঁর মুখ্য বিচার্য বিষয়। এই বিচারের জন্যই নগেন্দ্র দেবেন্দ্র গোবিন্দলাল প্রতাপ অমরনাথ সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনী হীরা রোহিণী শৈবলিনী লবঙ্গলতা পদ্মাবতী বা মতিবিবি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য চরিত্র বঙ্কিমসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছে।

এই প্রত্যেকটি চরিত্রই কোনো না কোনো ভাবে রিপুর স্পর্শাধীন। অর্থাৎ বিষবৃক্ষের বীজটি সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত আছে। পতঙ্গের ন্যায় মানুষ জ্ঞানবহ্নি রূপবহ্নি ধনবহ্নি ঈর্ষাবহ্নির দিকে ধাবিত হয়। চারিদিকেই বহ্নিশিখা। জ্ঞানবহ্নি ধনবহ্নি মানবহ্নি রূপবহ্নি ধর্মবহ্নি ইন্দ্রিয়বহ্নি—সংসার বহ্নিময়। বঙ্কিমের মতে, 'এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি।' উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন, 'মহাভারতকার মানবহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন; জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত 'Paradise Lost'। ধর্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেণ্ট পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ 'আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা'। রূপবহ্নির 'রোমিও ও জুলিয়েত', ঈর্ষাবহ্নির 'ওথেলো'। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহবহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি।' বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর কৃষ্ণকান্তের উইল ইত্যাদি সকল উপন্যাসেই বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত আছে। কোথাও তা অঙ্কুরিত পল্লবিত হয়েছে, কোথাও তা হয় নি। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিতেও কোনো না কোনো বহ্নির ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জ্ঞানবহ্নি রূপবহ্নি ইন্দ্রিয়বহ্নিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট উপন্যাসগুলি প্রজ্বলিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাসের নামকরণ বিষবৃক্ষ হতে পারত। বিষবৃক্ষের রূপকল্পটি বিষবৃক্ষ উপন্যাসের অনেক পূর্বেই পাই কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মধ্যে। পদ্মাবতী বা মতিবিবি প্রসঙ্গে সেখানে বলা হয়েছে, 'ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন কেহ জানিতে পারে না—কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে, রোপণকারী যথায় থাকুক না কেন, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তকোন্নত করিতে থাকে। অদ্য বৃক্ষটি অঙ্গুলি পরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ক্রমে তিল তিল বৃদ্ধি। ক্রমে বৃক্ষটি অর্ধ হস্ত, এক হস্ত,' দুই হস্ত পরিমিত হইল; তথাপি যদিও তাহাতে কাহারও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা না রহিল, তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও দেখে না। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, ক্রমে তাহার উপর চক্ষু পড়ে। আর অমনোযোগের কথা নাই,—ক্রমে বৃক্ষ বড় হয়, তাহার ছায়ায় অন্য বৃক্ষ নষ্ট করে,—চাহি কি, ক্ষেত্র অনন্যপাদপ হয়।'

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে মতিবিবি প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেছেন, 'মতির চরিত্র মহাদোষ-কলুষিত, মহদ্‌গুণেও শোভিত।' এখানে প্রশ্ন, বঙ্কিম মতির চরিত্রে দোষের অংশ কি-কি দেখলেন, এবং গুণের অংশও বা কি? মতির চরিত্রের প্রধান দোষ তার অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্তি, আর তার চরিত্রের মহৎ গুণটি হল সুগভীর প্রণয়। মতির কলুষিত চরিত্রের দিকটি কিরূপ? পাঠকের সকলেরই জানা আছে মতিবিবির আর এক নাম লুৎফ-উন্নিসা। 'লুৎফ-উন্নিসা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসিক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন। রাজধানীর অসংখ্য রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, ধর্মসম্বন্ধে তাহার কিছুই হয় নাই। লুৎফ-উন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাঁহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দমবেগবতী। ইন্দ্রিয়দমনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি। এই কার্য সৎ, এ কার্য অসৎ, এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না, যাহা ভাল লাগিত, তাহাই করিতেন। যখন সৎকর্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন সৎকর্ম করিতেন; যখন অসৎকর্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন অসৎকর্ম করিতেন; যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দম হইলে যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফ-উন্নিসা সম্বন্ধে জন্মিল। তাঁহার পূর্বস্বামী বর্তমান, ওমরাহেরা কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? প্রথমে কানাকানি, শেষ কালিমাময় কলঙ্ক রটিল।'

মতিবিবির চরিত্রে একই সঙ্গে আছে ইন্দ্রিয়বহ্নি ও ঈর্ষাবহ্নি। আগ্রাতে যদিও মতিবিবি প্রকাশ্যে বেগমের সখী, কিন্তু পরোক্ষে সে ছিল যুবরাজ সেলিমের অনুগ্রহ-ভাগিনী। সকলেই অনুভব করে বুদ্ধিমতী মতি অচিরেই যুবরাজের পাটরানী হবে। এমন সময় মেহের-উন্নিসার সঙ্গে সেলিমের সাক্ষাৎ হল এবং সেলিম সেদিনই মেহের-উন্নিসার নিকট তার চিত্ত রেখে গেল। কিন্তু উভয়ের বিবাহের সুযোগ ঘটল না। শের আফগানের সঙ্গে মেহের-উন্নিসার সম্বন্ধ পূর্বেই স্থির ছিল। কিন্তু সেলিমের চিত্তবৃত্তিসকল মতিবিবির অজ্ঞাত ছিল না; সে নিশ্চিত বুঝেছিল মহামতি আকবরের মৃত্যুর পর মেহের-উন্নিসা সেলিমের মহিষী হবেই। বাল্যসখী মেহের-উন্নিসার দাসীত্ব সহ্য করা মতিবিবির পক্ষে সম্ভবপর নয়; তাছাড়া সেলিম মতিকে উপেক্ষা করে মেহের-উন্নিসার প্রতি ব্যস্ত,—এই কারণেও সে প্রতিশোধের জন্য অতিশয় আগ্রহী হয়ে ওঠে।

এখানে পাঠকের স্মরণ রাখা আবশ্যক মতিবিবির জীবনের প্রথম পর্বের ইতিহাস। সে-জীবনে তার নাম ছিল পদ্মাবতী। অতি অল্প বয়সেই পদ্মাবতীর বিবাহ হয় নবকুমারের সঙ্গে। তের বছর বয়সে সে পিতার সঙ্গে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়েছিল, ফেরবার পথে তারা পাঠানসেনাদের হাতে পড়ে এবং শেষে বলপূর্বক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে প্রাণে নিষ্কৃতি লাভ করে। সে সময় নবকুমারের পিতা জীবিত। তিনি জাতিভ্রষ্ট বৈবাহিকের সঙ্গে জাতিভ্রষ্টা পুত্রবধূকে ত্যাগ করলেন। নবকুমারের সঙ্গে তার ত্রয়োদশী পত্নীর আর সাক্ষাৎ ঘটল না। পদ্মাবতী বিনা অপরাধে শ্বশুরগৃহ কর্তৃক পরিত্যক্ত হল।

এই পদ্মাবতীই কালক্রমে আগ্রায় মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসা। হিন্দুপত্নী আজ মনুষ্যনিগ্রহে উত্তর ভারতে মুসলমান-রমণী। একদিকে পদ্মাবতী, আর এক দিকে মতিবিবি—এই দুই স্বতন্ত্র সত্তার মধ্যে পরিশেষে কে জয়লাভ করল, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত সেই উত্তরই খুঁজেছেন। মতির চরিত্রের মহৎ গুণ সেখানেই, যেখানে সে আজিও অন্তরে নবকুমারের পরিণীতা স্ত্রী পদ্মাবতী; আর যেখানে সে মতিবিবি—কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরী মাত্র, সেখানে তার চরিত্র মহাদোষ-কলুষিত। সুদীর্ঘকাল পর যেদিন নবকুমারের সঙ্গে মতিবিবির সাক্ষাৎ ঘটল, সেদিন থেকেই মতিবিবির জীবনের পরিসমাপ্তি, পুরাতন পদ্মাবতী মতির জীবনে নূতন করে আবির্ভূত হল। পাটরানীর চিন্তা মুহূর্তে দূর হল, মেহের-উন্নিসার প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষভাব ক্রমেই প্রশমিত হল; বর্ধমানের পথে চটিতে মতি পেষমনকে জিজ্ঞাসা করে, 'পেষমন্? আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে?'

শ্বশুর গৃহ থেকে পদ্মাবতী বিতাড়িত হয়েছিল মাত্র তেরো বৎসর বয়সে, এখন 'সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর—ভাদ্র মাসের ভরা নদী।' দীর্ঘ চতুর্দশবর্ষ পর যবনবালা মতি তার স্বামী নবকুমারকে *দেখেই* চিনল 'মেরা শোহর'। নবকুমারের সাক্ষাৎ লাভের পর থেকেই মৃত পদ্মাবতী ধীরে ধীরে পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে।

এরই বিপরীত চরিত্র হিসেবে বঙ্কিম শের আগফানের স্ত্রী মেহের-উন্নিসাকে উপস্থাপিত করেছেন। প্রণয়হীন বিবাহের মূল্য কি? ধর্মতঃ মেহের-উন্নিসা শের আফগানের পত্নী, অন্তরে সে সেলিমের প্রণয়-প্রত্যাশী। মতির নিকট আগ্রায় সম্রাট আকবরের মৃত্যু সংবাদ জানার পরেই মেহের-উন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করে আপন মনে উচ্চারণ করে, 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?' মতি বলে, 'তুমি আজিও যুবরাজকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পার নাই?' তার উত্তরে মেহের-উন্নিসা আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বলে, 'কাহাকে বিস্মৃত হইব? আত্মজীবন বিস্মৃত

হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু শুন, ভগিনি! অকস্মাৎ মনের কপাট খুলিল, তুমি একথা শুনিলে; কিন্তু আমার শপথ, এ কথা যেন কর্ণান্তরে না যায়।'

এই চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মতির চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চতুর্দশবর্ষ পরেও মতিবিবি তার স্বামীকে বিস্মৃত হতে পারে নি, নিজের জীবনের দুর্ভাগ্যকে ভুলে থাকার জন্য বিলাসের মধ্যে সে আপনাকে বিসর্জন দিয়েছিল, ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে ভ্রমরীর মত ঘুরে বেড়িয়েছিল—কিন্তু একদিনের জন্যও সে সুখী হয় নি। আজ 'দিল্লীর সিংহাসন-লালসাও তাঁহার নিকট লঘু হইল। সিংহাসন যেন মন্মথশরসম্ভূত অগ্নিরাশিবেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল। রাজ্য, রাজধানী, রাজসিংহাসন সকল বিসর্জন দিয়া প্রিয়জন সন্দর্শনে ধাবিত হইলেন, সে প্রিয়জন নবকুমার।' সুতরাং মতিবিবি আগ্রা পরিত্যাগ করে সপ্তগ্রামের পথে যাত্রা করল।

আগ্রা ত্যাগ করে যাওয়ার যথার্থ কারণ কি—পেষমনের এই প্রশ্নের উত্তরে মতিবিবি যে-কথাগুলি বলে তা এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

'অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফললাভ হইল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তি জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশ্যে এত দূর করিলাম, তাহার কোন্‌টাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই তো প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আমি এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, এক দিনের তরে সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত জন্যও কখন সুখ ভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ, আরও ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু কি জন্য? এ সকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এত দিন এক দিনের তরেও সুখী হইতাম। এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্বতী নির্ঝরিণীর ন্যায়,—প্রথমে নির্মল, ক্ষীণ ধারা বিজন প্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না; আপনা আপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায়, তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। শুধু তাহাই নয়; কখনও আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয়, মকর কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দমময় হয়, লবণময় হয়, অগণ্য সৈকত চর—মরুভূমি নদীহৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই সকর্দম নদীশরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায়, কে বলিবে?'

এখানে মতিবিবির মুখে যে-কথাগুলি বিবৃত হয়েছে, সে-কথাগুলি বঙ্কিম পরবর্তী কালে প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই উপস্থিত করেছেন। ইন্দ্রিয়জনিত যে সুখ তা অল্পকাল-স্থায়ী ক্ষণিক। তাতে তৃষা বাড়ে মাত্র, কিন্তু পরিতৃপ্তি নেই। এখন প্রশ্ন, যথার্থ সুখপ্রাপ্তির উপায় কি? বিষবৃক্ষে বঙ্কিম বলেছেন, 'ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্য মাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।' কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেও দেখি কেবল ভালবাসার আকাঙ্ক্ষায় মতিবিবি ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়-সুখমণ্ডল পরিত্যাগ করল, প্রণয়কামনায় রাজসিংহাসনকামনাও পরিত্যক্ত হল।

এই কারণে মতি বলতে পারে, 'আমি এত কাল হিন্দুদিগের দেবমূর্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণমধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।' মতিবিবি নবকুমারকে দেখার পর পরিপূর্ণভাবে অনুভব করেছে—ইন্দ্রিয় নয়, প্রণয়ই যথার্থ সুখের মূল।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কোনো সমস্যারই ঠিক সমাধান ঘটান নি। সমুদ্রসৈকত থেকে কপালকুণ্ডলাকে তিনি সমাজ ও সংসারের মধ্যে নিয়ে এলেন; তারপর একটা বছর যেতে না যেতেই উপন্যাসের সমাপ্তি। পুস্তকের প্রথম সংস্করণে শুধু কপালকুণ্ডলার মৃত্যু, পরবর্তী কালের সংস্করণে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার—উভয়ের একই সঙ্গে সলিল সমাধি। না হল নবকুমার-কপালকুণ্ডলা কাহিনীর পরিসমাপ্তি, না ঘটল পদ্মাবতী-নবকুমারের জীবনের কোনো পরিণাম।

দুই

বিষবৃক্ষ উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিম অনেকগুলি মানুষের কথা বর্ণনা করেছেন নগেন্দ্র দেবেন্দ্র কুন্দ হীরা—এরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো রিপুর দ্বারা আক্রান্ত, রাগদ্বেষকামক্রোধ ইত্যাদির অস্পৃশ্য এমন কেউই নেই। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নগেন্দ্রনাথ; এই চরিত্রটিকে অধিকতর স্পষ্ট করে তুলে ধরবার জন্য অন্যান্য চরিত্রের সৃষ্টি। নগেন্দ্র দেবেন্দ্র কুন্দ হীরা—প্রত্যেকের চরিত্রেই বিষবৃক্ষের বীজ আছে। সেই বীজ কিভাবে অঙ্কুরিত পল্লবিত হল এবং তার ফল কে কিভাবে ভোগ করল—তারই ব্যাখ্যান আছে বিষবৃক্ষ উপন্যাসে। এই উপন্যাসে একটি বৃক্ষ নয়, একাধিক বৃক্ষ রয়েছে। বঙ্কিম বলেছিলেন রোমিও ও জুলিয়েত রূপবহ্নি, ওথেলো ঈর্ষাবহ্নি, আর ইন্দ্রিয়বহ্নি হল গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দর। বঙ্কিমের বিষবৃক্ষে নানান্ বহ্নি প্রজ্বলিত, একের মধ্যে অনেক।

বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রের চরিত্রের পাশাপাশি দেবেন্দ্র এবং হীরার চরিত্র স্থাপন করা হয়েছে। নগেন্দ্রের পাশে দেবেন্দ্রের চরিত্র উপস্থাপিত করে বঙ্কিম দেখাতে চেয়েছেন কে কোন্ বহ্নিতে দগ্ধ হয়েছে, এবং কার পাপের পরিমাণ কিরূপ। তুমি সামাজিক মর্যাদায় উচ্চ বলে তোমার পাপ লঘু করে দেখব আর তুমি দরিদ্র সহায়হীন, তোমার কোনো সামাজিক মর্যাদা নেই বলে একই পাপের জন্য গুরুতর অপরাধী হবে—বঙ্কিম তাঁর সাহিত্যে কখনোই তা বরদাস্ত করেন নি। দেবেন্দ্র ও নগেন্দ্রের মধ্যে মনে হয় নগেন্দ্রকে বঙ্কিম অধিকতর অপরাধী চরিত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

দেবেন্দ্র ও নগেন্দ্র উভয়েই একই বংশসম্ভূত, কিন্তু বংশের উভয় শাখার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ ও মোকদ্দমার ফলে নগেন্দ্র সকল সম্পত্তির অধিকারী ধনী জমিদার, আর দেবেন্দ্র সাধারণ পাঁচজনের মত একজন। নগেন্দ্র যে কি পরিমাণে ধনী বঙ্কিম তা উপন্যাসের গোড়ায় অতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীশচন্দ্রকে নগেন্দ্র চিঠিতে লিখেছিল, 'আর যদি বল, শাস্ত্রসম্মত হইলেও ইহা সমাজসম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব; তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি?' এই উক্তি থেকে বোঝা যায় সমাজের কোন্ উচ্চকোটিতে নগেন্দ্রের বাস ছিল। তদুপরি নগেন্দ্রের সবচেয়ে যা বড় গৌরব তা হল স্ত্রী সূর্যমুখী। অপর দিকে দেবেন্দ্রের পিতা যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিলেন তার নাম হৈমবতী। 'হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা।' বঙ্কিম জানিয়েছেন, 'যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল, তখন পর্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। লেখাপড়ায় তাহার বিশেষ যত্ন ছিল, এবং প্রকৃতিও সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই পরিণয় তাহার কাল হইল!' শেষে হৈমবতীকে পরিত্যাগ করে কলকাতায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়ে দেবেন্দ্র অতৃপ্তবিলাস-তৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হল। তারপরে দেশে ফিরে এল পাপকর্মে পরিপূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে।

দেবেন্দ্রের পাপপঙ্কে নিমজ্জনের স্বাভাবিক কারণটি বঙ্কিম সহানুভূতির সঙ্গে স্পষ্ট করে এঁকেছেন। দেবেন্দ্র বালবিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট, সূর্যমুখীর স্বামী নগেন্দ্রনাথও কুন্দনন্দিনীর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। সূর্যমুখী যার স্ত্রী, যার ধন সম্পদ মান যশ ও গৌরবের অন্ত নেই—সে কেন বিধবা রমণী কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট? কুন্দের প্রতি দেবেন্দ্র এবং নগেন্দ্রের আকর্ষণ কি একরূপ? কুন্দের প্রতি উভয়ের আকর্ষণের প্রকৃতি বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক একরূপ করে আঁকেন নি।

বন্ধু সুরেন্দ্র ও দেবেন্দ্রের কথোপকথনের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর প্রতি দেবেন্দ্রের আকর্ষণটা কিরূপ তা জানা যায়। বস্তুতপক্ষে কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্য দেবেন্দ্রকে বিমোহিত করেছিল। সুরেন্দ্র দেবেন্দ্রকে প্রশ্ন করে 'বৈষ্ণবী সেজেছিলে কার সর্বনাশ করবার জন্য ?' উত্তরে দেবেন্দ্র বলে, 'আমার চিত্ত আমার বশ নহে। আমি সকল ত্যাগ করিতে পারি, এই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করিতে পারি না। যে দিন প্রথম তাহাকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি তাহার সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া আছি। আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য আর কোথাও নাই। জ্বরে যেমন তৃষ্ণা রোগীকে দগ্ধ করে, সেই অবধি উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরূপ দগ্ধ করিতেছে। সেই অবধি আমি উহাকে দেখিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। এ পর্যন্ত পারি নাই—শেষে এই বৈষ্ণবী-সজ্জা ধরিয়াছি। তোমার কোন আশঙ্কা নাই—সে স্ত্রীলোক অত্যন্ত সাধ্বী !' সুরেন্দ্র প্রশ্ন করে, 'তবে যাও কেন ?' এর উত্তরে দেবেন্দ্রের কথাগুলি লক্ষণীয়। দেবেন্দ্র বলে, 'কেবল তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহাকে দেখিয়া, তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া, তাহাকে গান শুনাইয়া আমার যে কি পর্যন্ত তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতে পারি না।' এই কথাগুলি থেকে বেশ বোঝা যায় যে কুন্দনন্দিনীকে একটু কাছ থেকে দেখতে পাওয়া, তার সঙ্গে দুটি কথা বলা ও তাকে দুটো গান শোনাবার সুযোগ পাওয়ার মধ্যেই দেবেন্দ্রের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি। দেবেন্দ্র সব ছাড়তে পারে কিন্তু 'কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা'টুকু সে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারে না। দেবেন্দ্রের ঘর নেই সংসার নেই ধন নেই সম্পদ নেই মর্যাদা নেই। বন্ধু সুরেন্দ্র তাকে মদ্যপান না করতে বার বার অনুরোধ করায় দেবেন্দ্র বলেছিল, 'আমি কি সুখের জন্য ত্যাগ করিব ? যাহারা ত্যাগ করে, তাহাদের অন্য সুখ আছে—সেই ভরসায় ত্যাগ করে। আমার আর কোন সুখই নাই।' আরও বলে, 'যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ ?' দেবেন্দ্রের নিকট তার নিজের জীবন অর্থশূন্য, জীবনে সে নিতান্তই একক এবং বিচ্ছিন্ন। এই একাকিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতাবোধই দেবেন্দ্রকে তার অধঃপতনের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। দেবেন্দ্রের অধঃপতনে সংসারে আর কারও জীবনে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। এমন কি কুন্দও দেবেন্দ্রকে হরিদাসী বৈষ্ণবী রূপেই দেখেছে এবং জেনেছে, দেবেন্দ্র রূপে নয়।

এখন সূর্যমুখীর স্বামী নগেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর বিবাহিত জীবন

স্বল্প কালের নয়। উপন্যাসের সূচনায় নগেন্দ্রর বয়স তিরিশ, সূর্যমুখীর ছাব্বিশ। কুন্দনন্দিনীর বৈধব্যের পরে যে কাহিনী পাই, সেখানে নগেন্দ্রর বয়স পঁয়ত্রিশ এবং সূর্যমুখীর একত্রিশ।

আমাদের প্রশ্ন, কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের প্রথম আকর্ষণ কবে থেকে? কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রের প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে, না কি কুন্দের বৈধব্য ঘটবার পর থেকে? বন্ধু হরদেব ঘোষালকে নগেন্দ্র যে পত্র দেয় তাতে কুন্দনন্দিনীর রূপের কথা আছে। কুন্দর চোখ দুটি বর্ণনা করতে গিয়ে নগেন্দ্র বলে, 'বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি শরতের মত সর্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে; কিছু বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না।' উপন্যাসে এর পরে অনেকগুলি ঘটনা দ্রুত ঘটে গেছে। কলকাতায় কমলমণির বাসা থেকে নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দের গোবিন্দপুরে আগমন, তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ এবং এর তিন বৎসর পর তারাচরণের আকস্মিক মৃত্যু ও কুন্দের বৈধব্য। নগেন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছে কুন্দের চোখের দিকে তাকালেই সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তখনো কুন্দ গোবিন্দপুরে আসে নি। আর কুন্দের বৈধব্যের পর নগেন্দ্রের আচরণের অন্যমনস্কতার মধ্যেই সূর্যমুখী উপলব্ধি করেছে তার স্বামী কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত। বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে কুন্দের বিবাহ-জীবন পর্বে তার প্রতি নগেন্দ্রের আকর্ষণ বা আসক্তির কোনো চিত্র আঁকেন নি।

যাই হোক বিধবা কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের আকর্ষণের ছবি বঙ্কিম এঁকেছেন। এর ফলে দেখা দিল সংসারে রীতিমতো বিপর্যয়। সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করল, নগেন্দ্রর নববিবাহিতা পত্নী কুন্দকে বিষ খেয়ে মরতে হল, বেচারা হীরার জীবনেও করুণ পরিণাম ঘনিয়ে এল। দেবেন্দ্রের পাপের ফল তেমনভাবে কাউকে ভোগ করতে হয় নি, কারণ সংসারে দেবেন্দ্র ছিল একক এবং বিচ্ছিন্ন। কিন্তু নগেন্দ্রের পদস্খলনে সংসারে অনেকগুলি জীবনে বিপর্যয় দেখা দিল।

নগেন্দ্রের চরিত্র-পরিবর্তনে প্রথম আঘাত এসে লাগল সূর্যমুখীতে। 'দিন কয় মধ্যে, ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্তিত হইতে লাগিল। নির্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল—নিদাঘকালের প্রদোষাকাশের মত, অকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘাবৃত হইতে লাগিল। দেখিয়া সূর্যমুখী গোপনে আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন!' যে-নগেন্দ্র কখনো মদ্যপান করে নি সে এখন মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়েছে। দেবেন্দ্রকে বন্ধু সুরেন্দ্র মদ্যপান পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করেছিল; নগেন্দ্রের দুটি চরণে

হাত রেখে সূর্যমুখী একান্ত অনুনয় করে বলেছিল, 'কেবল আমার অনুরোধে ইহা ত্যাগ কর।' প্রত্যুত্তরে নগেন্দ্র বলে, 'সূর্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও। নচেৎ আবশ্যক করে না।'

দেবেন্দ্র কুন্দকে দেখার ইচ্ছাটুকু পরিত্যাগ করতে পারে নি; অপর দিকে জমিদার নগেন্দ্র তার বাড়িতে আশ্রিত বিধবা কুন্দকে সন্ধ্যার অন্ধকারে উদ্যানমধ্যে একাকী পেয়ে পিছন থেকে তার পিঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করে বলে, 'শুন কুন্দ! আমি বহু কষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি, মদ খাই। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন, কুন্দ! এখন বিধবাবিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব।' শুধু বিবাহের ইচ্ছামাত্র নয়, শেষ পর্যন্ত সূর্যমুখীর সম্মুখে নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহ ঘটেছে বর্তমান উপন্যাসে। নগেন্দ্রের তীব্র আসক্তির কাছে অসহায়া কুন্দ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বঙ্কিম নগেন্দ্রের প্রতি যে কঠিন বাক্য ব্যবহার করেছেন, উক্ত উপন্যাসে অন্য কোনো চরিত্রের প্রতি তদ্রূপ করেন নি।

নগেন্দ্র যখন সন্ধ্যায় উদ্যানমধ্যে পশ্চাৎ থেকে ধীরে ধীরে কুন্দের পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করে তখন ঔপন্যাসিক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি যে কথাগুলি বলেন তা সবিশেষ লক্ষণীয়।

বঙ্কিম বলেন, 'এই কি তোমার এত কালের সুচরিত্র! এই কি তোমার এত কালের শিক্ষা! এই কি সূর্যমুখীর প্রাণপণ প্রণয়ের প্রতিফল? ছি ছি! দেখ, তুমি চোর! চোরের অপেক্ষাও হীন। চোর সূর্যমুখীর কি করিত? তাহার গহনা চুরি করিত, অর্থহানি করিত, কিন্তু তুমি তাহার প্রাণহানি করিতে আসিয়াছ। চোরকে সূর্যমুখী কখনো কিছু দেয় নাই; তবু সে চুরি করিলে চোর হয়। আর সূর্যমুখী তোমাকে সর্বস্ব দিয়াছে—তবু তুমি চোরের অধিক চুরি করিতে আসিয়াছ! নগেন্দ্র, তুমি মরিলেই ভাল হয়। যদি সাহস থাকে, তবে তুমি গিয়া ডুবিয়া মর।' দেবেন্দ্র কারও কাছ থেকে কিছুই পায় নি—তাই সে চুরি করে কুন্দকে দেখতে চায়, লুকিয়ে তাকে গান শোনাতে চায়। আর নগেন্দ্রের কাজ 'চোরের অধিক চুরি'। সূর্যমুখীর কাছ থেকে সে সকলই পেয়েছে—তবুও কুন্দনন্দিনীতে সে আসক্ত, এমন কি তাকে পুনরায় বিবাহ পর্যন্ত করতে সে প্রস্তুত।

বঙ্কিম কি বিষবৃক্ষে ছোট চোর আর বড় চোরের ছবি আঁকতেই চেয়েছেন মাত্র?

এ কথা ঠিক যে এই উপন্যাসে দেবেন্দ্র অপেক্ষা নগেন্দ্রের অপরাধ গুরুতর ; তৎসত্ত্বেও বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রটি নগেন্দ্রনাথই। সকল পূর্ণতা এবং প্রাপ্তির মধ্যেও একটি চরিত্রে কেমনভাবে বিষবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হয়, এবং কিভাবে তা ক্রমে বৃক্ষরূপ ধারণ করে, এবং কেমন করে সেই বৃক্ষ থেকে ফল উৎপন্ন হয়—বঙ্কিম নগেন্দ্র-চরিত্রটির মধ্য দিয়ে তা দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

নগেন্দ্র চরিত্রের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য এই যে, সে চিত্তসংযমের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নি—তৎসত্ত্বেও সে চিত্তসংযমে সক্ষম হয় নি। দেবেন্দ্র ও নগেন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য এইখানে যে, দেবেন্দ্রের চিত্তসংযমে কোনো প্রবৃত্তি ছিল না ; কিন্তু নগেন্দ্রের চিত্ত-সংযমের পরিপূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শক্তি ছিল না।

চিত্তসংযমের উপায় এবং পথ কি ? 'চিত্তসংযমপক্ষে প্রথমতঃ চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্যা ; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নিভর করে। স্বতরাং চিত্তসংযমপক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরূপদেশকে কেবল শিক্ষা বলিতেছি না অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।'

বঙ্কিম এই মন্তব্যের আলোকে নগেন্দ্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্কিমের মতে চিত্তের সততা তথাকথিত অকাদেমিক শিক্ষার উপর নিভর করে না। কোনো উচ্চশিক্ষিত মানুষ মহাপাপে কলুষিত হতে পারে, আবার পাঠশালায় কখনো পাঠ গ্রহণ করে নি এমন কোনো সাধারণ লোকও মহৎ গুণে শোভিত হতে পারে।

নগেন্দ্রের চিত্তসংযমে আকুলতা ছিল, কিন্তু চিত্তসংযমের জন্য যে শিক্ষা ও যে অভ্যাসের প্রয়োজন তা তার ছিল না।

'নগেন্দ্রের এ শিক্ষা কখনও হয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্ত রূপ ; অতুল ঐশ্বর্য ; নীরোগ শরীর ; সর্বব্যাপিনী বিদ্যা ; সুশীল চরিত্র ; স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী, এ সকল এক জনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই ঘটিয়াছিল। প্রধানপক্ষে, নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণেই চিরকাল সুখী ; তিনি সত্যবাদী, অথচ প্রিয়ংবদ ; পরোপকারী, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ ; দাতা, অথচ মিতব্যয়ী ; স্নেহশীল, অথচ কর্তব্যকর্মে স্থিরসঙ্কল্প। পিতা, মাতা বর্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন ; ভার্যার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন ; বন্ধুর হিতকারী ; ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান্ ; অনুগতের প্রতিপালক ; শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ ; কার্যে সরল ; আলাপে নম্র ; রহস্যে বাঙ্ময়। এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ ;

—নগেন্দ্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান, বিদেশে যশঃ; অনুগত ভৃত্য; প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি; সূর্যমুখীর নিকট অবিচলিত, অপরিমিত, অকলুষিত স্নেহরাশি।' —এমন চরিত্রের যে মানুষ তাকে মহাত্মা বলব না তো কি? কিন্তু এইরূপ চরিত্রবানের চরিত্রেও বঙ্কিম যখন চিত্ত-সংযমের অভাব লক্ষ্য করেন, তখন প্রচণ্ড তিরস্কার সহকারে তাকে বলেন, 'এই কি তোমার এত কালের সুচরিত্র?—ছি ছি! দেখ, তুমি চোর! চোরের অপেক্ষাও হীন।...নগেন্দ্র, তুমি মরিলেই ভাল হয়।' মনে রাখতে হবে, এই কথাগুলি উপন্যাসে অপর কোনো চরিত্রের মুখ থেকে নয়, স্বয়ং ঔপন্যাসিকের লেখনী থেকে বেরিয়েছে। যে নগেন্দ্রের জীবনে কোনো দিকে কখনো সুখের অভাব ছিল না, তার জীবনে বিষাদের কালো ছায়া কেমন করে ঘনিয়ে এল? বঙ্কিমের উত্তর, 'যদি তাঁহার কপালে এত সুখ না ঘটিত, তবে তিনি কখনও এত দুঃখী হইতেন না।' বঙ্কিম আরও বলেন, 'দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুব্ধ-লোচনে দেখিবার পূর্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই; কেন না, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সংবরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এইজন্যই তিনি চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল; পূর্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।' আত্মচরিতার্থ নগেন্দ্রকে কখনও অন্য বিষয়ে প্রলুব্ধ হতে হয় নি। তার কোনো দিনই কোনো বিষয়েই অভাব ছিল না। অভাব থেকেই আসে প্রলোভন। নগেন্দ্রনাথ ছিল জীবনে অবিচ্ছিন্ন সুখী মানুষ—তার কখনও অভাববোধ ছিল না, তাই দুঃখবোধও ছিল না, তাই কোনো দিন লোভেরও বশবর্তী তাকে হতে হয় নি, আর সেই কারণে লোভ সংবরণ করবার মানসিক অভ্যাস বা শক্তি তার আদৌ হয় নি। কুন্দনন্দিনীর প্রতি লুব্ধ হয়ে নগেন্দ্র বারে বারে চিত্তসংযমের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চিত্তসংযমের প্রবৃত্তি থাকলেই চিত্তসংযম করা যায় না। নগেন্দ্রও শেষ পর্যন্ত চিত্তসংযমে অক্ষম হয়েছিল। চিত্তসংযমে নগেন্দ্রের যথেষ্ট প্রবৃত্তি ছিল, কিন্তু এই সংযমের জন্য যে অভ্যাস ও শিক্ষার প্রয়োজন, নগেন্দ্রের তা কোনো-দিন ছিল না বলেই সে চিত্তদমনে সফল হতে পারে নি।

বঙ্কিম মনে করেন চিত্তস্খলনের হাত থেকে মানুষের উদ্ধারের উপায় প্রায়শ্চিত্ত। নগেন্দ্র সম্পর্কে তিনি বলেন, 'তাঁহার দোষ গুরুতর; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।'

নগেন্দ্রের প্রায়শ্চিত্তের প্রসঙ্গ আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়।

তিন

চিত্তদমনে প্রবৃত্তির দিক থেকে নগেন্দ্রের সঙ্গে হীরার চরিত্র তুলনীয়।

নগেন্দ্র জমিদার, হীরা জমিদার বাড়ির সামান্য দাসীমাত্র। একজন সমাজের অতি উচ্চ কোটির সম্ভ্রান্ত মানুষ, আর একজন সমাজের একেবারে নিম্ন কোটির অশিক্ষিত দরিদ্র বিধবা যুবতী দাসী। 'কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষকামক্রোধাদির অস্পৃশ্য।' এই দিক থেকে নগেন্দ্রও যেখানে হীরাও সেখানে। চিত্তসংযমে নগেন্দ্রের প্রবৃত্তি ছিল, কিন্তু সে সক্ষম হয় নি ; বঙ্কিম দেখিয়েছেন চিত্ত-সংযমে হীরারও আন্তরিক প্রবৃত্তি ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও চিত্তসংযমে সক্ষম হয় নি। নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র এক বংশসম্ভূত, আত্মীয়তার সূত্রে উভয়ের নিকট সম্বন্ধ ; অপর দিকে নগেন্দ্র ও হীরা সমাজের সম্পূর্ণ দুই বিপরীত কোটির চরিত্র, কিন্তু চিত্ত-সংযমের প্রবৃত্তির দিক থেকে উভয় চরিত্রের মানসিক নৈকট্য বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র নগেন্দ্রনাথ, অতঃপর এই গ্রন্থের সর্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য চরিত্র সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনী কমলমণি শ্রীশচন্দ্র বা দেবেন্দ্র নয়, সে চরিত্রের নাম হীরা। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে প্রধান পুরুষ চরিত্র নগেন্দ্র, প্রধান স্ত্রী চরিত্র হীরা। মুখ্যতঃ নগেন্দ্র ও হীরার চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বঙ্কিম এই উপন্যাসের নামকরণ করেন বিষবৃক্ষ। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের কয়েকটি পরিচ্ছেদের নামকরণের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পরিচ্ছেদগুলি নগেন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও হীরার বিষবৃক্ষ—এই দুই পৃথক শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা গেল।

(ক) নগেন্দ্রের বিষবৃক্ষ	(খ) হীরার বিষবৃক্ষ
অঙ্কুর	হীরার কলহ—বিষবৃক্ষের মুকুল
বিষবৃক্ষ কি	হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত
বিষবৃক্ষের ফল	হীরার বিষবৃক্ষের ফল

পরিচ্ছেদগুলির নামের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, বঙ্কিম এই উপন্যাসে নগেন্দ্র ও হীরার বিষবৃক্ষে কেমন করে অঙ্কুর থেকে ফলোৎপত্তি হল তারই বর্ণনা করেছেন। আমার মনে হয় বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দুটি—নগেন্দ্র ও হীরা। কুন্দনন্দিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে নগেন্দ্রের চিত্তবিক্ষেপ ঘটেছিল। ইন্দ্রিয়াসক্তি ও প্রণয় এক নয়। ইন্দ্রিয়বহ্নিতে নগেন্দ্রচরিত্র দগ্ধ হয়েছিল, হীরা কিন্তু ঠিক ইন্দ্রিয়বহ্নিতে

নয়, তার দাহ হন মূলতঃ ঈশ্বরবহ্নিতে। আগুনকে যে নামেই ডাকি না কেন তার দহন শক্তি সর্বত্রই সমান।

নগেন্দ্র মনে করেছিল, কুন্দের প্রতি তার যে অনতিক্রম্য আকর্ষণ আসলে তা প্রণয়। বন্ধু হরদেব ঘোষালকে নগেন্দ্র যে পত্র দেয় তার উত্তরে বঙ্কিম হরদেব ঘোষালের কলম দিয়ে লিখেছেন, 'রূপবতীর রূপভোগলালসা, ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্যকবিরা মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্তসহায় হইয়া, মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্রকণ্ডূয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্মমৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহমাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বরপ্রেরিতা; ইহা দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে, এবং ইহা সর্বজীবমুগ্ধকরী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি,—বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণ সকল যখন বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা, এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল, সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জন। এই যথার্থ প্রণয়; সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জন। আমি ইহাকে ভালবাসা বলি।' নগেন্দ্র সূর্যমুখীর প্রণয় পরিত্যাগ করে, কুন্দনন্দিনীর রূপজমোহে আকৃষ্ট হয়েছিল। চিত্তসংযমে তার আগ্রহ ছিল কিন্তু চিত্তদমনের শক্তি তার ছিল না। তাই নগেন্দ্রের চিত্তপ্রাঙ্গণে বিষবৃক্ষের অঙ্কুর দ্রুত বৃক্ষে পরিণত হয়ে ফলোৎপাদন করে।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে হীরার পরিচয় হীরা শীর্ষক পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

'হীরার বয়স বিংশতি বৎসর। বয়সে সে প্রায় অন্যান্য দাসীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা। তাহার বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্রগুণে সে দাসীমধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণিত হইয়াছিল।

হীরা বাল্যবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন তাহার স্বামীর কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেও কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করিত, এবং বেশবিন্যাসে বিশেষ প্রীতা ছিল।'

এই হল হীরার গোড়ার কথা। বঙ্কিম হীরা সম্পর্কে যে কথাটি পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করেছেন তা হল—হীরার চরিত্রে কেউ কোনো কলঙ্ক শোনে নি। এখন প্রশ্ন, হীরার চিত্তভূমিতে কেমন করে বিষবৃক্ষের মুকুল দেখা দিল?

আমরা পূর্বেই বলেছি, বিষবৃক্ষ উপন্যাসে ঈর্ষাবহ্নির উদাহরণ হীরা। এই উপন্যাসের ঊনবিংশ বিংশ ও একবিংশ পরিচ্ছেদের শিরোনাম লক্ষণীয়। পরিচ্ছেদ তিনটি হল হীরার রাগ, হীরার দ্বেষ, এবং হীরার কলহ—বিষবৃক্ষের মুকুল। অর্থাৎ এই রাগ দ্বেষ কলহই হল হীরার বিষবৃক্ষের মুকুল। গ্রন্থের ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিম নগেন্দ্র প্রসঙ্গে যে কথাটি বলেছিলেন সে কথাটি আবার একবার স্মরণ করি। বঙ্কিম বলেছিলেন, 'কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগ-দ্বেষকামক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপুকর্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন।' যেখানে নগেন্দ্রের ন্যায় 'জ্ঞানী ব্যক্তি'ও রিপু কর্তৃক বিচলিত হয়; সেখানে সাধারণ গ্রাম্য দরিদ্র অশিক্ষিত চিরসুখবঞ্চিত বালবিধবা যুবতী হীরার পক্ষে রিপু কর্তৃক বিচলিত হওয়া কিছুমাত্রই অস্বাভাবিক নয়।

হীরার রাগের প্রথম কারণ, দেবেন্দ্র কুন্দের প্রতি আকৃষ্ট—হীরার প্রতি নয়। দ্বিতীয় রাগ সূর্যমুখীর উপর। 'সূর্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এইজন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট,—সে মুনিব, আমি বাঁদী। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ।' হীরার চরিত্রে এই রাগ ও দ্বেষ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত।

হীরার মনের চিন্তা-ভাবনাগুলি ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের আনুকূল্য লাভ করেছে।

বঙ্কিম প্রশ্ন করেছেন, 'হীরে! মুখখানি ত দেখিতে মন্দ নয়—বয়সও নবীন, তবে হৃদয়মধ্যে এত খলকপট কেন?' উত্তর বঙ্কিমই দিয়েছেন, 'কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিল কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়। হীরাকে সূর্যমুখীর আসনে বসাইলে হীরার কি খলকপট থাকিত?'

হীরা তিনটি কথা চিন্তা করল। (ক) 'এ জন্মের সুখদুঃখ অনেক কাল ঠাকুরকে দিয়াছি। তাই বলিয়া কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে দিতে পারিব না। সে কথা মনে হলেও গা জ্বালা করে; বরং কুন্দ যাহাতে কখনও তার হাতে না পড়ে, তাই করিব।' (খ) 'সূর্যমুখীর থেঁাতা মুখ ভোঁতা হবে? দেবতা করিলে হতেও পারে।' (গ) 'কুন্দের উপর নগেন্দ্রবাবুর চোখ পড়েছে—বাবু এখন কুন্দমন্ত্রের উপাসক। বড়মানুষ লোক, মনে করিলেই পারে। পারে না কেবল সূর্যমুখীর জন্য। যদি দুজনে একটা চটাচটি হয়, তা হলে আর বড় সূর্যমুখীর খাতির করবে না। এখন যাতে একটু চটাচটি হয়, সেইটে আমায় করিতে হবে।...নগেন্দ্রকে কুন্দনন্দিনী

দিব। কিন্তু হঠাৎ না। আগে কিছু দিন লুকিয়ে রেখে দেখি। প্রেমের পাক বিচ্ছেদে। বিচ্ছেদে বাবুর ভালবাসাটা পেকে আসবে। সেই সময়ে কুন্দকে বাহির করিয়া দিব। তাতে যদি সূর্য্যমুখীর কপাল না ভাঙ্গে, তবে তার বড় জোর কপাল।'

এক দিকে হীরার চিত্ত ঈর্ষাবহ্নিতে জ্বলেছে. আর এক দিকে তার মন ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এক সময় সেই আকর্ষণ অতি তীব্র হয়। হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি ঘটে। 'দেবেন্দ্র হীরার মুখে অর্ধব্যক্তস্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।' কিন্তু এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, হীরা দেবেন্দ্রকে মন দিতে চেয়েছে একমাত্র দেবেন্দ্রের মনের বিনিময়ে। ব্র্যাণ্ডিপায়ী দেবেন্দ্রের ইন্দ্রিয়াসক্তির নিকট হীরা কখনই বশ্যতা স্বীকার করে নি। উপন্যাসের চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে হীরা দেবেন্দ্রকে যে সকল কথা বলে তার গুরুত্ব কম নয়। হীরা দেবেন্দ্রের নিকট তার মন সমর্পণ করলেও, দেবেন্দ্রকে সে কিছুমাত্র অগ্রসর হতে দেয় না। সে পরিষ্কারভাবে দেবেন্দ্রকে জানিয়ে দেয়, 'আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই—কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই—বড়মানুষের বউ হইলে কি হইতাম, বলিতে পারি না।' বালবিধবা হীরা দরিদ্র এবং দাসীমাত্র। অন্তরে দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি আকুলতা তার যত গভীরই হোক, যে-মুহূর্তে সে বুঝেছে দেবেন্দ্রের মন ভালবাসাশূন্য এবং তার আকর্ষণ কেবল হীরার রূপযৌবনেরই প্রতি, সেই মুহূর্তে হীরা দেবেন্দ্রকে নিজের ঘর থেকে বিতাড়িত করে দেয়।

অপরদিকে কুন্দনন্দিনীকে সন্ধ্যার অন্ধকারে নগেন্দ্র স্পর্শ করে। সেই অন্ধকারে কুন্দ পিছন ফিরে দেখামাত্র চিনতে পারে—নগেন্দ্র। বঙ্কিম কুন্দনন্দিনীকে উদ্দেশ করে বলেন, 'ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি! তুমি চোরের স্পর্শে কাঁপিলে কেন? ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি!—চোরের কথা শুনিয়া তোমার গায়ে কাঁটা দিল কেন? কুন্দনন্দিনি! —দেখ, পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার, সুশীতল, সুবাসিত—বায়ুর হিল্লোলে তাহার নীচে তারা কাঁপিতেছে। ডুবিবে? ডুবিয়া মর না?' কুন্দ নগেন্দ্রের আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে নি; দেবেন্দ্রের আসক্তির নিকট কিন্তু হীরা নতি স্বীকার করে না। সে দেবেন্দ্রের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করে কঠোর ভাষায়। ফলে দেবেন্দ্র হীরার কাছে এগোতে পারে না।

ভালবাসার জন্য হীরার চিত্ত সর্বদা পিপাসিত, কিন্তু সেজন্য সে ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নয় আদৌ। এ-বিষয়ে হীরা চিত্তসংযমে সর্বাধিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে।

হীরা দেবেন্দ্রকে যে-কথা বলে তা উদ্ধারযোগ্য। হীরা বলে, 'আমি আপনার উপহাসের যোগ্য নই—আপনাকে অতি অধম লোকে ভালবাসিলেও, তাহার ভালবাসা লইয়া তামাসা করা ভাল নয়। আমি ধার্মিক নহি, ধর্ম বুঝি না—ধর্মে আমার মন নাই। তবে যে আমি কুলটা নই বলিয়া স্পর্ধা করিলাম, তাহার কারণ এই, আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভালবাসার লোভে পড়িয়া কলঙ্ক কিনিব না। যদি আপনি আমাকে একটুকুও ভালবাসিতেন, তাহা হইলে আমি এ প্রতিজ্ঞা করিতাম না—আমার ধর্মজ্ঞান নাই, ধর্মে ভক্তি নাই—আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভালবাসেন না—সেখানে কি সুখের জন্য কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে আমার গৌরব ছাড়িব? আপনি যুবতী স্ত্রী হাতে পাইলে কখন ছাড়েন না, এজন্য আমার পূজা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু কালে আমাকে হয়তো ভুলিয়া যাইবেন, নয়তো যদি মনে রাখেন, তবে আমার কথা লইয়া দলবলের কাছে উপহাস করিবেন—এমন স্থানে কেন আমি আপনার বাঁদী হইব? কিন্তু যে দিন আপনি আমাকে ভালবাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণ সেবা করিব।'

দেবেন্দ্রের চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি ছিল না; নগেন্দ্রের চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না; চিত্তসংযমে বিলক্ষণ যার ক্ষমতা ছিল সে হীরা।

'কার্পাসবস্ত্রমধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায়,দেবেন্দ্রের নিরুপম মূর্তি হীরার অন্তঃকরণকে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতেছিল। অনেক বার হীরার ধর্মভীতি এবং লোকলজ্জা, প্রণয়বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল; কিন্তু দেবেন্দ্রের স্নেহহীন ইন্দ্রিয়পর চরিত্র মনে পড়াতে আবার তাহা বদ্ধমূল হইল। হীরা চিত্তসংযমে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালিনী এবং সেই ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, সে বিশেষ ধর্মভীতা না হইয়াও এ পর্যন্ত সতীত্বধর্ম সহজেই রক্ষা করিয়াছিল। সেই ক্ষমতা-প্রভাবেই, সে দেবেন্দ্রের প্রতি প্রবলানুরাগ অপাত্রন্যস্ত জানিয়া সহজেই শমিত করিয়া রাখিতে পারিল। বরং চিত্তসংযমের সদুপায়স্বরূপ হীরা স্থির করিল যে, পুনর্বার দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিবে।' হীরার যে চিত্তসংযম, তা ধর্মভয়ের কারণে নয়; চিত্তসংযমে অভ্যাস এবং শিক্ষা ছিল বলেই হীরা চিত্তসংযমে সক্ষম হয়েছিল।

হীরাচরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল, সে কামরিপুর আক্রমণ দমন করতে পারে কিন্তু ঈর্ষাবহ্নিকে সে কিছুতেই প্রশমিত করতে পারে না। 'হীরা আপন নিষ্ফল প্রণয় যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর প্রতি দেবেন্দ্রের অনুরাগ সহ্য করিতে পারিল না।' ফলে ঈর্ষাবশত সহজেই কুন্দের

প্রতি তার ক্রোধ জন্মাল ; এই ক্রোধের কারণেই হীরা কুন্দের সর্বনাশে নিযুক্ত হল।

শুধু কুন্দের সর্বনাশ নয়, এক সময় হীরার জীবনে সর্বনাশ অতি দ্রুত নেমে আসে। হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত অধ্যায়ে দেবেন্দ্রের কপট প্রেমাভিনয়কে হীরা দেবেন্দ্রের যথার্থ প্রণয় এবং ভালবাসা বলে অনুভব করল। 'হীরা যদি বিমলচিত্ত হইত, এবং তাহার বুদ্ধি সৎসংসর্গ-পরিমার্জিত হইত, তবে সে মনে করিত, এই নরক।' বঙ্কিম বলছেন, 'হীরা চিত্ত সংযম করিতে জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া, সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রকে অপ্রণয়ী জানিয়া চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাও অল্পদূরমাত্র, কিন্তু যতদূর অভিলাষ করিয়াছিল, তত দূর কৃতকার্য হইয়াছিল। দেবেন্দ্রকে অঙ্কাগত প্রাপ্ত হইয়া, হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে প্রেম স্বীকার করিয়াও, অবলীলাক্রমে তাহাকে বিমুখ করিয়াছিল। আবার সেই পুষ্পগত কীটানুরূপ হৃদয়বেধকারী অনুরাগকে কেবল পরগৃহে কার্য উপলক্ষ করিয়া শমিত করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার বিবেচনা হইল যে, দেবেন্দ্র প্রণয়শালী, তখন আর তাহার চিত্তদমনে প্রবৃত্তি রহিল না। এই অপ্রবৃত্তি হেতু বিষবৃক্ষে তাহার ভোগ্য ফল ফলিল।' পুনরায় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কথাটি স্মরণ করা যাক—'চিত্তসংযমপক্ষে প্রথমতঃ চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক।' নগেন্দ্রের চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি ছিল কিন্তু শক্তি ছিল না ; হীরার চিত্তসংযমে শক্তি ছিল কিন্তু যে মুহূর্তে কপট দেবেন্দ্রকে সে প্রণয়শালী মনে করে সেই মুহূর্তে চিত্তদমনে তার অপ্রবৃত্তি জন্মে।

যে অধ্যায়ের নাম 'হীরার বিষবৃক্ষের ফল', সেই অধ্যায়ে বঙ্কিম প্রথমেই জানিয়েছেন, 'হীরা মহারত্ন কপর্দকের বিনিময়ে বিক্রয় করিল। ধর্ম চিরকষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু এক দিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়। হীরার তাহাই হইল। যে ধনের লোভে হীরা এই মহারত্ন বিক্রয় করিল, সে এক কড়া কাণা কড়ি। কেন না, দেবেন্দ্রের প্রেম বন্যার জলের মত ; যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে বন্যার জল সরিয়া গেল, হীরাকে কাদায় বসাইয়া রাখিয়া গেল।' অতঃপর হীরার বিষবৃক্ষের ফল ক্রমেই পরিপাক এবং হীরার পক্ষে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল—তা তার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভবপর ছিল না।

আমরা পূর্বেই বলেছি, অধ্যায় নাম থেকে দেখা গেছে এই উপন্যাসে দুটি বিষবৃক্ষ রয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের 'সমাপ্তি' অধ্যায়ে দেবেন্দ্রের বিষবৃক্ষেরও উল্লেখ আছে একবার। বলা হয়েছে, 'দেবেন্দ্রের রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিয়াছিল।

সে অতি কদর্য রোগগ্রস্ত হইয়াছিল।' কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর এক বৎসর কালের মধ্যে দেবেন্দ্রেরও মৃত্যু ঘটল।

'দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর, কত দিন তাহার উদ্যানমধ্যে নিশীথ সময়ে রক্ষকে ভীতচিত্তে শুনিয়াছে যে, স্ত্রীলোক গায়িতেছে—স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারং।'

নগেন্দ্রের কথা দিয়ে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের সূচনা, হীরার হাহাকারের মধ্যে এই উপাখ্যানের পরিসমাপ্তি।

চার

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তিনটি—চন্দ্রশেখর শৈবলিনী ও প্রতাপ। এই উপন্যাসেও বঙ্কিম পাপাত্মা কে এবং পুণ্যাত্মাই বা কে খুঁজে দেখতে চেয়েছেন। উপন্যাসের বিভিন্ন খণ্ডের শিরোনামগুলিও লক্ষণীয়। কোনোটি পাপীয়সী, কোনোটি পাপ, কোনোটি পুণ্যের স্পর্শ, কোনোটি প্রায়শ্চিত্ত, ইত্যাদি। বঙ্কিমের মতে মানুষ পতঙ্গবৎ, কোনো না কোনো বহ্নির প্রতি মনুষ্যচিত্ত ধাবিত হয়। পূর্বেই আমরা বঙ্কিমের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছি: 'এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি।' এখন প্রশ্ন, চন্দ্রশেখর উপন্যাসে কোন্ বহ্নির দাহ আছে? এখানে দ্বিবিধ বহ্নির দাহ বর্ণিত হয়েছে বলে মনে হয়। প্রথম জ্ঞানবহ্নি ও দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়বহ্নি। জ্ঞানবহ্নির উদাহরণ চন্দ্রশেখর; ইন্দ্রিয়বহ্নির উদাহরণ শৈবলিনী ও প্রতাপ।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে শৈবলিনীকে পাপাত্মা ও প্রতাপকে পুণ্যাত্মা রূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-মধ্যে প্রতাপ চরিত্র রচনা কালে লিখছেন, 'তাঁহার চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী-কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।' এখানে প্রশ্ন, শৈবলিনী পাপীয়সী কেন, আর প্রতাপ কি কারণেই বা মহাত্মা? এর মুখ্য কারণ হল প্রতাপের চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি ও শিক্ষা দুই-ই ছিল, শৈবলিনীর চিত্তদমনে প্রবৃত্তি ও অভ্যাস কোনটাই ছিল না।

শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে ত্যাগ করে প্রতাপের মোহে পতঙ্গবৎ তার প্রতি ধাবিত হয়েছিল। নতুবা লরেন্স ফষ্টরের সাধ্য ছিল না শৈবলিনীকে অপহরণ করে।

শৈবলিনী প্রতাপকে স্পষ্টই বলেছে, 'আমার এ দুর্দশা কাহা হতে? তোমা হতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য

দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য আমি গৃহধর্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য।'

প্রতাপ বলে, 'আমার দোষ! ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?'

শৈবলিনী গর্জে উঠে বলে, 'তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল?'

প্রতাপের কথায় আমরা দেখেছি, প্রতাপ শৈবলিনীকে বলেছে 'তুমি পাপিষ্ঠা'। এখন প্রশ্ন, প্রতাপের রূপে শৈবলিনী মুগ্ধ, কিন্তু শৈবলিনীর প্রতি কি প্রতাপ আকৃষ্ট নয়? কাহিনীর মধ্যে বঙ্কিম স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন—প্রতাপের চিত্তের গভীরে শৈবলিনী অনেকখানি স্থান অধিকার করে রয়েছে। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনী আকৃষ্ট, আবার শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের আকর্ষণ কিছুমাত্র কম নয়। শৈবলিনী বিবাহিতা, তার স্বামী চন্দ্রশেখর; অপরদিকে প্রতাপও বিবাহিত, তার পত্নী রূপসী। তবুও তৃতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, অগাধ জলে সাঁতার অধ্যায়ে, প্রতাপ নিজের ঘরের কথা ভুলে গিয়ে, আপন স্ত্রী রূপসীর কথা বিস্মৃত হয়ে শৈবলিনীর হাত ধরে জলে ডুব দিয়ে মরতে চেয়েছিল—আত্মবিসর্জনের জন্য সে ব্যাকুল হয়েছিল।

প্রতাপ শৈবলিনীকে বলেছিল, 'আমার শপথ কর, নহিলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ করিয়া এ পাপ জীবনের ভার সহিতে চায়? চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?'

কমলাকান্তের বঙ্কিম বলেছিলেন, 'আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।'

এ কথা প্রতাপ যথার্থ অনুভব করেছিল।

শৈবলিনী প্রতাপকে বলেছিল, 'এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে,

প্রতাপ?' আকণ্ঠ গঙ্গার জলে নিমজ্জিত প্রতাপ শৈবলিনীকে সংক্ষেপে অতি স্পষ্ট উচ্চারণে বলেছিল—'আমি!'

উভয়ের কথা থেকে জানা গেল, শৈবলিনী ও প্রতাপ উভয়েই দুঃখী। শৈবলিনী চিরকাল জীবনে প্রতাপের শূন্যতায় দুঃখভোগ করেছে। কিন্তু প্রতাপের অভাব কোথায়? শৈবলিনী প্রতাপকে বলেছিল, 'তোমার ঐশ্বর্য আছে—বল আছে—কীর্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে।' প্রতাপের তবে অভাব কোথায়, শূন্যতা কোথায়, দুঃখ কোথায়? তবু প্রতাপ সুখী নয়। শৈবলিনী দুঃখী, প্রতাপও দুঃখী। শৈবলিনীর মতই প্রতাপ দুঃখী।

তবে প্রতাপ ও শৈবলিনীর মধ্যে প্রভেদ কোথায়? কেনই বা প্রতাপ মহাত্মা, আর কি কি কারণে শৈবলিনী পাপিষ্ঠা বা পাপীয়সী? শৈবলিনীর পাপ কোথায় তা শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের উক্তির মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পেরেছি। শৈবলিনীর প্রবৃত্তির দোষেই শৈবলিনী পাপিষ্ঠা।

প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর ছিল মোহ, অপর দিকে শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের ছিল অন্তরের গভীরতম অনুচ্চারিত অব্যক্ত ভালবাসা। রূপজ মোহেই বঙ্কিমের আপত্তি, নতুবা গভীর প্রণয় বা ভালবাসায় তাঁর আপত্তি নেই। মৃণালিনীতে আছে 'পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে; কেন না প্রণয় অমূল্য।' বিষবৃক্ষে হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে চিঠিতে লিখেছিল, রূপজ মোহ হল গুরুতর দোষের বিষয়, কিন্তু যথার্থ প্রণয়ের মধ্যে কোনো পাপ নেই। কুন্দের প্রতি রূপজ মোহ জন্মেছিল বলেই নগেন্দ্র অপরাধী। হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে লেখে, 'ভালবাসায় কখন অযত্ন করিবে না; কেন না ভালবাসাতেই মনুষ্যের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।' শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের কোনো রূপজ মোহ ছিল না, যা ছিল তার নাম আন্তরিক প্রণয় বা প্রীতি। শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের যে প্রণয় তার অপর নাম আত্মবিসর্জন। শৈবলিনী প্রবৃত্তিদমনে অপারগ ছিল—নগেন্দ্র দেবেন্দ্র হীরা গোবিন্দলাল রোহিণী কেউই প্রবৃত্তিদমনে শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে নি; এ দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে শ্রেষ্ঠ চরিত্র প্রতাপ। প্রতাপ বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও প্রণয়তত্ত্বের আদর্শ প্রতিনিধি।

রমানন্দস্বামী উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে মৃতপ্রায় প্রতাপকে জিজ্ঞাসা

করেছিলেন, 'তুমি কি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে ?' মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতাপের সেই আশ্চর্য স্বীকারোক্তি এখানে উদ্ধার করি।—

'কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী ? এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আমি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবনবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। যখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন ? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম।'

প্রতাপের মুখনিঃসৃত এই কথা কয়টি শুনে রমানন্দস্বামী আশ্চর্য হলেন, অভিভূত হলেন। পরলোকযাত্রী প্রতাপের দিকে তাকিয়ে রমানন্দস্বামী বললেন, 'ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী।'

মৃত প্রতাপের উদ্দেশে বঙ্কিমের শেষ কথা—'তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও! যেখানে, রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্যময় লোকে যাও!'

বঙ্কিম অনন্তধামের যে স্বপ্ন রচনা করেছেন, মর্ত্যধামে তারই বাস্তব রূপ প্রত্যাশা করেছেন অনুক্ষণ।

সেই প্রত্যাশাই দৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে ব্যক্ত হয়েছে কমলাকান্তে। বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'যত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, দার্শনিক, সংসারতত্ত্ববিৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না। নাই। আমি মরিয়া ছাই হইব. আমার নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ

আশা একদিন ফলিবে! ফলিবে, কিন্তু কত দিনে! হায়, কে বলিবে, কতদিনে!'

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমকে বলেছিলেন—'অমরনাথ ও প্রতাপ একই চরিত্রের দুই রূপ।' উত্তরে বঙ্কিম বলেছিলেন—'প্রতাপ বরাবর ঐশ্বর্যশালী, তথাপি ইন্দ্রিয়জয়ী, কিন্তু অমরনাথ অবস্থার পরিবর্তনে মনঃসংযম করিতে পারিয়াছিলেন।'

রজনী উপন্যাসের লবঙ্গলতার সঙ্গে শৈবলিনীর চরিত্র তুলনীয়। শৈবলিনী ও লবঙ্গলতা প্রায় সমবয়সী। লবঙ্গর বয়স উনিশ, আর তার স্বামীর বয়স তেষট্টি। লবঙ্গ রামসদয়বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। এক সময়ে তার জীবনে অমরনাথ এসেছিল; কিন্তু আজ সে পরিপূর্ণরূপে রামসদয়ের পত্নী—'আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী।' চন্দ্রশেখরের প্রতি শৈবলিনীর ভালবাসা জন্মায় নি। অপর দিকে স্বামীর প্রতি লবঙ্গর ভালবাসা তুলনাহীন। বঙ্কিম লিখছেন, 'লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে, একটি এই যে, তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসিতেন কিনা সন্দেহ।' চন্দ্রশেখর উপন্যাসের শেষে শৈবলিনী প্রতাপকে বলেছিল, 'তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।…এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।' অপর দিকে রজনীর শেষাংশে লবঙ্গলতা অমরনাথকে বলে, 'তুমি আমার কে? তাত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—', লবঙ্গলতা কথা শেষ করতে পারে না, চুপ করে থাকে। অমরনাথ জিজ্ঞাসা করে, 'যদি লোকান্তর থাকে, তবে?' লবঙ্গ বলে, 'আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।' অমরনাথ দেখতে পেল লবঙ্গ কাঁদছে। প্রতাপ চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বঙ্কিম যে অনন্তধামের স্বপ্ন দেখেছিলেন লবঙ্গলতা ও অমরনাথের কাহিনী রচনাকালে সেই পুণ্য অনন্তধামের স্বপ্ন তিনি আরও একবার দেখলেন।

পাঁচ

চন্দ্রশেখর উপন্যাস আলোচনার প্রারম্ভেই বলেছিলাম, এই গ্রন্থে জ্ঞানবহ্নির উদাহরণ চন্দ্রশেখর চরিত্র। উপন্যাসের উপক্রমণিকা অংশের তৃতীয় পরিচ্ছেদেই চন্দ্রশেখরের বিবাহ হয় শৈবলিনীর সঙ্গে।

সেযুগের পক্ষে বত্রিশ বছর বয়সে বিবাহ করা মানে যথেষ্ট পরিমাণ বিলম্বে

অত্যন্ত পরিণত বয়সে বিবাহিত হওয়া। চন্দ্রশেখর বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করে শেষে শৈবলিনীকে বিবাহ করে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, এতকালের পরে কিসের আকর্ষণে কোন্ প্রয়োজনে চন্দ্রশেখরের অকস্মাৎ এই বিবাহ-পরিকল্পনা ?

চন্দ্রশেখর সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের মন্তব্য, 'তিনি গৃহস্থ, অথচ সংসারী নহেন। এ পর্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই, দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিক কাল গত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জনের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ, স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়; অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিঘ্ন। দ্বিতীয়তঃ, দেবসেবা আছে, ঘরে শালগ্রাম আছেন। তৎসম্বন্ধীয় কার্য স্বহস্তে করিতে হয়, তাহাতে কালাপহৃত হয়—দেবতার সেবার সুশৃঙ্খলা ঘটে না—গৃহধর্মের বিশৃঙ্খলা ঘটে—এমন কি, সকল দিন আহারের ব্যবস্থা হইয়া উঠে না। পুস্তকাদি হারাইয়া যায়, খুঁজিয়া পান না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় রাখেন, কাহাকে দেন, মনে থাকে না। খরচ নাই, অথচ অর্থে কুলায় না। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে।·· অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন।'

বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু মৌলিক চিন্তা ছিল। তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই।··যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।' তাই জ্ঞানানুরাগী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে বালিকা শৈবলিনীর যে বিবাহ, সেই বিবাহকে বঙ্কিম সমর্থন করতে পারেন নি। কেবল জ্ঞানানুশীলনের সুবিধার্থে চন্দ্রশেখর এই বিবাহে উদ্যোগী হয়েছে। এই বিবাহে পারিবারিক স্নেহের গুণে চন্দ্রশেখরের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত হয় নি, প্রীতি শিক্ষা হয় নি। বঙ্কিমের মতে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য বিবাহ নয়। চন্দ্রশেখর তার জ্ঞানেন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্যই এই বিবাহ করেছে। তাই এই বিবাহ মঙ্গলজনক হয় নি।

চন্দ্রশেখর বিশেষ পণ্ডিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। আত্মচরিত্র পর্যালোচনা করবার মত শক্তি তার ছিল। কমলকান্তে বঙ্কিম বলেছিলেন, 'এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া, স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এজন্য তাহারা

সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।' চন্দ্রশেখরও অনুভব করেছে, সে চিরকাল নিজেরই রয়েছে, পরের সুখের জন্য সে কখনো আপনাকে সমর্পণ করে নি।

বিংশতিবর্ষীয়া শৈবলিনীর সুষুপ্তিসুন্দর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ক প্রৌঢ় বিজ্ঞ চন্দ্রশেখরের আত্মসমীক্ষা : 'হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে?' —এরকম নানা জিজ্ঞাসায় চন্দ্রশেখরের মন আচ্ছন্ন হ'য়ে এল।

চন্দ্রশেখরের 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' একা শৈবলিনীই করেছে? চন্দ্রশেখর কি নয়?

চন্দ্রশেখর গৃহে প্রত্যাগমন করে দেখল ঘরে শৈবলিনী নেই।

এর পর থেকেই চন্দ্রশেখরের প্রায়শ্চিত্তের সূত্রপাত। শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের বিবাহিত জীবন দীর্ঘ আট বৎসর কাল অতিবাহিত হয়েছে। এত কাল পর চন্দ্রশেখর এই প্রথম তার দুর্নিবার জ্ঞানেন্দ্রিয়বহ্নি প্রশমিত করতে অগ্রসর হল।

'চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম-শিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগের ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকাল পর্যন্ত এই সকল কার্য করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সকল একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া, তাহাতে

অগ্নিপ্রদান করিলেন। অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ্, একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহুযত্নসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া, চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।'

উপন্যাসের প্রথম খণ্ড এইখানেই সমাপ্ত। এর পর চন্দ্রশেখরকে আবার যখন উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই তখন সে রমানন্দস্বামীর পার্শ্বে উপবিষ্ট। সেটা উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড, নাম পুণ্যের স্পর্শ; উক্ত খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ, নাম রমানন্দ-স্বামী। চন্দ্রশেখর রমানন্দস্বামীকে গুরুদেব এবং রমানন্দস্বামী চন্দ্রশেখরকে বৎস বলে সম্বোধন করেন। 'দুঃখ বলিয়া কিছুই নাই'—শিষ্যের নিকট স্বামী এ-কথাটাই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। রমানন্দ বললেন, আর যদি দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয় তবে সেই সর্বব্যাপী দুঃখের হাত থেকে মুক্তির উপায় কি? রমানন্দের নিকট থেকে বেদনাহত চন্দ্রশেখর জানল—'যেই পরোপকারী, সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে।' রমানন্দস্বামী ধর্মশাস্ত্র বেদ পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতি মন্থন করে অনর্গল অজস্র প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা শতমুখে পরোপকার ধর্মের গুণকীর্তন করেন। চন্দ্রশেখর রমানন্দের মুখনিঃসৃত বাণী শুনতে শুনতে বিস্মিত ও মোহিত হয়, তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। চন্দ্রশেখর রমানন্দস্বামীকে প্রণাম করে বলে, 'গুরুদেব! আজি হইতে আমি আপনার নিকট এ মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।' রমানন্দ চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করলেন। উপন্যাসের প্রথম পর্বে যে-চন্দ্রশেখরকে আমরা পেয়েছিলাম সে ছিল পরম জ্ঞানানুরাগী, বিদ্বান, শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত আত্মধ্যানমগ্ন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; পরে যে-চন্দ্রশেখরকে পাই সে গুরু রমানন্দস্বামীর একান্ত অনুগত শিষ্য পরহিতব্রত-ধারী ব্রহ্মচারী। চন্দ্রশেখর এখন স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছে ধন যশ ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ স্থায়ী নয়—পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোনো মূল নেই।

ছয়

কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করে রোহিণীকে পেতে চেয়েছিল। এর ফলস্বরূপ সে না পেয়েছে ভ্রমরকে, না পেয়েছে রোহিণীকে। ভ্রমর

এই উপন্যাসে আত্মবিসর্জন, ভালবাসা ও প্রণয়ের প্রতীক; অপরদিকে রোহিণী হল গোবিন্দলালের রূপবহ্নি। গোবিন্দলাল ঘটনাচক্রে ভ্রমরের প্রণয় বিস্মৃত হয়ে রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হয়েছিল। সেই মোহই গোবিন্দলালের জীবন-ট্র্যাজেডির মূল কারণ। একটি সৎ চরিত্রবান আদর্শ পুরুষ রূপজ মোহে নিজেকে সমর্পণ করলে তার জীবনে পতন ও শূন্যতা যে কত দ্রুত এবং কী নিদারুণভাবে নেমে আসতে পারে সেই চিত্রই অতি নিপুণ হাতে অঙ্কিত করেছেন বঙ্কিম এই উপন্যাসে।

ভ্রমরকে গোবিন্দলাল সত্য কথাই বলেছিল। 'আমি রোহিণীকে ভালবাসি না, রোহিণী আমায় ভালবাসে।' এতদ্‌সত্ত্বেও গোবিন্দলাল একদিন ভ্রমরকে পরিত্যাগ করে এবং পরে রোহিণীর সঙ্গে ভিন্ন দেশে কালাতিপাত করে। শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের যে গোপন ভালবাসা তার অপর নাম আত্মোৎসর্গ বা আত্মবিসর্জন; রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের কখনও কোনো ভালবাসা বা প্রণয় জন্মায় নি, ঘটনাচক্রে ক্রমে রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা কখন্ রূপজ মোহে পরিণত হয়।

যেদিন সন্ধ্যায় গোবিন্দলাল বারুণীর জল থেকে তুলে এনে রোহিণীকে বাঁচাল সেদিন রোহিণী বাক্‌শক্তি লাভ করেই চোখের সামনে গোবিন্দলালকে দেখে বলেছিল, 'আমাকে কেন বাঁচাইলেন? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে, মরণেও আপনি প্রতিবাদী?' সেদিন রোহিণীর আরও কয়েকটি কথা থেকে গোবিন্দলাল পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল রোহিণীর মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষার মূল কারণটি কি?

পুষ্পোদ্যান থেকে রোহিণী সেদিন একা গৃহে ফিরে গেলে, 'গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধুল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, হে নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর। তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব?—আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।'

গোবিন্দলাল যে পথে চিত্তদমন করতে চেয়েছিল সেটা ছিল নিতান্তই বাইরের পথ। রোহিণীর প্রতি তার চিত্ত সত্যই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। 'তাঁহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল।' গোবিন্দলাল মনে

করেছিল রোহিণীর কাছ থেকে দূরে চলে গেলেই চিত্তদমনে সে সক্ষম হবে। তাই সে সকলকে ছেড়ে জমিদারীর কর্মভার নিয়ে বন্দরখালি চলে গেল একাকী। ভ্রমর সঙ্গে যাবার সুযোগ পেল না, কিন্তু গোবিন্দলাল সঙ্গে নিয়ে গেল রোহিণীর অতুল্য রূপরাশি।

বঙ্কিম বলেছেন, 'রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই। যেমন জলতলে চন্দ্রসূর্যের ছায়া আছে, চন্দ্র সূর্য নাই, তেমনি গোবিন্দলালের হৃদয়ে অহরহঃ রোহিণীর ছায়া আছে, রোহিণী নাই।'

বন্দরখালি থেকে গোবিন্দলাল ফিরে আসছে খবর পেয়ে ভ্রমর পিত্রালয়ে চলে যায়। গোবিন্দলাল বুঝতে পারে ভ্রমরের চলে যাওয়ার কারণ। মনে মনে ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের রাগ হয়। শেষে ভ্রমরকে ভুলে থাকার উপায় স্বরূপ রোহিণীর চিন্তায় মগ্ন হয়। এই চিন্তা দ্রুত বাসনায় পরিণতি লাভ করে। বারুণীর তটে ঘন বর্ষায় সন্ধ্যার অন্ধকারে গোবিন্দলালের সঙ্গে আবার রোহিণীর দেখা হয়। রোহিণী এবার বাগান থেকে ঘরে ফেরার সময় জেনে যায় গোবিন্দলাল তার রূপে মুগ্ধ।

বঙ্কিমের মন্তব্য, 'রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বাহ্য জগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্ধিত হয়। গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল। কেন না, রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে।'

এই উপন্যাসে একদিকে অকৃত্রিম আন্তরিক প্রণয় অপর দিকে দুরন্ত রূপবহ্নি প্রজ্বলিত করে বঙ্কিম দেখাতে চেয়েছেন শেষ পর্যন্ত কে কার কাছে কিভাবে পরাজিত হয়, অথবা কিভাবে জয়লাভ করে।

গোবিন্দলাল তার মাকে নিয়ে কাশী যাত্রার উদ্যোগ করলে ভ্রমর কত কান্না-কাটিই না করে। শেষে যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট বিদায় নিতে এলে ভ্রমর জিজ্ঞাসা করে কবে ফিরবে। উত্তরে গোবিন্দলাল সংক্ষেপে বলে 'ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।' শেষে ভ্রমর বলে, 'এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়,

তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী ! তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই ! তুমি আমারই—রোহিণীর নও।' অর্থাৎ আন্তরিক স্নেহ প্রীতি ভালবাসা ও প্রণয়ের বিরুদ্ধে রূপজ মোহ কখন জয়লাভ করতে পারে না। পারে না বলেই কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর মৃত্যু ঘটেছে, আর গোবিন্দলালকে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হয়েছে তার সেই পুরাতন ও চিরন্তন ভ্রমরের নিকট। গোবিন্দলালের এই প্রত্যাবর্তনে ভ্রমর জয়ী হয়েছে, কিন্তু এই কয়টি বছরের শূন্যতায় ভ্রমরের পরমায়ু নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল—সে অবসন্ন কাতর এবং দীর্ঘ রোগভোগে শীর্ণ ও দুর্বল—তার পক্ষে বেশি দিন বেঁচে থাকা আর সম্ভব ছিল না।

রোহিণীর মৃত্যুর ব্যাখ্যা কি ? বঙ্কিম অন্যত্র যা বলেছেন, রোহিণীর মৃত্যুর মধ্য দিয়েও তিনি সে-কথাই বলতে চেয়েছেন। ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ যে সুখ তা স্বল্পকালীন মাত্র। প্রথমবারে যে পরিমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয় বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয় বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাতে আর কিছুই সুখ থাকে না। গোবিন্দলালের ঠিক এই দশা। রোহিণীর কাছ থেকে তার আর কোনো সুখের প্রত্যাশা ছিল না, অভ্যাসে সকল সুখ নিঃশেষিত হয়েছিল। গোবিন্দলালের হাতে রোহিণীর তাই অত সহজে মৃত্যু ঘটল। এ তো শুধু রোহিণীর মৃত্যু নয়, আসলে এখানে মৃত্যু হল রূপজ মোহের, ইন্দ্রিয়লব্ধ বাহ্য সুখানুভূতির।

গোবিন্দলাল যেদিন ভ্রমরকে পরিত্যাগ করে চলে আসে সেদিন মনে মনে একবার ভ্রমর ও রোহিণীর তুলনা করেছিল। গোবিন্দলাল এইরকম ভেবেছিল—'এ কালো ! রোহিণী কত সুন্দরী ! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব।'

বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রকে বন্ধু হরদেব ঘোষাল পত্রে লিখেছিল, 'প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গ-লিপ্সা, এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল, সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জন। এই যথার্থ প্রণয় ; সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গ-লিপ্সা ; আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি।...রূপজ মোহ তাহা নহে। রূপদর্শনজনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না, রূপ এক—প্রত্যহই

তাহার এক প্রকারই বিকাশ, গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন নূতন হইয়া প্রকাশ পায়।'

এই কারণেই রূপসী রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের মোহ অল্প কালের মধ্যেই অপসৃত হয়; অপরদিকে কালো ভ্রমর সদাই তার অন্তরে ঘুরে বেড়ায় গুনগুনিয়ে।

'গোবিন্দলাল দুই জন স্ত্রীলোককে ভাল বাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল—ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দার-ঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিঃশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর, মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত, সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়সুধা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্বরোগের ঔষধস্বরূপ, দিবারাত্র স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।'

শুধু রোহিণী বা ভ্রমর নয়, গোবিন্দলাল দেবেন্দ্র নগেন্দ্র প্রতাপ অমরনাথ সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনী হীরা শৈবলিনী লবঙ্গলতা মতিবিবি প্রভৃতি নানান চরিত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের সামাজিক আখ্যায়িকার তত্ত্বগুলি নতুন করে বুঝবার চেষ্টা করেছি; তাঁর মঙ্গলচিন্তা পাপপুণ্যবোধ অনুধাবন করতে প্রয়াসী হয়েছি। বঙ্কিমকে আজ যেভাবে বুঝেছি, ভবিষ্যতে তিনি যে অধিকতর সত্য কোনো নূতন ভাষ্যে আমারই নিকট উদ্ভাসিত হবেন না তা তো বলতে পারি না। বঙ্কিম নিজেই বিশ্বাস করতেন—'মত পরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল।' চিরায়ত বঙ্কিম সর্বকালেই নূতন ভাবনায় নূতনতর ব্যাখ্যায় আবিষ্কৃত হবেন। ক্লাসিক সাহিত্যের ধর্মই তো এই।

৫

উপন্যাসে দাম্পত্যজীবন : একটি সমস্যা

রামধনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা হচ্ছিল। চারপুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক রামধন পোদ। দুটি মেয়ের বিবাহ হয়েছে, এখনো তিনটি কন্যার বিবাহ বাকি।

বঙ্কিম রামধনকে বললেন, 'চারটি ছেলে—তিনটি মেয়ে! আবার তার উপর দুটি পুত্রবধূ বেড়েছে?'

রামধন হাত যোড় করে বললে, 'আজ্ঞা হাঁ, আপনার আশীর্বাদে দুটি পুত্রবধূ হয়েছে।'

বঙ্কিম বললেন, 'তাদের সন্তান সন্ততিও হয়েছে?'

রামধন বললে, 'আজ্ঞা, একটির দুটি মেয়ে, একটির একটি ছেলে।'

বঙ্কিম বললেন, 'রামধন! শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে অনেকগুলি পরিবার বেড়েছে। বহু পরিবার বলে তোমার আগেই খাবার কষ্ট ছিল, এখন আরও কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়।'

রামধন বললে, 'এখন বড় কষ্ট হচ্ছে।'

বঙ্কিম রামধনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রামধন, কেন এত পরিবার বাড়ালে?'

রামধন কিছু বিস্মিত হল। বললে, 'সে কি মহাশয়! আমি কি পরিবার বাড়ালাম? বিধাতা বাড়িয়েছেন।'

রামধন পোদের কথা পড়তে পড়তে অনেক সময়ই মনে হয়েছে বঙ্কিমসাহিত্যে নরনারীর সংসারজীবনে বিধাতার এ-বিষয়ে এত কার্পণ্য কেন? বঙ্কিমের প্রায় সকল উপন্যাসেই দেখি নায়ক-নায়িকা দাম্পত্যজীবনে সন্তানহীন। এটি তাঁর উপন্যাসগুলির কৌতূহলোদ্দীপক একটি সাধারণ লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বিষয়টি বিচার্য।

কপালকুণ্ডলা সন্তানহীন, বিষবৃক্ষ উপন্যাসে সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীও তাই, চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী নিঃসন্তান, কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী বালবিধবা—পুত্রকন্যা

নেই, আর ভ্রমর—'এই আখ্যায়িকা আরম্ভের কিছু পূর্বে ভ্রমরের একটি পুত্র হইয়া সূতিকাগারেই নষ্ট হয়।' ভ্রমরের আর দ্বিতীয় সন্তান নেই, আর দেবীচৌধুরাণীতে স্বয়ং দেবী প্রফুল্লও এই তালিকার অন্তর্গত।

কপালকুণ্ডলা রচনার কিছুকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র একবার দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন। বলেছিলেন, যদি শিশুকাল থেকে কোনো স্ত্রীলোক ষোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত সমাজের বাইরে সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কোনো কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয় ও পরে বিবাহ হলে সমাজ-সংসর্গে আসে, তাহলে তার বন্যপ্রকৃতির পরিবর্তন সম্ভব কি না এবং পরবর্তী কালেও কাপালিকের প্রভাব তার উপর থাকবে কি না। এই প্রশ্নে দীনবন্ধু কোনো মতামত প্রকাশ করেন নি। সঞ্জীবচন্দ্র ব্যঙ্গপ্রিয় মানুষ। তিনি রসিকতা করে বললেন, যদি দরিদ্র-ঘরে বিবাহ হয় মেয়েটা চোর হবে। পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করে বললেন, কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকবে, তারপর সন্তানাদি হলে স্বামী পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মালে সমাজের লোক হয়ে পড়বে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তার মন থেকে একেবারে তিরোহিত হবে।

অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সেদিন অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি। যাই হোক, এই ঘটনার কিছুকাল পরেই কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচিত ও প্রকাশিত হয়।

সঞ্জীবচন্দ্রের কথা বঙ্কিমের মনোমত না হলেও মনে হয় অগ্রজের ধারণাটি উপন্যাসের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর কয়েকটি উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্যামাসুন্দরী মৃণ্ময়ী বা কপালকুণ্ডলাকে বলছে, 'ভাল, আমার সাধটি পুরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে?'

মৃণ্ময়ী। যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন থাকিব না?

শ্যা। কেন? দেখিবি? যোগ ভাঙ্গিব? পরশপাতর কাহাকে বলে জান?

মৃণ্ময়ী কহিলেন, 'না।'

শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোনা হয়।

মৃ। তাতে কি?

শ্যা। মেয়েমানুষেরও পরশপাতর আছে।

মৃ। সে কি?

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস। দেখিবি,

বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সীঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কানে তোর দিব যোড়া দুল॥
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া,
রাঙ্গামুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোনার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কিনা লাগে॥

মৃণ্ময়ী কহিলেন, 'ভাল বুঝিলাম। পরশপাতর যেন ছুঁয়েছি, সোনা হলেম। চুল বাঁধিলাম; ভাল কাপড় পরিলাম; খোঁপায় ফুল দিলাম, কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম; কানে দুল দুলিল; চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোনার পুত্তলি পর্যন্ত হইল। মনে কর সকলই। তাহা হইলেই বা কি সুখ?'

পাঠকের কাছে উপন্যাসের আগ্রহও এইখানে। বনলালিত কপালকুণ্ডলা সমাজ বা সংসারের মধ্যে এসে কতখানি রূপান্তরিত হল? 'সোনার পুত্তলি'র আবির্ভাব তার জীবনধারাকে কি পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ হয়?

যে-কথা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সঞ্জীবচন্দ্র ব্যক্ত করেছিলেন, উপন্যাসের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর উক্তিতে যে-মনোভাব প্রকাশিত, পাঠকচিত্তেও সেই সম্ভাবনার কথা স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হয়।

বিবাহিত জীবনে সন্তানের আবির্ভাব স্বাভাবিক। পত্নী ও জননী মৃণ্ময়ীর জীবনে কাপালিকের প্রভাব কতখানি সে বিষয়ে আমরা কৌতূহলী হই। উপন্যাসের শেষ খণ্ডে একথা বঙ্কিম জানিয়েছেন যে 'কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিণী।' কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা নিঃসন্তান, কিংবা তার সন্তান সম্ভাবনার কথাও লেখক ইঙ্গিত করেন নি। মনে হয় এক্ষেত্রে বঙ্কিম কাহিনী-নির্মাণে কিছু পরিমাণে সুযোগ গ্রহণ করেছেন। যথার্থ সংসারজীবনের পটভূমিতেই বঙ্কিম কপালকুণ্ডলাকে স্থাপন করতে পারেন নি, কিংবা বলা যায় কাপালিকের প্রভাবকে প্রবলতর করে দেখানোর জন্যই লেখক সংসারজীবনের প্রত্যাশিত ঘটনা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। এই উপন্যাস যদি একালে রচিত হত তাহলে

বিবাহের পরেও কপালকুণ্ডলা কেন সন্তানহীন তার অন্য যুক্তি থাকতে পারত। কিন্তু কপালকুণ্ডলা রচিত হয়েছে আজ থেকে শতবৎসর অধিককাল পূর্বে, এবং উপন্যাসের মূল ঘটনা তারও 'প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে'র।

তারাচরণের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিবাহিত জীবন তিন বৎসর কাল। উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে আমাদের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তার বয়স তের বৎসর। কলকাতায় কমলমণির কাছ থেকে গোবিন্দপুরে এলে সূর্যমুখী তারাচরণের সঙ্গে কুন্দর বিবাহ দেয়। উপন্যাসের যে পরিচ্ছেদে তারাচরণের বিবাহ সেই পরিচ্ছেদেই তার মৃত্যু। বিবাহ ও মৃত্যুর মধ্যে তিন বৎসর কাল অতিবাহিত হয়েছে। কপালকুণ্ডলার বিবাহিত জীবন এক বৎসরের অধিক কাল, কুন্দর বিবাহিত জীবন তিন বৎসর। কিন্তু এখানেও দেখি কুন্দনন্দিনী নিঃসন্তান। অপরদিকে তারাচরণের মৃত্যু অত্যন্ত দ্রুত এবং আকস্মিক। 'কুন্দনন্দিনী বিধবা হইলেন। জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল।'

কাহিনীর স্বার্থে বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি বস্তুর প্রয়োজন ছিল। কুন্দনন্দিনীকে বিধবা করা ও তাকে নিঃসন্তান রাখা। বঙ্কিম তা-ই করলেন। যেখানে স্বয়ং স্রষ্টাই বিমুখ, সেখানে কুন্দ ও তারার জীবনে সন্তান সম্ভাবনার পথ কোথায়?

পূর্বেই বলেছি, বিষবৃক্ষ উপন্যাসে সূর্যমুখীও নিঃসন্তান। কুন্দনন্দিনী যখন দত্তবাড়িতে প্রবেশ করে তখন সূর্যমুখীর বয়স প্রায় ছাব্বিশ বৎসর। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর বিবাহিত জীবনও কম দিনের নয়। উপন্যাসের সূচনায় কুন্দর বয়স ছিল তের, সূর্যমুখীর ছাব্বিশ। তারপর কাহিনীর মধ্যে আরও পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত হয়েছে—এরই মধ্যে কুন্দর বিবাহ ও বৈধব্য ঘটেছে এবং পরে নগেন্দ্রর সঙ্গে তার সম্পর্ক গভীরতর হয়েছে। সূর্যমুখী যে পত্রে কমলমণিকে লিখেছে তার স্বামী কুন্দনন্দিনীতে আকৃষ্ট—সেই পত্রেই আছে—'তুমি সে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইয়াছে।' অর্থাৎ হিসাব অনুসারে সূর্যমুখীর বয়স এখন তিরিশ-একত্রিশ বৎসর। এই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে সূর্যমুখী নিঃসন্তান। এই সন্তানহীনতা উপন্যাসের মূল কাহিনী পরিকল্পনায় বহুল পরিমাণে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু এখানে আকস্মিকতার প্রশ্নও উত্থাপিত হতে পারে। তিন বৎসর যেতে না যেতেই হঠাৎ জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু; অপরদিকে কুন্দনন্দিনীরও কোনো সন্তান নেই, নগেন্দ্রনাথও নিঃসন্তান। কাহিনী নির্মাণে বঙ্কিম সচেষ্টভাবেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই কুন্দ-নগেন্দ্রর প্রণয়বীজ বিনা বাধায় সহজেই রোপিত হয়েছে, আর নিঃসন্তান

সূর্যমুখীও এতদিনের সংসার পরিত্যাগ করে যেতে কোনো দিক থেকেই বাধাপ্রাপ্ত হয় নি।

চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর জীবনে বা প্রতাপ ও রূপসীর জীবনে সন্তানের অভাব লক্ষ্য করি। চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর যখন বিবাহ হয় তখন উভয়ের বয়স যথাক্রমে বত্রিশ ও আট। বঙ্কিম জানিয়েছেন, 'এই বিবাহের আট বৎসর পরে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ।' অর্থাৎ তখন শৈবলিনীর বয়স ষোল এবং চন্দ্রশেখরের বয়স চল্লিশ বৎসর। যদিও উপন্যাসের একস্থলে শৈবলিনীকে বিংশতিবর্ষীয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শৈবলিনী সন্তানহীন। চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর বিবাহিত জীবনের কিছু ব্যাখ্যা বঙ্কিম উপন্যাস মধ্যে ব্যক্ত করেছেন।

চন্দ্রশেখরের উক্তি, 'হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটিরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেইজন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?'

অপর প্রান্তে শৈবলিনীর উক্তি লক্ষণীয়। ফষ্টরের নৌকায় গঙ্গাবক্ষে দাঁড়িয়ে ছদ্মবেশী নাপিতানী সুন্দরীর সঙ্গে তার কথোপকথন। সুন্দরী তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু শৈবলিনীর আর প্রত্যাবর্তনে আগ্রহ নেই। 'কোন্ সুখের আশায়' সে ঘরে ফিরবে? 'ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু—'। আর যে কলঙ্ককে সে নিজে অর্জন করেছে তাকে মার্জনা করবেই বা কেমন করে?

শৈবলিনীর উক্তি, 'ইহার পর পাড়ার ছোট মেয়েগুলা আমাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিবে কি না যে, ঐ উহাকে ইংরেজ লইয়া গিয়াছিল? ঈশ্বর না করুন কিন্তু যদি কখন আমার পুত্রসন্তান হয়, তবে তাহার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে

আমার বাড়িতে খাইতে আসিবে ? যদি কখন কন্যা হয়, তবে তাহার সঙ্গে কোন্ সুব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিবে ?'

এখানে দেখি কোনো পুত্রসন্তান বা কন্যালাভে শৈবলিনীর যথেষ্টই অনাগ্রহ রয়েছে। কিংবা সন্তানহীনতার জন্যই সে আরো নিঃসঙ্গ এবং একাকী। যাই হোক, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জীবনে সন্তানহীনতার একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, যা অন্যক্ষেত্রে সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় না।

প্রতাপ বিবাহিত। প্রতাপের কি কোনো সন্তান আছে ? তেমন কোনো ইঙ্গিত উপন্যাসের মধ্যে নেই। সুন্দরীর কনিষ্ঠা ভগিনী রূপসী। তারই স্বামী প্রতাপ। সুন্দরী প্রতাপের নিকট এসে চন্দ্রশেখরের সকল বৃত্তান্ত জানায়—শৈবলিনীর পলায়নের কথা ব্যক্ত করে। পরদিনই প্রতাপ মুঙ্গেরে যাত্রা করে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর সন্ধানে। সুন্দরী রূপসীর কাছে থেকে যায় কয়েকটা দিন। এখানে রূপসীর সন্তানের কোনো চিত্র নেই, সুন্দরী-রূপসী কথোপকথনের মধ্যেও রূপসীর সন্তানের কোনো ইঙ্গিত নেই।

উপন্যাসের অন্যত্রও বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, যে পরিচ্ছেদের নাম অগাধ জলে সাঁতার, সেখানে প্রতাপ ও শৈবলিনী কথা বলছে।

শৈবলিনীর উক্তি, 'এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ ?

প্র। আমি !

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য আছে—বল আছে—কীর্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ ?'

এখানে দেখা গেল প্রতাপের সন্তানের কোনো উল্লেখ নেই। প্রতাপের সন্তান থাকলে শৈবলিনীর এই কথায় তা অনুক্ত থাকত না।

কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী বালবিধবা। তার বিবাহ কবে হয় এবং কবে তার স্বামীর মৃত্যু ঘটে উপন্যাসে সে কথার উল্লেখ নেই। কুন্দনন্দিনী সন্তানহীন ও বিধবা, রোহিণীও তাই। যে প্রয়োজনে কুন্দনন্দিনী নিঃসন্তান, সেই প্রয়োজনেই রোহিণী সন্তানহীন। কুন্দ-পরবর্তী রোহিণীর চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিম এদিক থেকে কোনো জটিলতর সমস্যার পথ গ্রহণ করেন নি। যদি রোহিণীর একটি শিশুসন্তান থাকত তবে উপন্যাসের সমস্যা অধিকতর তীব্র এবং ভিন্নতর হত।

অপরদিকে সূর্যমুখীর সঙ্গে গোবিন্দলালের পত্নী ভ্রমর তুলনীয়। সূর্যমুখীর কোনো সন্তান নেই, আর ভ্রমরের একটিমাত্র পুত্র 'সূতিকাগারেই নষ্ট হয়।' সুতরাং উভয়েই সন্তানহীন, উভয়ের সমস্যা এই দিক থেকে একই রূপ। গোবিন্দলাল

রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট, ভ্রমরকে সে পরিত্যাগ করলে নির্মমভাবে। 'ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সেই সাত দিনের ছেলের জন্য কাঁদিতে বসিল। মেঝের উপর পড়িয়া, ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল।' ভ্রমরের ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে যে কথাগুলি ব্যক্ত হয়েছে, তা বর্তমান প্রস্তাবেরও বক্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

স্বামীপরিত্যক্তা ভ্রমরের আকুল উক্তি, 'আমার ননীর পুত্তলি, আমার কাঙ্গালের সোনা, আজ তুমি কোথায়? আজ তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত?'

ঠিক তাই, সন্তানের বন্ধন যদি থাকত তবে গোবিন্দলালের পক্ষে ভ্রমরকে এভাবে পরিত্যাগ করা কঠিন হত এবং সেদিক থেকে গোবিন্দলালের সঙ্গে বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথ তুলনীয়। যে উক্তি ভ্রমরের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে, সে কথা সূর্যমুখীর কণ্ঠেও ধ্বনিত হতে পারত। বঙ্কিম সম্ভবতঃ নিজেও অনুভব করেছিলেন যে তাঁর উপন্যাসের অধিকাংশ প্রধান চরিত্রই সন্তানহীন। সকল চরিত্রই নিঃসন্তান, এটি অবশ্যই জীবনের সাধারণ লক্ষণ নয়। অথচ কাহিনী নির্মাণের প্রয়োজনে একে অতিক্রম করাও বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি সচেতন শিল্পী। কৌশলে আমাদের চক্ষু ধৌত করেছেন। তাই ভ্রমর নিঃসন্তান নয়, সন্তানহারা জননী।

৬

উপন্যাসে পত্রব্যবহার ঃ প্রকরণ ও প্রবণতা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে চিঠিপত্রাদি ব্যবহারের বাহুল্য বঙ্কিমসাহিত্যের কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রজনী, আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী ব্যতীত প্রত্যেক উপন্যাসেই চিঠিপত্রের ব্যবহার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের form বা আঙ্গিকের প্রতি সর্বদাই বিশেষ সচেতন ছিলেন। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আঙ্গিকগত নূতনত্ব সৃষ্টিতে তাঁর প্রয়াস লক্ষণীয়। কখনও কখনও পাশ্চাত্য উপন্যাসের আঙ্গিক বা রচনাপ্রণালীর অনুসরণও তিনি করেছেন। থ্যাকারের 'হেনরি এসমণ্ড', ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড' কিংবা উইলকি কলিন্সের 'ওম্যান ইন হোয়াইট'-এর রচনাপ্রণালীর সঙ্গে রজনী উপন্যাসের আঙ্গিকগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। রজনীর ভূমিকায় বঙ্কিম নিজেই কলিন্সের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

পত্র পত্রলেখকের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। চিঠির মধ্যে একটা মানুষের অনেকখানি পরিচয় নিহিত থাকে। ডায়রিও মানুষকে গভীরভাবে জানবার একটি বড় মাধ্যম। তবে আত্মজীবনী ও ডায়রি এক বস্তু নয়। জীবনী লিখিত হয় পাঠকসমাজের জন্য, আর ডায়রি হল নিতান্তই ব্যক্তিগত। ইংরেজি বহু গল্প উপন্যাসে ডায়রির ব্যবহার আছে। চিঠিপত্রের ব্যবহার ইংরেজি উপন্যাসে আছে, সংস্কৃত নাটকাদিতেও আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে প্রাচ্য পাশ্চাত্য এই উভয় সাহিত্যের সামগ্রী কম ছিল না।

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম বিমলার পত্র, সপ্তম পরিচ্ছেদে বিমলার পত্র সমাপ্ত, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের নাম আয়েষার পত্র। এ ছাড়াও প্রথম খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে মানসিংহ ও জগৎসিংহের মধ্যে একবার পত্র ব্যবহার হয়েছে। আর দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বীরেন্দ্রসিংহ কর্তৃক বিমলার পত্রমর্দনের ঘটনা বিবৃত হয়েছে॥

এই উপন্যাসে জগৎসিংহকে লিখিত বিমলার পত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি, যা পাঠকের জানা আবশ্যক সেগুলি সংহত আকারে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। পূর্বকাহিনী কথনে পত্রব্যবহার বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক কুশলতারই পরিচয় বহন করে। বিমলার সঙ্গে তিলোত্তমার সম্বন্ধ কি, বিমলার পরিচয় কি—এসব জানবার কৌতূহল শুধু যুবরাজ জগৎসিংহের নয়, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনেও সমপরিমাণেই জেগেছিল। পত্রের মধ্য দিয়ে অভিরাম স্বামীর কথা, বীরেন্দ্রের কথা, তিলোত্তমার কথা, বিমলার নিজের কথা, বীরেন্দ্র ও বিমলার সম্পর্কের কথা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে জানতে পাই।

দ্বিতীয় খণ্ডের উনবিংশ পরিচ্ছেদের প্রথমেই দেখি, আয়েষা লেখনী হাতে পত্র লিখতে বসেছে। পত্রের প্রথমে জগৎসিংহকে কি পাঠ লিখবে তাই সে চিন্তা করছে। প্রথমে 'প্রাণাধিক' লিখেছিল কিন্তু তা মনঃপূত হল না। 'রাজকুমার' বলেই জগৎসিংহকে সে সম্বোধন করল। একটি পত্র লিখতে তাকে অনেকগুলি পত্র নষ্ট করতে হল। উপায় কি? সকল পত্রই যে অশ্রুকলঙ্কিত হয়। বিষবৃক্ষে সূর্যমুখীরও গৃহত্যাগের পূর্বে পত্র লেখবার সময় এই অবস্থাই হয়েছিল। চোখের জলে যদি সব পত্র না ভিজত, কালি যদি ধুয়ে মুছে না যেত, লিপি যদি অবিকৃত থাকত তাহলে সূর্যমুখী কমলমণিকে না লিখে নগেন্দ্রনাথকে পত্র লিখে যেতে পারত।

কপালকুণ্ডলার তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখি খাঁ আজিমের এক আশ্রিত ব্যক্তি লুৎফউন্নিসাকে একখানি জরুরি পত্র দান করল। বঙ্কিম পত্রটি উদ্ধৃত করেছেন। এই শ্রেণীর পত্র উপন্যাসের কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, ঘটনার গতিপরিবর্তনে সহায়তা করেছে, আখ্যানের খাদ বদলেও সহায়ক হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে, কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন থেকে যখন উত্থিত হয়েছে তখন প্রভাত হয়েছে। জানালায় কতকগুলি সজ্জিত বন্যলতার মধ্যে কপালকুণ্ডলা একখানি লিপি পেল, পত্রটি সংক্ষিপ্ত। তাতে আছে, 'অদ্য সন্ধ্যার পর কল্য রাত্রের ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবা। তোমার নিজ সম্পর্কীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে তাহা শুনিবে। অহং ব্রাহ্মণ-বেশী।' লিপি সংক্ষিপ্ত হলেও সেটি উপন্যাসের রহস্য ও আকর্ষণকে একই সঙ্গে বর্ধিত করেছে। এবং এই চিঠিই কপালকুণ্ডলা উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। চিঠির শেষে যদি থাকত 'ইতি ব্রাহ্মণবেশী সেই নারী' তাহলে উপন্যাস যে কোনদিকে অগ্রসর হত তা বলা যায় না। কারণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মণবেশী নিজেই কপালকুণ্ডলাকে

বলেছে, 'আমি পুরুষ নহি।' এ কথায় কপালকুণ্ডলার যে কতকটা বিশ্বাস জন্মেছিল তাও বিবৃত হয়েছে। এ চিঠি কাপালিক ও পদ্মাবতীর যুগ্ম অভিসন্ধির ফল। তারা একথা নিশ্চয় পূর্ব থেকে ভেবে রাখে নি এ লিপি কপালকুণ্ডলার কবরীবন্ধনচ্যুত হয়ে ঠিক নবকুমারের হাতে পড়বে। যাই হোক নবকুমার লিপি পাঠ করল। উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে আছে, 'যে কথা কাল শুনিতে চাহিয়াছিলে, সে কথা শুনিবে।' মূল চিঠিতে 'কাল' শব্দটি নেই এবং 'সে কথা'র স্থানে ছিল 'তাহা শুনিবে'। উদ্ধৃতি চিহ্ন আছে বলেই এটি লক্ষ্য করলাম। এই পত্রলিপিই কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারকে সর্বাধিক সংশয়াকুল করে তুলেছে। এবং এই পত্রজাত সংশয়ই অবশেষে কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের হস্তে তুলে দিতে সাহায্য করেছে।

মৃণালিনী উপন্যাসে একটি হেমচন্দ্রের ও একটি মৃণালিনীর পত্র উদ্ধৃত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে লেখক হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী মথুরায় বাসকালীন পরস্পরে কিভাবে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করত তার একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন। লিপি আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াটি অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের পূর্বপ্রণয়ের গভীরতাকেই ফুটিয়ে তুললেন।

মাধবাচার্যের আদেশে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর মধ্যে দেখা সাক্ষাতের পথ বন্ধ। কিন্তু পত্র ব্যবহারে সম্ভবতঃ বাধা ছিল না। হেমচন্দ্র গিরিজায়ার হাত দিয়ে মৃণালিনীকে পত্র পাঠাল। গ্রন্থের প্রথম-খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে সে পত্র উদ্ধৃত হয়েছে। দেখা সাক্ষাৎ না হলেও উভয়ের প্রণয়ের মধ্যে যে কোনো খাদ নেই এ পত্র তাই পরস্পরের নিকট পুনর্বার প্রমাণ করেছে।

তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের নাম মৃণালিনীর লিপি। নবদ্বীপে গিরিজায়ার হাতে হেমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে মৃণালিনী যে পত্র প্রেরণ করে তা সংহত এবং চরিত্রানুগ। চিঠিটি উপন্যাসে উদ্ধৃত হয়েছে কিন্তু হেমচন্দ্র এই চিঠি না পড়ে তা খণ্ড খণ্ড করে ছিন্ন করেছিল। এই চিঠি পড়লে উপন্যাসের মোড় নিশ্চয় কিছুটা ঘুরে যেত। যে সমাধান পরে হয়েছে তা এই চিঠির মধ্য দিয়েই সম্ভব হতে পারত। কিন্তু বঙ্কিম এই পত্রটি ছিন্ন করে তাঁর ঔপন্যাসিক বিশিষ্টতারই পরিচয় দিয়েছেন।

নবম পরিচ্ছেদে লিপিখণ্ডন হেতু অনুশোচনার চিত্র আছে—'হেমচন্দ্র শতবার ভাবিতেছিলেন, কেন আমি মৃণালিনীর পত্র পড়িলাম না? নবদ্বীপে কেন আসিয়াছে, তাহাই বা কেন জানিলাম না? পত্রখণ্ডগুলি যে বনে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা যদি সেখানে পাওয়া যায়, তবে তাহা যুক্ত করিয়া যতদূর পারেন,

ততদূর মর্মাবগত হইবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করিয়া একবার সেই বন পর্যন্ত গিয়াছিলেন ; কিন্তু সেখানে বনতলস্থ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পারেন নাই। বায়ু লিপিখণ্ড সকল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। যদি তখন আপন দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া দিলে হেমচন্দ্র সেই লিপিখণ্ডগুলি পাইতেন, তবে হেমচন্দ্র তাহাও দিতেন।' এই পত্র হেমচন্দ্রের মনে দোলাচলতার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু অপর দিকে মৃণালিনীর চরিত্রে কোনো দোলাচলতা নেই। এই পত্রখণ্ডন ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়ের মানসিকতার দুই বিপরীতধর্মী ছবি চমৎকার চিত্রিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসখানিকে এক হিসেবে পত্রোপন্যাস বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্কিমের আর কোনো উপন্যাসে এত বেশি সংখ্যক পত্রাদি ব্যবহৃত হয় নি। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মুখে সংলাপের পরিবর্তে তাদের পরস্পরকে লিখিত চিঠিপত্রগুলি অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই উপন্যাসটিকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই বৃহৎ উপন্যাসটিতে প্রধান চরিত্র তিনটির মুখ দিয়ে কথা খুব সামান্য বলানো হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসে নগেন্দ্রের সঙ্গে সূর্যমুখীর কটি কথা হয়েছে? নগেন্দ্র কুন্দকে ভালবাসল, তাকে বিবাহ করল এবং পরিশেষে তাকে ত্যাগ করল ; কিন্তু উপন্যাসখানিতে নগেন্দ্রর সঙ্গে কুন্দর কথোপকথন নেই বললেই চলে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মনের ছবি এঁকেছেন এবং তাদের লিখিত চিঠিপত্রগুলির মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলিকে আরো স্পষ্ট করে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে পত্রাদির ব্যবহার ঘটেছে বহুবার। পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছে, 'নগেন্দ্রনাথ, কুন্দর সকল কথা সূর্যমুখীকে লিখিলেন।' পত্র প্রেরণের উল্লেখটুকু রয়েছে মাত্র, বিস্তৃত আর কিছু নেই। বর্তমান উপন্যাসে অনেক স্থানে কেবলমাত্র পত্রব্যবহারের উল্লেখ আছে, কোথাও পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে, আবার কোথাও বা সমগ্র পত্রটিই তুলে দেওয়া হয়েছে। যে স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র পত্রের উল্লেখ-মাত্র করে ছেড়ে দিয়েছেন, বিস্তৃত বিবরণ দেন নি—সেই সব ক্ষেত্রে বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক সংযম ও কৃতিত্বের পরিচয় আমরা লক্ষ্য করব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে কুন্দকে পত্র দিয়ে নগেন্দ্র হরদেব ঘোষালকেও একখানি পত্র লিখেছে। পত্র লেখার সময় নগেন্দ্র তাকেও কুন্দনন্দিনীর কথা বলেছে। উপন্যাসের মধ্যে চিঠিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তবে কুন্দনন্দিনীর প্রসঙ্গ যতটুকু রয়েছে ততটুকুমাত্র। এই পত্রটির মধ্য দিয়েই কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রের রূপজমোহের প্রথম সন্ধান পাই। কুন্দর স্বল্প বয়সের সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছে। নগেন্দ্র লিখছে, 'কুন্দ নামে যে কন্যার

পরিচয় দিলাম—তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্বেই যেরূপ মাধুর্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না।' চিঠিটি পড়তে পড়তে সূর্যমুখীর রূপের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করে। কুন্দর সঙ্গে তুলনায় দেখব সূর্যমুখী দেখতে অসুন্দর নয়, কিন্তু কুন্দর মত আজ সে নবযৌবনা নয়। নগেন্দ্রের মতে সৌন্দর্যের যে বয়স বা সময়—সূর্যমুখী আজ সে বয়স অতিক্রম করে এসেছে। কুন্দর রূপে নগেন্দ্র যে মাধুর্য লক্ষ্য করল নগেন্দ্রের বিশ্বাস প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পরে আর সে মাধুর্য থাকে না। অর্থাৎ এই কথাই মনে করা যেতে পারে যে সূর্যমুখীর রূপের মধ্যে সে মাধুর্য নগেন্দ্র আজকে খুঁজে পাচ্ছে না। কুন্দকে দেখবার পূর্বে কোন্ বয়স প্রকৃত সৌন্দর্যের সময়, প্রথম যৌবনের অব্যবহিত পূর্বে যে মাধুর্য ও সরলতা থাকে পরে ততটা থাকে কিনা ইত্যাদি নিয়ে তার মনে কোনদিন প্রশ্ন জাগে নি। আজ কুন্দনন্দিনীর রূপদর্শনে অপর কারো রূপ বা সৌন্দর্য তার মনে ধরছে না। তাই সে পত্রে বন্ধুকে লিখছে, 'আমার বোধ হয় এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই।...তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না।'

নগেন্দ্র সূর্যমুখীকে কি চিঠি লিখেছিল ঔপন্যাসিক তার উল্লেখ করেন নি, তবে নগেন্দ্রের পত্র পেয়ে সূর্যমুখী কি উত্তর দিয়েছিল তা আছে। সূর্যমুখী লিখছে, 'তুমি কি মেয়েটিকে একেবারে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া বিলাইয়া দিয়াছ? নহিলে আমি সেটি তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়া লইতাম। মেয়েটিতে আমার কাজ আছে। তুমি কোন সামগ্রী পাইলে তাহাতে আমার অধিকার হওয়াই উচিত, কিন্তু আজি কালি দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই পুরা অধিকার।' সূর্যমুখীর পত্রোত্তর থেকে নগেন্দ্র কি লিখেছে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। নগেন্দ্র মনে মনে কুন্দকে স্বদেশে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু স্ত্রীকে একথা স্পষ্ট করে বলতে সে পারে নি। সে বলেছে কুন্দের দেখা শোনার ভার কমলমণি নিয়েছে এবং কমলই তার অধিকার গ্রহণ করেছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখব চিঠিতে সে সকল কথা সত্য বলে নি। নগেন্দ্র কোনো সময়েই বরাবরের জন্য কুন্দকে কমলের বাড়িতে রেখে যেতে চায় নি। নগেন্দ্রের উক্তির মধ্যেই তার প্রমাণ মেলে। নগেন্দ্র কমলকে বলছে, 'এখন তুমি ইহাকে না রাখিলে আর রাখিবার স্থান নাই। পরে আমি যখন বাড়ি যাইব—উহাকে গোবিন্দপুরে লইয়া যাইব।' অর্থাৎ কুন্দ সম্পর্কে নগেন্দ্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ তার প্রথম পত্রেই প্রকাশ পেয়েছে বলা যেতে পারে।

একাদশ পরিচ্ছেদটির নাম সূর্যমুখীর পত্র। এই পরিচ্ছেদে সূর্যমুখী কমলমণিকে

যে চিঠি দিয়েছে তা উপন্যাসে আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এ চিঠির তুলনা নেই। চিঠির মধ্য দিয়ে পত্র লেখকের মনের খবর মেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের গতিও সঞ্চারিত হতে থাকে। সূর্যমুখীর চিঠির মাধ্যমে নগেন্দ্রের চিত্তবিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারা যায়। ঘটনা বাহুল্যের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম এই উপন্যাসে নগেন্দ্রের চিত্তবিকারের চিত্র অঙ্কন করেন নি, বঙ্কিম একটি পত্রের মধ্য দিয়ে যে কাজ সেরে নিয়েছেন আধুনিক ঔপন্যাসিকের সেই স্থলে নিঃসন্দেহে একশত পৃষ্ঠার প্রয়োজন হত। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব। সংযম তাঁর শিল্পপ্রতিভার একটি বড় গুণ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় লিখেছেন, 'নগেন্দ্রনাথের পাপ-প্রলোভনের ক্রমপরিণতির চিত্রটি বঙ্কিম সুকৌশলে অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক বাস্তবতাপ্রধান ঔপন্যাসিকদের অতিরিক্ত-তথ্যভারাক্রান্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই। স্বল্প কয়েকটি রেখাপাতে, অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও আভাসের দ্বারা, আখ্যায়িকার মধ্য দিয়াই চিত্তবিক্ষোভের চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারের দীর্ঘ বিশ্লেষণের দ্বারা বর্ণনাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলেন নাই।' সূর্যমুখীর চিঠি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কমলমণির প্রতি সূর্যমুখীর পত্রে এই চিত্তবিকারের প্রথম উল্লেখ পাই ; তখনও নগেন্দ্র প্রাণপণে প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন, অন্তরের গভীর স্তরে তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছেন, বাহ্য ব্যবহারে প্রস্ফুট হইতে দেন নাই ; কেবল এক স্নেহময়ী পত্নীর অসাধারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই এই নূতন ভাব পরিবর্তনের আভাস পাইয়াছে। সূর্যমুখীর পত্রে এই বিকারের প্রথম পরিচয় দিয়া বঙ্কিম তাঁহার চিত্রকে কলাকৌশলের দিক হইতে এক অপূর্ব সঙ্গতি ও শোভনত্ব দিয়াছেন।' শ্রীকুমারবাবুর এই উক্তি যথার্থ।

এরপর কমলমণির প্রত্যুত্তর। কমল তিরস্কার করে সূর্যমুখীকে চিঠি লিখল। কমলের চিঠি পেয়ে সূর্যমুখীর মনের দ্বন্দ্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল বোঝা যায়। সূর্যমুখীর চিঠিতেই দেখি সে স্বামীর প্রতি সংশয়াচ্ছন্ন হলেও বারবার বলেছে, 'তিনি ধর্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না।' অর্থাৎ একদিকে স্বামীর চরিত্রের প্রতি বিশ্বাস অপর দিকে সংশয়—এই উভয়ের দ্বন্দ্বে তার চিত্তে ক্ষতের দাগ পড়েছে। সূর্যমুখী কোনো সময়েই স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাতে চায় নি। সে নিজেই জানে স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারান পাপ। একথা তাকে আবার শোনাল কমলমণি। সে সূর্যকে লিখল, 'তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন ? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেখি হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে পত্রে লিখেছে, 'তোমার কি

হইয়াছে ? তুমি কি করিতেছ ? আমি কিছু ভাবিয়া পাই না। তোমার পত্র তো পাইই না। যদি পাই, ত সে ছত্র দুই, তাহার মানে মাথা মুণ্ড, কিছুই নাই। তাতে কোন কথাই থাকে না।' যে হরদেব ঘোষালকে নগেন্দ্র একসময় সুদীর্ঘ পত্র লিখত, মনের সকল কথা বন্ধুর কাছে খুলে বলত (পঞ্চম পরিচ্ছেদে হরদেবকে লিখিত নগেন্দ্রর পত্র দ্রষ্টব্য) আজ সেই নগেন্দ্র দুই ছত্রে পত্র সমাপ্ত করে এবং সে যে কি লেখে তার মানে মাথা মুণ্ড কিছুই নেই। পত্র রচনার এই অস্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের চিত্তবিকারের প্রথম বাহ্য বিকাশটি অত্যন্ত নিপুণতা ও অদ্ভুত কলা সংযমের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

হরদেবের প্রশ্নের উত্তরে নগেন্দ্র লিখল, 'আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।' নগেন্দ্রের পত্রের এই একটি চরণের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম অনেক কথা বলে নিলেন। নগেন্দ্রের কথাতেই নগেন্দ্রের মনের অবস্থাটি পাঠক আরও স্পষ্ট করে বুঝে নিল। নগেন্দ্রর এই উক্তির মধ্যে তার অপরাধবোধ ও অপরাধপ্রবৃত্তি দুইই লক্ষ্য করা যায়। কুন্দর আকর্ষণ তার পক্ষে ত্যাগ করা অসম্ভব আবার একথাও নগেন্দ্র জানে যে কুন্দর প্রতি আকর্ষণ তার পক্ষে পাপ। মানুষ যখন জানে যে কোথায় তার পাপ এবং পাপকে অতিক্রম করবার শক্তি যখন তার না থাকে তখনই তার জীবনে এক কঠিন ট্র্যাজেডি নেমে আসে। হরদেব ঘোষালকে লিখিত নগেন্দ্রের পত্রের মধ্য থেকে পাঠক নগেন্দ্রের মনের গভীরতম প্রদেশের জটিল ক্রিয়াকর্মগুলি ভাল করে বুঝে নেয়। অপরদিকে সূর্যমুখীর মনের অস্থিরতা প্রকাশ পায় কমলমণিকে ঘন ঘন পত্র প্রেরণের মধ্য দিয়ে। সূর্যমুখী কমলকে লিখল, 'একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি। তুমি বই আর আমার সুহৃদ কেহ নাই। একবার এসো!' এই চিঠির একটি পংক্তির মধ্যেই সূর্যমুখীর জীবনের শূন্যতা ও নৈরাশ্যের দিকটি চমৎকার ফুটে উঠেছে। এক একটি পত্রের এক একটি চরণ যেন একটি চরিত্র বা মানুষকে ভাল করে চিনে নেবার এক একটি মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র বিশেষ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে আবার চিঠিপত্রাদির ব্যবহার। এর মধ্যে অর্থাৎ ত্রয়োদশ থেকে চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের মূল ঘটনা হল কমল গোবিন্দপুর এসেছিল; যে দিন সে কুন্দকে কলকাতায় নিয়ে আসবে স্থির করেছিল তারই পূর্বদিন গভীর রাত্রে সকলের অজ্ঞাতে কুন্দ গৃহত্যাগ করল। প্রসঙ্গটি মনে রাখবার জন্য মূল ঘটনাটি উল্লেখ করলাম।

সূর্যমুখী কমলকে পত্রে লিখছে, 'প্রিয়তমে! তুমি কলিকাতায় গিয়া পর্যন্ত আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ—নহিলে একখানি বই পত্র লিখিলে না কেন?' কলকাতায়

ফিরে কমল সূর্যমুখীকে কি পত্র দিয়েছিল তা অনুমান করা যেতে পারে। সে পত্রে বিশেষ জরুরী প্রসঙ্গ নিশ্চয় ছিল না। হয়ত কেবল নির্বিঘ্নে পৌছানর সংবাদ ছিল আর কুন্দর খোঁজ পাওয়া গেল কিনা তাও নিশ্চয় জানতে চাওয়া হয়েছিল। যাই হোক সূর্যমুখী এখন কমলকে চিঠিতে কেবল যে কুন্দ-প্রাপ্তি সংবাদ জানাচ্ছে তাই নয়; আরও একটি কঠিন সংবাদ তাকে জানাতে হচ্ছে। সূর্যমুখী লিখছে, 'কুন্দের সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ হইবে। এ বিবাহে আমিই ঘটক।' সূর্যমুখীর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখব সে কিছু গর্বিত স্বভাবা। একথা বঙ্কিমও উপন্যাসের একস্থানে উল্লেখ করেছেন। পরস্ত্রীলোলুপ স্বামীকে নিবৃত্ত করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে নীরবে সূর্যমুখী আত্মবিসর্জন করেছে; নিজেই সে তার স্বামীকে সপত্নীর হাতে তুলে দিয়েছে। বালিকা ভ্রমর যেভাবে বিপথগামী স্বামীর পা ধরে প্রেমভিক্ষা চেয়েছিল, সূর্যমুখীর পক্ষে সে অবস্থা কল্পনা করাও কঠিন। কমলমণিকে সূর্যমুখী যে চিঠি দিয়েছে দু-একটি পঙক্তির মধ্যে তার স্বভাবের এই গর্বের দিকটা চমৎকারভাবে ধরা পড়ে। সূর্যমুখীর এই যে গর্ব, এর মধ্যে পরুষতা কিছুই নেই, পত্রের মধ্যে স্বামীর প্রতি তিরস্কার বাক্য কোথাও প্রকাশ পায় নি, সেখানে আছে মর্মস্থল পর্যন্ত একটা অকৃত্রিম ভক্তি ও স্নেহরসের অভিসিঞ্চন।

সূর্যমুখীর এই পত্র পেয়ে কমলমণি ও তার স্বামী শ্রীশচন্দ্র কি করবে প্রথমে ঠিক স্থির করতে পারল না। শেষে শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রকে তার পুনর্বিবাহের কথা তুলে ব্যঙ্গ করে পত্র লিখল। পত্রটি উপন্যাসে উদ্ধৃত হয় নি, তবে পত্রোত্তরে নগেন্দ্র কি লিখেছিল তা বলা হয়েছে। বিবাহ সম্পর্কে নগেন্দ্র স্বপক্ষে যে-সকল যুক্তি খাড়া করে তুলেছিল একটি চিঠির মধ্য দিয়ে তাই প্রকাশিত হয়েছে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদটির নাম আশীর্বাদ পত্র। কমলমণিকে পত্র লিখে রেখে সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করল। সূর্যমুখী প্রথমে নগেন্দ্রকে পত্র লিখে যাবে স্থির করেছিল; তাহলে কমলকে পত্র লেখবার প্রয়োজন দেখা দিত না। কিন্তু নগেন্দ্রকে পত্র লেখা তার শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না।

দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদটি তিনটি পত্রে সম্পূর্ণ। হরদেব ঘোষালের প্রতি নগেন্দ্র দত্তের পত্র, হরদেব ঘোষালের উত্তর এবং নগেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর। কুন্দর সঙ্গে বিবাহের কথা নগেন্দ্র হরদেব ঘোষালকে জানিয়েছিল। সংবাদ পেয়ে হরদেব ঘোষাল লেখে কুন্দর সঙ্গে বিবাহ নগেন্দ্রের জীবনে সর্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। বিবাহের পর পনের দিন যেতে না যেতে নগেন্দ্রকে একথা স্বীকার করতে হল। নগেন্দ্র লিখছে, 'তুমি লিখিয়াছ যে, আমি এ পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি, তাহার

মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা সর্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। ইহা আমি স্বীকার করি। আমি এই কাজ করিয়া সূর্যমুখীকে হারাইলাম।' নগেন্দ্র আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছে, কুন্দর প্রতি তার যে ভালবাসা সে কেবল চোখের ভালবাসা। সূর্যমুখীকে হারিয়ে কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রের প্রেমের শিখা সহসা নিবে গেল। সূর্যমুখীকে ফিরে পাবার জন্য তার মন অধীর হয়ে উঠল। এই অধীরতা তার সংক্ষিপ্ত পত্রটির মধ্যে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে।

এইবার হরদেব ঘোষালের উত্তর। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে হরদেব ঘোষাল এই উপন্যাসে একটি প্রয়োজনীয় চরিত্র কিন্তু তার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় তার পত্রগুলির মধ্য দিয়েই। উপন্যাসের বাস্তবভূমিতে সে কোনো সময় অবতরণ করে নি। পত্রপ্রাপক ও প্রেরকরূপেই তার উপন্যাসে স্থান।

হরদেব ঘোষালের চিঠি পড়ে তাকে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে খুব দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। বলা চলে হরদেব ঘোষাল ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় অভিন্ন। বঙ্কিমের আরও অনেক উপন্যাসের কোনো কোনো চরিত্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের আরোপ লক্ষ্য করা যায়। হরদেব ঘোষাল যে কথা বলেছে তা বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কথা, হরদেবের কলমে লেখা হয়েছে মাত্র। এই প্রসঙ্গে কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থে কমলাকান্তের উক্তিগুলি মনে পড়ছে। দপ্তরটি যে বঙ্কিমচন্দ্র-কমলাকান্তের রচনা, আমাদের আলোচ্য পত্রটি সেই বঙ্কিমচন্দ্র-হরদেব ঘোষালের রচনা। হরদেব নগেন্দ্রকে যে চিঠি লিখেছে তা বঙ্কিমের কলম দিয়ে লেখা। তাই তাকে কোনো স্বতন্ত্র চরিত্র হিসেবে দেখবার সুযোগ এই উপন্যাসে সৃষ্ট হয় নি। বহুসংখ্যক পত্র সংকলন করে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ উপন্যাসটিকে যেভাবে খাড়া করেছেন আঙ্গিক ও নূতনত্বের দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে তা অনন্য। পত্রোপন্যাস রূপে নূতন করে তার মূল্য নির্ণয়ের সুযোগ আছে বলে বোধ হয়।

ইন্দিরা উপন্যাসের মধ্যেও একাধিক পত্রের ব্যবহার আছে। গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ইন্দিরার শ্বশুর ইন্দিরার পিতাকে পত্র লিখেছে, 'আপনার আশীর্বাদে উপেন্দ্র বধূমাতাকে পালন করিতে সক্ষম। পাল্কী বেহারা পাঠাইলাম, বধূমাতাকে এ বাটিতে পাঠাইয়া দিবেন। নচেৎ আজ্ঞা করিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্বন্ধ করিব।' এই ক্ষুদ্র পত্রটিতে একই সঙ্গে বিনয় এবং যোগ্য পুত্রের পিতৃসুলভ দাম্ভিকতা চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে।

দশম পরিচ্ছেদের নাম আশার প্রদীপ। সুভাষিনীর স্বামী রমণবাবু ইন্দিরার

পিতার কাছে পত্র লিখবার উদ্যোগ করল। ইন্দিরা পিতার নাম বলল, গ্রামের নাম বলল, কিন্তু ডাকঘরের নাম বলতে পারল না। ইন্দিরা অতশত খবর রাখত না। যাই হোক মহেশপুরেই ডাকঘর আছে বিবেচনা করে পত্র লেখা হল। ইন্দিরা আহ্লাদিত হয়ে আশার আলো দেখল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই আলো নিবে গেল। চিঠি ফেরত এল। মহেশপুরে কোনো ডাকঘর ছিল না। তখন গ্রামে গ্রামে ডাকঘর হয় নি। ভিন্ন গ্রামে ডাকঘর ছিল। ডাকঘরের ঠিকানা না পেয়ে কলকাতার বড় ডাকঘর রমণবাবুর চিঠি খুলে ফেরত পাঠিয়ে দিল। এরপর রমণবাবু ইন্দিরার শ্বশুর বাড়িতে পত্র দিল। সুভাষিনী ইন্দিরার কাছ থেকে স্বামী, শ্বশুর ও গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করে নিল কিন্তু ডাকঘরের নামধাম এক্ষেত্রেও তার জানা নেই। ইন্দিরা শুনল রমণবাবু পত্র পাঠিয়েছে কিন্তু পত্রের কোনো উত্তর এল না। বড় ডাকঘর থেকে পত্র ফেরতও এল না। এই ঘটনা ইন্দিরার মনকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলল। তবে কি শ্বশুর বাড়িতে এ পত্র হস্তগত হয়েছে? পত্র যদি হস্তগত হয়েই থাকে তবে তাঁরা কোনো উত্তর দিলেন না কেন? ইন্দিরা বলছে, 'একটা কথা তখন মনে পড়িল, আমি আশায় বিহ্বল হইয়া পত্র লিখিতে বারণ করি নাই। এখন আমার মনে পড়িল, ডাকাতে আমাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে ; আমার কি জাত আছে? এই ভাবিয়া শ্বশুর স্বামী আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন সন্দেহ নাই। সে স্থলে পত্র লেখা ভালো হয় নাই। এ কথা শুনিয়া সুভাষিনী চুপ করিয়া রহিল।' পাঠকও বিষণ্ন মনেই পরবর্তী পরিচ্ছেদে মন দেয়। রমণবাবু সে পত্রে কি লিখেছিল তা সুভাষিনী ছাড়া ইন্দিরা সহ পাঠকবর্গ কেউই জানতে পারল না। সে পত্রে ইন্দিরার কোনো প্রসঙ্গই ছিল না। নীরস মামলা মোকদ্দমার কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা ছিল। এ কথা আমরা জানতে পারি পরবর্তী পরিচ্ছেদে, সুভাষিনীর মুখ থেকে, উপেন্দ্র তখন রমণবাবুর ঘরের অতিথি।

যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসের মূল রহস্য ছিন্নপত্রটিকে কেন্দ্র করে। ছিন্নপত্রের দুই খণ্ড যখনই একত্রিত হল তখনই কাহিনীর রহস্য উন্মোচিত হয়েছে এবং গল্পও সমাপ্ত হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ছিন্নপত্র খণ্ডটি উদ্ধৃত। দশম পরিচ্ছেদে দুটি পত্র একত্রিত করা হয়। পত্রটি প্রয়োজনবোধে উদ্ধৃত করছি। বন্ধনীর মধ্যবর্তী পাঠ ছিন্ন পত্রের একদিকের অংশ, যা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছিল—

'(জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম) যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ তাহা কর্তব্য নহে। (হিরণ্ময়ী তুল্য সোনার পুত্তলিকে) কখন চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা

যাইতে পারে না। তাহার (বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।) তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চ বৎসর (পর্যন্ত পরস্পরে) যদি দম্পতি মুখদর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি (হইতে পারে) তাহার বিধান আমি করিতে পারি।'

পঞ্চম বাক্যে বন্ধনীর মধ্যে আছে (পর্যন্ত পরস্পরে)। অর্থাৎ এটি ছিন্নপত্রের এক দিকের পাঠ, যা হিরণ্ময়ী প্রথম দেখেছিল এবং যা গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'পর্যন্ত পরস্পরে'র জায়গায় আছে 'সর মুখ পরস্পরে'। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পাঠ অবলম্বন করলে দশম পরিচ্ছেদের পূর্ণাঙ্গ পাঠ হয়, 'তবে পঞ্চ বৎ (সর মুখ পরস্পরে) যদি দর্শন না করে' ইত্যাদি।

আমাদের প্রশ্ন 'সর মুখ পরস্পরে'র জায়গায় দশম পরিচ্ছেদে যে 'পর্যন্ত পরস্পরে' ব্যবহার করা হয়েছে—এ ভ্রম কি মূল ঔপন্যাসিকের? এ কথা বঙ্কিম অনুরাগী পাঠকের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত। এ ভ্রম অপর কোনো অমনোযোগী ঔপন্যাসিকের হাতে ঘটলে আশ্চর্য হতাম না। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে ঘটেছে বলেই প্রশ্নটি তুলে ধরলাম।

এই ছিন্নপত্রটি ছাড়া যুগলাঙ্গুরীয়ে অপর কোনো চিঠিপত্র ব্যবহৃত হয় নি।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে গুরগণ খাঁকে লিখিত দলনীর পত্র কাহিনীর ঘটনাবলীর দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছেন, 'এই পত্রটিকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একসূত্রে গাঁথিলেন।' শৈবলিনী স্বেচ্ছায় পথে নেমেছে, দলনীকে ঘটনাচক্রে পথে নামতে হয়েছে। এবং শেষে তাদের যাত্রাপথ প্রায় মিলে যায় একসূত্রে।

পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে দলনীর সংবাদ নিয়ে অশ্বারোহী দূত মুঙ্গেরে নবাবের উদ্দেশ্যে ছুটল। পত্রটি দলনী সম্পর্কে মিথ্যা বাক্যে পরিপূর্ণ। মহম্মদ তকিকে মিথ্যা কথা বানাতে হল আত্মরক্ষার জন্য। নবাব তকি খাঁর পত্র বিশ্বাস করলেন। একমুহূর্তেই দলনীকে বিশ্বাসঘাতিনী মনে হল। মীরকাসেম মহম্মদ তকিকে লিখলেন, 'দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও।' এই পত্রই চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দলনীকে নিহত করে।

ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ওয়ারেন্ হেস্টিংসের একখানি পত্র পাচ্ছি। আমীর হোসেন সে-পত্র পড়ে নবাবকে শোনাল। হেস্টিংস লিখছেন, 'এ স্ত্রীলোক কে, তাহা আমি চিনি না, সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মিনতি

করিল যে, কলিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পায়। আপনাদিগের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না। এজন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। ভাল মন্দ কিছু জানি না।' এই উপন্যাসে হেস্টিংসের প্রসঙ্গ এর বেশি কিছু নেই। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পত্রটির মধ্য দিয়ে বঙ্কিম হেস্টিংসের চরিত্রের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। ওয়ারেন্ হেস্টিংসের প্রতি বঙ্কিমের বরাবর একটা শ্রদ্ধার ভাব বজায় ছিল। আনন্দমঠের চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, 'উত্তর বাঙ্গালা মুসলমানের হাতছাড়া হইয়াছে। মুসলমান কেহই একথা মানেন না—মনকে চোখ ঠারেন—বলেন, কতকগুলা লুঠেড়াতে বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে—শাসন করিতেছি। এইরূপ কতকাল যাইত বলা যায় না ; কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন্ হেস্টিংস কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল। ওয়ারেন্ হেস্টিংস মনকে চোখ ঠারিবার লোক নহেন—তাঁর সে বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত?' তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আছে, 'এই সময়ে প্রথিতনামা, ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য ওয়ারেন্ হেস্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল।' আনন্দমঠের পরিশেষে Appendix I-এ ওয়ারেন্ হেস্টিংসের ইংরেজি পত্র উদ্ধৃত হয়েছে। শিরোনামায় আছে—History Of The Sannyasi। Rebellion : From Warren Hastings' Letters in Gleig's Memoirs। দেবী চৌধুরাণীতে বঙ্কিম কোনো উক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য পাদটীকায় লিখেছেন, 'এ কথা Warren Hastings নিজে লিখিয়াছেন।' গভীর শ্রদ্ধাবশতই বঙ্কিম স্বীয় উপন্যাসে হেস্টিংস চরিত্র আনতে চেয়েছিলেন। পত্রলেখক রূপে পেলেও চন্দ্রশেখর উপন্যাসের গৌণচরিত্র আলোচনা কালে হেস্টিংসের নামও উল্লেখ করতে হবে।

কৃষ্ণকান্তের উইলে অনেক পত্রাদির ব্যবহার আছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখি কলকাতা থেকে হরলাল পিতা কৃষ্ণকান্তকে এক পত্রে লিখছে, 'কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি মানস করিয়াছি যে, একটি বিধবাবিবাহ করিব। আপনি যদ্যপি উইল পরিবর্তন করিয়া আমাকে ৷৷৹ আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র রেজিষ্টরি করেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাগ করিব, নচেৎ শীঘ্র একটি বিধবাবিবাহ করিব।'

কৃষ্ণকান্ত উত্তরে লিখলেন, 'তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিষয় দিব। তুমি

এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।'

এরপর হরলাল পুনরায় সংবাদ পাঠাল যে, সে বিধবাবিবাহ করেছে। প্রথম পরিচ্ছেদে দুবার উইল ছিঁড়তে হয়েছে। দ্বিতীয়বার কৃষ্ণকান্ত হরলালের পত্র পড়ে উইল ছিঁড়েছে। এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে উভয়ের চরিত্র চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথম খণ্ডের ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে দুটি পত্র আছে। একটি গোবিন্দলালকে লিখিত ভ্রমরের, অপরটি ব্রহ্মানন্দের। বঙ্কিম ভ্রমরের পত্র সম্বন্ধে বলছেন, 'ম'গুলা 'স'র মত হইল—'স'গুলা 'ম'র মত হইল—'ধ'গুলা 'ফ'র মত, 'ফ'গুলা 'থ'র মত, 'থ'গুলা 'খ'র মত, ইকারের স্থানে আকার—আকারের একেবারে লোপ, যুক্ত অক্ষরের স্থানে পৃথক পৃথক অক্ষর, কোন কোন অক্ষরের লোপ, ভ্রমর কিছু মানিল না।' লেখন রাজ্যের এই অরাজকতার মধ্য দিয়ে ভ্রমরের অগ্নিদগ্ধ মনোরাজ্যের ছবিই ফুটে উঠেছে। গভীর দুঃখে ও অপমানে ভ্রমর স্বামীকে কিছু কঠিন কথা বলল। ভ্রমর লিখছে, 'যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যত দিন তুমি বিশ্বাসী ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ি আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।' ব্রহ্মানন্দের চিঠি গোবিন্দ-ভ্রমরের সম্পর্ককে আরও জটিলতর করতে সহায়ক হল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে আছে, গোবিন্দলাল ভ্রমরের পত্র পেয়ে স্বদেশ যাত্রা করলে নায়েব কৃষ্ণকান্তের কাছে খবর পাঠাল যে, 'মধ্যম বাবু অদ্য প্রাতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।'

কৃষ্ণকান্তের উইলে কোনো পত্রের ব্যবহারই অনাবশ্যক নয়। প্রত্যেকটি চিঠিই উপন্যাসের ঘটনাস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। নায়েবের প্রেরিত পত্র ডাকে এল। নৌকোর চেয়ে ডাক আগে আসে। গোবিন্দলাল স্বদেশে পৌছবার চার পাঁচ দিন আগে কৃষ্ণকান্তের কাছে নায়েবের পত্র পৌছল। ভ্রমরও শুনল গোবিন্দলাল আসছে। সুতরাং সে সেই মুহূর্তে পিত্রালয় যাবার উদ্যোগ করল। মাকে পত্র লিখতে বসল। খান চার পাঁচ কাগজ কালিতে পূর্ণ করে, ছিঁড়ে ফেলে, ঘণ্টা দুই চারের মধ্যে একখানা পত্র লিখে খাড়া করল। এত সময় লাগল কেন? তার কারণ ভ্রমরকে অনেক ভেবে চিন্তে মিথ্যে কথা বানিয়ে লিখতে হল। ভ্রমর

লিখল, 'আমার বড় পীড়া, হইয়াছে। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না, পীড়া বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পার যদি, কালি লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার কথা বলিও না।'

নায়েবের চিঠি না এলে গোবিন্দলালের ফেরবার আগে ভ্রমরের পিতৃগৃহে যাওয়া সম্ভব হত না।

কন্যার চিঠি পেয়ে ভ্রমরের পিতা কৃষ্ণকান্তকে পত্র লিখলেন। কৌশল করে ভ্রমরের পীড়ার কোনো কথা না লিখে লিখলেন যে, 'ভ্রমরের মাতা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন—ভ্রমরকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন।' কৃষ্ণকান্তের সম্মতি পেয়ে ভ্রমর বাপের বাড়ি এসে উপস্থিত হল। গোবিন্দলাল বাড়িতে পৌঁছে শুনল ভ্রমর পিতৃগৃহে। তখনই সকল কথা বুঝল। গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবল, 'এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না।' সমগ্র উপন্যাসে এক একটি পত্র এক এক ভাবে কাজ করে চলেছে। চরিত্রগুলির নূতনতর কর্মপ্রণালীতে প্রেরণা দিয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ চিঠি-পত্রের আদান-প্রদানেই সমাপ্ত হয়েছে। কাশী থেকে গোবিন্দলালের চিঠি আমলাবর্গের কাছে আসতে লাগল, কিন্তু ভ্রমরের কাছে কোনো চিঠিই এল না। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখল না। শেষে একদিন সংবাদ এল গোবিন্দলাল কাশী ত্যাগ করেছে কিন্তু সে দেশে ফিরে এল না। পাঁচ ছয় মাস কাটল গোবিন্দলালের কোনো সংবাদ নেই। ভ্রমরের রোদনেরও শেষ নেই। শেষে ননদকে বলে শাশুড়ীকে পত্র লেখাল—আপনি মা, অবশ্য পুত্রের সংবাদ পান। শাশুড়ী লিখছে, গোবিন্দলাল দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে কোথাও স্থায়ী হচ্ছে না। অপরদিকে দেখা যায় রোহিণীও হরিদ্রা গ্রাম ত্যাগ করেছে। ভ্রমরের মনকে স্থির রাখা কঠিন হল। এদিকে দিন কাটতে লাগল। শাশুড়ীর কাছে ভ্রমরের দ্বিতীয় পত্র এল। শাশুড়ী এবার লিখল, 'গোবিন্দলাল আর কোনো সংবাদ দেয় না; এখন সে কোথায় আছে জানি না। কোনও সংবাদ পাই না।' প্রথম পরিচ্ছেদে কেবল কয়েকটি পত্র উদ্ধৃত করে বঙ্কিম ভ্রমর-গোবিন্দ বিরহের প্রথম বৎসরের অস্থির চিত্র তুলে ধরলেন।

গোবিন্দলালের সন্ধান করতে মাধবীনাথকে হরিদ্রা গ্রামের পোস্টআপিসে গিয়ে হাজির হতে হল। অনুসন্ধানে জানা গেল গোবিন্দলাল বর্তমানে প্রসাদপুরে

আছে। সেখান থেকে ব্রহ্মানন্দের নামে প্রায়ই রেজেষ্ট্রি চিঠি এসে থাকে। পোস্ট-মাস্টার পুরনো রসিদ বার করে মাধবীনাথকে দেখাল। মাধবীনাথ পুলিসের ভয় দেখিয়ে কৌশলে ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে প্রসাদপুর থেকে লিখিত রোহিণীর পত্র দেখে নিল। সেই পত্রে মাধবীনাথ যা খুঁজেছিল সবই পেল।

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেওয়ানকে লিখিত গোবিন্দলালের একটি পত্র উদ্ধৃত হয়েছে। পত্রে গোবিন্দলাল লিখেছে, 'আমি জেলে চলিলাম—আমার পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা যদি তোমাদিগের অভিপ্রায় সম্মত হয়, তবে এই সময়। আমি তাহার যোগ্য নহি, তবে ফাঁসি যাইতে না হয়, এই ভিক্ষা। জনরবে এ কথা বাড়িতে জানাইও, আমি পত্র লিখিয়াছি, এ কথা প্রকাশ করিও না।' এই চিঠির মাধ্যমে বঙ্কিম গোবিন্দলালের চরিত্রের একটি দিক তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই উপন্যাসে রোহিণী গুলিবিদ্ধ হয়ে মরেছে। এইরূপে তার পাপের শাস্তি হয়েছে। কিন্তু রোহিণী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মরতে চায় নি। রোহিণীর শেষ কয়েকটি কথা এরূপ: 'মরিব না, মারিও না। চরণে না রাখ, বিদায় দেও।...আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না।' গোবিন্দলালের ওপর ফাঁসির হুকুম এসেছে। মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু গোবিন্দলাল এ মৃত্যুতে ভয় পায়। বাঁচবার জন্য সে শেষ চেষ্টা করল। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই ভ্রমরের কাছে পত্র লিখল, 'আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি।...পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?' রোহিণীও বাঁচতে চেয়েছিল গোবিন্দলালও বাঁচতে চায়। তাদের কাছে মৃত্যু সহজ নয়। পাপের শাস্তি এই। মৃত্যুকে তারা ভয় পায়। কিন্তু ভ্রমরের জীবনে কোনো পাপ নেই, সে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। তাই উপন্যাসের শেষে ভ্রমরের যে মৃত্যু ঘটল তা পাপীর পাপজাত শাস্তি নয়, পুণ্যাত্মার পুরস্কার হিসেবে এসেছে।

রাজসিংহ উপন্যাসে অনেক পত্রের ব্যবহার আছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম চঞ্চলকুমারীর পত্র। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনন্ত মিশ্রই চঞ্চলের কাছে রাজসিংহকে পত্র লেখবার প্রস্তাব তোলে। চঞ্চল সম্মত হয়। মিশ্র জিজ্ঞাসা করে, 'আমি লিখিয়া দিব, না আপনি লিখিবেন?' চঞ্চল বলে, 'আপনি বলিয়া দিন।' নির্মল তখন সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, 'তা হইবে না। এ বামুনে বুদ্ধির কাজ নয়—এ মেয়েলি বুদ্ধির কাজ। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন।' এই 'মেয়েলি বুদ্ধি'র পরিচয় পঞ্চম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত পত্রের মধ্যে পাঠক

পেয়েছেন। পত্রের অনেকটা অংশ উদ্ধৃত করে লেখক বলছেন, 'এই পর্যন্ত পত্রখানি রাজকন্যার হাতের লেখা। বাকি যেটুকু, সেটুকু তাহার হাতের নহে। নির্মলকুমারী লিখিয়া দিয়াছিল, রাজকুমারী তাহা জানিতেন কিনা, আমরা বলিতে পারি না।' নির্মলকুমারী যা লিখেছিল রাজকুমারীর তা জ্ঞাত ছিল কিনা জানতে হলে পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখতে হবে। রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারীর কথোপকথনের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করছি : 'রানা চঞ্চলকুমারীর পত্রখানি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীকে দেখাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ তোমার পত্র বটে ?'

চঞ্চল বলিল, 'আজ্ঞা হাঁ'।

রানা। কিন্তু সবটুকু এক হাতের লেখা নহে। দুই হাতের লেখা দেখিতেছি। তোমার নিজের হাতের কোন অংশ আছে কি ?

চঞ্চল। প্রথম ভাগটা আমার হাতের লেখা।

রানা। তবে শেষ ভাগটা অন্যের লেখা ?

পাঠকের স্মরণ থাকিবে যে, এই অংশেই বিবাহের প্রস্তাবটা ছিল। চঞ্চলকুমারী উত্তর করিলেন, 'আমার হাতের নহে।'

রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিন্তু তোমার সম্মতিক্রমেই ইহা লিখিত হইয়াছিল ?'

প্রশ্নটা অতি নির্দয়। কিন্তু চঞ্চলকুমারী আপনার উন্নতস্বভাবের উপযুক্ত উত্তর করিলেন। বলিলেন, 'মহারাজ! ক্ষত্রিয়রাজগণ বিবাহার্থেই কন্যাহরণ করিতে পারেন। অন্য কোন কারণে কন্যাহরণ মহাপাপ। মহাপাপ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিব কি প্রকারে ?' চঞ্চলের শেষ উক্তি থেকে বোঝা যায় নির্মল পত্রের দ্বিতীয় অংশে কি লিখেছিল তা চঞ্চলের অজ্ঞাত ছিল না। এ সব কাজ কি রাজকুলপুরোহিত অনন্ত মিশ্রের পক্ষে সম্ভব হত ? নির্মল ঠিকই বুঝেছিল—এ বামুনে বুদ্ধির কাজ নয়। যাই হোক মিশ্রঠাকুর পত্রলেখক না হলেও পত্রবাহক হল। বিক্রম সিংহের কাছে সে একটি পরিচিতি পত্র সংগ্রহ করল।

মাণিকলাল এই উপন্যাসের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সে সমগ্র উপন্যাসেই একের পর এক বুদ্ধির খেলা খেলে গিয়েছে। তার চাতুর্যের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত আছে তৃতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে। মাণিকলাল রসিকা পানওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করে যে ছলপত্র রচনা করেছিল তা পাঠকের ভুলবার কথা নয়।

পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাজসিংহ চঞ্চলের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করে 'একখানি সবিনয় পত্র লিখিয়া বিক্রম সোলাঙ্কির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

চঞ্চলকুমারীও মাতার আশীর্বাদ কামনা করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন।' তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে,—রূপনগরের অধিপতির উত্তর উপযুক্ত সময়ে পৌছল। উত্তর অতি ভয়ানক। এই ভয়ানক পত্রই উপন্যাসের ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করে তুলতে সহায়তা করেছে। বিক্রম সিংহ পত্রে লিখেছে, 'আপনি আমার কন্যা বিবাহ করিবেন না। করিলে আপনাদিগকে আমার শাপগ্রস্ত হইতে হইবে।' কিন্তু এই বিক্রম সোলাঙ্কিকেই উপন্যাসের পরিণতিতে বলতে হয়েছে, 'মহারাজ! আমাকে মার্জনা করিতে হইবে। আমি না জানিয়াই তেমন পত্রখানা লিখিয়াছিলাম।'

রাজসিংহের পরবর্তী উপন্যাস আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীতে চিঠিপত্রের কোনো ব্যবহার নেই। শেষ উপন্যাস সীতারামেও নেই বললেই চলে। কেবল দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে তোরাব খাঁ ও চন্দ্রচূড়ের মধ্যে এবং নবম পরিচ্ছেদে তোরাব-গঙ্গারামের মধ্যে দু-একবার চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে। কিন্তু এসব পত্র নিতান্তই বিষয়ঘটিত, চরিত্রপ্রকাশক নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস সাহিত্যে চিঠিপত্রের ব্যবহার কম নয়। এটি উপন্যাসের আঙ্গিকের একটি বিশেষ দিক। বহু ক্ষেত্রে গল্পের অনেক মৌলিক অংশ পত্রের সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে। কখনও কখনও চিঠিপত্র চরিত্রাদি বুঝবার দর্পণ-হিসেবে কাজ করেছে। বাংলা উপন্যাসে চিঠিপত্র ব্যবহারের প্রচলন ঘটিয়ে বঙ্কিম তাঁর আঙ্গিক-সচেতনতারও এক বিস্ময়কর পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন দিক থেকে এই পত্রব্যবহার বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক বিশিষ্টতারই পরিচয় বহন করে।

৭

নায়ক নায়িকারা স্বল্পায়ু কেন ?

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অধিকাংশ নায়ক-নায়িকাকেই দেখি স্বল্পায়ু। বিশ পঁচিশ তিরিশের মধ্যে অনেকগুলি চরিত্রের মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুগুলিও বৈচিত্র্য-পূর্ণ। কোনো কোনো চরিত্র স্বল্প বা দীর্ঘ রোগভোগের পর মারা গেছে, কোনো চরিত্রের দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে, আর বেশ কিছু সংখ্যক চরিত্রের আত্মহত্যার ফলে মৃত্যু হয়েছে। আত্মহত্যাও নানান্ রকম। কেউ যুদ্ধে গিয়ে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়েছে, কেউ বিষপান করে মারা গেছে, কেউ বা জলে ডুবে মরেছে। এসব দেখে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, তাঁর উপন্যাসে মৃত্যুর এই দীর্ঘ মিছিল কেন ?

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার, বিষবৃক্ষ উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী ও তার স্বামী তারাচরণ এবং ওই উপন্যাসে দেবেন্দ্র, চন্দ্রশেখর উপন্যাসে প্রতাপ ও দলনী, কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী এবং ভ্রমর—এরা সকলেই বঙ্গসাহিত্যে দীর্ঘজীবী হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপাখ্যানে কিন্তু এদের কেউই বেশি দিন বেঁচে থাকবার সুযোগ বা অধিকার পায় নি। উপন্যাসে এরা সকলেই স্বল্প পরমায়ু নিয়ে এসেছে এবং কাহিনী শেষ হবার পূর্বেই, এমনকি হয়ত সমস্যা সমাধান হবার আগেই এরা ভবলীলা সাঙ্গ করে পরলোক গমন করেছে। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয় কপালকুণ্ডলা কুন্দনন্দিনী প্রতাপ রোহিণী বা ভ্রমর যদি স্বল্পায়ু না হত, মৃত্যু যদি তাদের জীবনে এত দ্রুত না নেমে আসত—তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কি অবস্থা ঘটত !

কৃষ্ণকান্তের উইলে দেখা যায় রোহিণী ও ভ্রমরের মৃত্যু হয়েছে। আসলে কিন্তু এই উপন্যাসে গোবিন্দলালেরও মৃত্যু ঘটেছিল। বঙ্কিম যখন উপন্যাসটি প্রথম লেখেন তখন গল্পের নায়ক গোবিন্দলালকেও তিনি নিষ্কৃতি দেন নি। তাকে বারুণীর জলতলে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। গোবিন্দলালের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি

ঘটেছিল। বঙ্গদর্শনে বা প্রথম দিকের সংস্করণে এই কাহিনী আছে। পরবর্তী কালে বঙ্কিম গোবিন্দলালকে পুনর্জীবিত করেন। পরলোক থেকে নায়ক গোবিন্দলাল ইহলোকে ফিরে আসে।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের সমাপ্তি কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের মৃত্যুতে। এই উপন্যাসে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল—কাপালিক কর্তৃক আবাল্য বনপালিতা কোনো যুবতীকে যদি বিবাহবন্ধনে হঠাৎ সমাজ বা সংসারে এনে উপস্থিত করা যায়, তাহলে সেই মেয়েটি কি ধীরে ধীরে সমাজ ও সংসারের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে? এই প্রশ্ন বঙ্কিম উপন্যাস লেখবার আগেই বন্ধু দীনবন্ধু ও মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে করেছিলেন। দীনবন্ধু এই প্রশ্নের কোনো মতামত দেন নি। সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন রসিক মানুষ। অনুজের মুখে এই প্রশ্ন শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন—গরীবের ঘরে বিয়ে হলে মেয়েটা চোর হবে, বনে-জঙ্গলে তো খাওয়া-দাওয়া ভাল জোটে না, তাই সমাজে এসে এসব সামগ্রী দেখে সে বড় লোভী হবে, পরের চুরি করে খাবে, গয়নাগাটি চুরি করে পরবে। পরে রসিকতা পরিত্যাগ করে সঞ্জীবচন্দ্র বলেছিলেন—কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকবে, তারপর সন্তানাদি হলে স্বামী ও পুত্র-কন্যাদের প্রতি স্নেহ জন্মালে সহজেই সমাজের লোক হয়ে যাবে—সন্ন্যাসীর প্রভাব তখন আর তার মনের উপর ক্রিয়া করবে না।

এখানে স্মরণীয়, বঙ্কিম কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটি অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রকেই উৎসর্গ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সংসারে আনলেন। কিন্তু এই সংসারজীবনে 'এক বৎসরের অধিককাল' যেতে না যেতেই কপালকুণ্ডলার আকস্মিক মৃত্যু ঘটল। যে মেয়ে একেবারে শিশুকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত সমাজ সংসারের বাইরে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—সে সমাজে এসে এক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে না। সে ধীরে ধীরে সমাজের একটি মানুষ হয়ে উঠতে পারে কি না তা দেখার জন্য যথেষ্ট সময় আবশ্যক। একটি মাত্র বৎসর সেদিক থেকে মোটেই সমর্থনযোগ্য সময় নয়। সঞ্জীবচন্দ্র বলেছিলেন, পুত্রকন্যা হলে ধীরে ধীরে সংসারের প্রতি তার স্নেহ জন্মাবে। উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা মা হবার সুযোগ পায় নি, এমন কি তাকে সন্তানসম্ভবা হতেও দেখি না। মনে হয় বঙ্কিম একটু দ্রুতই কপালকুণ্ডলার মৃত্যু ঘটিয়েছেন এই উপন্যাসে।

কাহিনীর শেষাংশে কপালকুণ্ডলার যে মৃত্যু তা কি তার স্বেচ্ছামৃত্যু? কপালকুণ্ডলার মৃত্যুর সংকল্প থাকলেও সে যেভাবে উপন্যাসে মরেছে তা কিন্তু অনেকটা

দুর্ঘটনার মত। 'চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল; অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোর রবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন।' এ মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিতই হোক বা আত্মহত্যাই হোক—উপন্যাসের পক্ষে তা আকস্মিকতার লক্ষণাক্রান্ত বলে বোধ হয়।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে কেবল কপালকুণ্ডলারই মৃত্যু হয়েছিল, নবকুমারের নয়।

উপন্যাস রচনাকালে বঙ্কিমের নিজের মনে কি এমন প্রশ্ন জেগেছিল যে—কপালকুণ্ডলার এই আকস্মিক মৃত্যু কাহিনীর পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ নয়! প্রথম সংস্করণের উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিম এক জায়গায় বলেছিলেন, 'কোন কোন পাঠক এ গ্রন্থশেষ পাঠ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। বলিতে পারেন, এরূপ সমাপ্তি সুখের হইল না; গ্রন্থকার অন্যরূপ করিতে পারিতেন। ইহার উত্তর, অদৃষ্টের গতি। অদৃষ্ট কে খণ্ডাইতে পারে? গ্রন্থকারের সাধ্য নহে।' অর্থাৎ বঙ্কিম গল্প লিখতে লিখতে নিজেই সে-সময় মনে করেছিলেন এমন আকস্মিক সমাপ্তিতে পাঠক হয়ত পরিতৃপ্ত হবে না।

কপালকুণ্ডলার মৃত্যু সম্পর্কে বঙ্কিমের যুক্তি হল—অদৃষ্ট কে খণ্ডাতে পারে? গ্রন্থকারের হাত নেই।

এ উপন্যাসে কাপালিকের হাত থেকে নবকুমার বাঁচল, ডাকাতদলের হাতে আহত হয়েও মতিবিবি রক্ষা পেল, কিন্তু কাহিনীর শেষাংশে অদৃষ্টের হাত থেকে—যার নামে উপন্যাসের নাম সেই কপালকুণ্ডলাই রক্ষা পেল না। কাহিনীর মূল সমস্যা (প্রবলেম) সমস্যাকারেই থেকে গেল, মাঝ পথে আকস্মিক মৃত্যু ঘটল কপালকুণ্ডলার।

বঙ্কিমের জীবৎকালে কপালকুণ্ডলার যে শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে দেখি উপন্যাসের শেষে নায়িকার সঙ্গে নায়ক নবকুমারেরও মৃত্যু ঘটেছে। এই সংস্করণে বঙ্কিম সেই অদৃষ্টের প্রসঙ্গটি গ্রন্থ থেকে পরিত্যাগ করেন। ওই ছত্রগুলির মধ্যে লেখকের যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, পরে তা বর্জন করে বঙ্কিম নিজেকে সামলে নিয়েছেন। নিজের কোনো দুর্বলতা থাকলে নিজে তা প্রকাশ করবেন কেন? কপালকুণ্ডলা মরল অদৃষ্টের কারণে, এবারে নবকুমারের মৃত্যু হল—তারও কারণ ওই অদৃষ্ট; যুক্তি হিসেবে তা আর ভালও শোনায় না।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী মরেছে বিষ খেয়ে, তার প্রথম পক্ষের স্বামী তারাচরণ মারা গেছে জ্বরবিকারে, আর উপকাহিনীর নায়ক দেবেন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে দীর্ঘ রোগযন্ত্রণা ভোগের পর।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রথম শহীদ তারাচরণ। বলা নেই কওয়া নেই—কুন্দের সঙ্গে বিবাহের তিন বছর পর হঠাৎ একদিন জ্বরে তারাচরণ মারা গেল। তার মৃত্যু সম্পর্কে সমস্ত উপন্যাসে একটি মাত্র বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে—'জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল।' সুতরাং কুন্দকেও এই সঙ্গে বিধবা হতে হল। বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বঙ্কিমের প্রয়োজন, তাই তারাচরণকে বাঁচান গেল না।

বঙ্কিম এখানেও বুঝেছিলেন তারাচরণের এই মৃত্যু অত্যন্ত দ্রুত এবং আকস্মিক, হয়ত বা অস্বাভাবিক। তাই উপন্যাসের যে অংশে তারাচরণের মৃত্যু হয়েছে, সেই পরিচ্ছেদটির নাম বঙ্কিম আগেভাগেই দিয়ে রাখেন—'পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ'।

উপন্যাসের শেষ ভাগে মারা গেছে কুন্দ এবং দেবেন্দ্র। কুন্দের মৃত্যুর এক বছর পর দেবেন্দ্রের মৃত্যু হয়। কুন্দ বিষ খেয়ে মরবার অনেক আগেই উপন্যাসের মাঝ পর্বে একবার মরতে চেয়েছিল। অদৃষ্টক্রমে ভাগ্যিস মরে নি। এক সন্ধ্যায় দত্তবাড়ির উদ্যানমধ্যে পুষ্করিণীর তীরে বসে কুন্দ বার বার ভেবেছে—জলে ডুবে মরলে হয় না? 'আমি কেন মলেম না। আমি এখনও বিলম্ব করিতেছি কেন? আমি এখনও মরিতেছি না কেন? আমি এখনই মরিব।' কুন্দ মরবার জন্য ধীরে ধীরে সরোবরের সোপানে অবতরণ করে। এমন সময় পেছন থেকে কুন্দের পিঠে নগেন্দ্র এসে হাত রাখে। ফলে কুন্দের সেদিন আর মরা হল না।

নগেন্দ্রকে বঙ্কিম তীব্র ভর্ৎসনা করে বললেন, 'নগেন্দ্র, তুমি মরিলেই ভাল হয়। যদি সাহস থাকে, তবে তুমি ডুবিয়া মর।' সেই সন্ধ্যায় কুন্দ বা নগেন্দ্র কারোরই মরা হয় নি।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে দেখি সূর্যমুখীও একবার মরতে চেয়েছিল, যখন জেনেছিল নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীতে আসক্ত। নগেন্দ্রের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে সূর্যমুখী অকপটে বলেছিল, 'আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এইজন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিলাম, অন্যা তোমার হৃদয়ভাগিনী—আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। মুখের মরা নহে—যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমন মরা নহে; আমি যথার্থ আন্তরিক অকপটে

মরিতে চাহিয়াছিলাম।' সকলেরই জানা আছে সূর্যমুখী আন্তরিকভাবে মরতে চাইলেও সে মরতে পারে নি। নগেন্দ্র ও কুন্দর বিবাহের পরও সে মরে নি, হয়ত মৃত্যুকে সে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারে নি—সব ছেড়ে গৃহত্যাগ করে চলে যায়।

সূর্যমুখীর পর নগেন্দ্রও মৃত্যু কামনা করে। সূর্যমুখীকে হারিয়ে নগেন্দ্রনাথ মৃত্যু প্রার্থনা করে। সে মনে মনে ভাবে, 'দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়। সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন?' তখন জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করে নগেন্দ্রনাথ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু মৃত্যু তার কাছে আসে না।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে হীরারই প্রথমে বিষ খেয়ে মরার পরিকল্পনা ছিল। পরে তার মতি পরিবর্তন হয়। সে স্থির করে 'আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব? যে আমাকে মারিল, আমি তাহাকে না মারিয়া আপনি মরিব কেন? এ বিষ আমি খাইব না। যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নহিলে তাহার প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের এক জনকে মারিয়া, পরে মরিতে হয় মরিব।'

শেষ পর্যন্ত হীরার আনা বিষ খেয়ে কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যা করে।

দত্তবাড়িতে সূর্যমুখী ফিরে আসার পর নতুন করে নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর জীবনকাহিনী কিভাবে রচিত হত? বস্তুতপক্ষে সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তনের পরেই এই উপন্যাসের সমস্যাটি তীব্র এবং অতিশয় প্রকট হয়ে ওঠে। আর সেই মুহূর্তেই বঙ্কিম কুন্দকে বিষ খাইয়ে কাহিনী থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। এইভাবে লেখক জটিল সমস্যার সরল মীমাংসা করে নেন অতি সহজে।

কাহিনীর শেষে কুন্দনন্দিনীকে সরিয়ে বঙ্কিম সম্ভবতঃ নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন; কিন্তু কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুতে এই উপন্যাস কি সত্যিই মিলনান্তক হতে পেরেছে? বঙ্কিমের সম্ভবতঃ সে দিকে আগ্রহ ছিল—কিন্তু পরিণামে তা হয়ে ওঠে নি।

রবীন্দ্রনাথের বিষবৃক্ষ পড়ে মনে হয়েছিল এ উপন্যাস রীতিমত একখানি ট্র্যাজেডি।

রজনীতে রজনী গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভেবেছিল—'এ জীবন রাখিয়া কি হইবে? মরিব!' রজনীর উক্তি, 'চিবুক ডুবিল! অধর ডুবিল! আর একটু মাত্র। নাসিকা ডুবিল! চক্ষু ডুবিল! আমি ডুবিলাম। ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না।' রজনী জলে ডুবে ভেসে উঠল। গঙ্গার উপর দিয়ে একখানি গহনার নৌকা চলেছিল। নৌকার লোকে জল থেকে তুলে রজনীকে উদ্ধার করে।

কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার জলে ডুবে মরেছে, কুন্দনন্দিনী একবার জলে ডুবে মরতে চেয়েছিল, নগেন্দ্রকে বঙ্কিম জলে ডুবে মরতে বলেছিলেন, মরবার জন্য জলে নেমেছিল রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী জলে ডুবে প্রাণ দিতে চেয়েছিল; গোবিন্দলাল একদা জলে ডুবে মৃত্যু বরণ করেছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসে আরও দুটি চরিত্র জলে ডুবে মরতে চেয়েছিল। তারা বয়সে খুবই ছোট—বালক বালিকামাত্র। বালিকাটির বয়স সাত কিংবা আট। বালকের নাম প্রতাপ বালিকা শৈবলিনী। উপন্যাসের উপক্রমণিকাতেই তাদের মৃত্যুর ইচ্ছা জেগেছিল। গঙ্গায় সাঁতার দিতে দিতে দুজনে তারা অনেক দূরে চলে যায়। অনেক দূরে গিয়ে প্রতাপ শৈবলিনীকে বলে—শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে। শৈবলিনী বলে, আর কেন—এইখানেই। প্রতাপ ডুবল। শৈবলিনী ডুবল না। সে-সময় শৈবলিনীর ভয় হল। মনে মনে ভাবল—কেন মরব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরতে পারব না। শৈবলিনী ডুবল না—ফিরে এল। উপক্রমণিকা অংশের এই পরিচ্ছেদের নাম—ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসের গোড়াতেই তারাচরণের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু চন্দ্রশেখর উপন্যাসের উপক্রমণিকাতেই প্রতাপের মৃত্যু হলে বঙ্কিমের চলবে কেমন করে? তারাচরণকে বাঁচান যায় নি, কিন্তু প্রতাপকে বাঁচান সম্ভব হল। গল্পের নামচরিত্র চন্দ্রশেখর জলে ঝাঁপ দিয়ে গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত প্রতাপকে উদ্ধার করে আনল। রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীর জলে ডুবে মরেছিল। সেখানে গোবিন্দলাল তাকে জল থেকে তুলে বাঁচায়। জলমগ্ন সুন্দরী মহিলাকে কি প্রকারে বাঁচাতে হয় গোবিন্দলালের তা ভালভাবেই জানা ছিল। যে গোবিন্দলাল একদিন রোহিণীকে মৃত্যুর হাত থেকে তুলে এনেছিল সেই গোবিন্দলালই আর একদিন রোহিণীর ললাট লক্ষ্য করে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়েছিল। অব্যর্থ সেই লক্ষ্য—একটি আঘাতেই রোহিণীর মৃত্যু হয়।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের গোড়ায় প্রতাপ জলে ডুব দিয়ে আন্তরিকভাবে মরতে চেয়েছিল—সেবার তার মরা হয় নি। কিন্তু প্রতাপ বোধহয় বাঁচবার নয়। গল্পের প্রয়োজনে তাকে বাঁচতে হয়েছিল কিন্তু গল্পকারের প্রয়োজনে তাকে শেষ পর্যন্ত মরতেই হয়। শৈবলিনী তার স্বামী চন্দ্রশেখরের ঘর ছেড়ে প্রতাপের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়েছিল। এই কারণে শৈবলিনীকে জীবনে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। কঠিন প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম শৈবলিনীকে পরিশুদ্ধ করতে চাইলেন, ফিরিয়ে আনতে চাইলেন পুনরায় তাকে চন্দ্রশেখরের জীবনসঙ্গিনী রূপে।

ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ চন্দ্রশেখর উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডটির নাম প্রায়শ্চিত্ত। অর্থাৎ কাহিনীর ছয়ভাগের এক ভাগ হল শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত। এত বড় প্রায়শ্চিত্তের কিন্তু কোনো ফল পাওয়া গেল না উপন্যাসের শেষে। চতুর্থ খণ্ডের প্রায়শ্চিত্তের পর ষষ্ঠ খণ্ডে এসে শৈবলিনী আবার যেই-কে-সেই। প্রতাপ বলে, 'আশীর্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।' উত্তরে শৈবলিনী বলে, 'আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—।' প্রতাপ, 'সে কি শৈবলিনী?' শৈবলিনী, 'যত দিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।' এ কথা শোনবার পর প্রতাপ সেখানে আর এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করে বিদ্যুৎ বেগে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে গেল। দ্রুত চলে যেতে দেখে চন্দ্রশেখর প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করে, 'কোথা যাও?' প্রতাপ চন্দ্রশেখরের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুধু বলে গেল, 'আমার প্রয়োজন আছে।' পরে রমানন্দস্বামী সমরক্ষেত্রে গিয়ে দেখেন প্রতাপ আহত, মৃতপ্রায়, এখনও জীবিত। রমানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, 'আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম, কেন এ দুর্জয় রণে আসিলে? শৈবলিনীর কথায় কি এরূপ করিয়াছ?' মুমূর্ষু প্রতাপ রমানন্দকে কয়েকটা কথা বলবার চেষ্টা করে। প্রতাপ বলে, 'শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে, প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিত্ত, কখন না কখন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।' রমানন্দ স্বামী নীরব হলেন। ধীরে ধীরে প্রতাপের প্রাণবায়ু নির্গত হল।

উপন্যাসের গোড়ায় বঙ্কিম প্রতাপকে জল থেকে বাঁচিয়ে এনেছিলেন কেন? কারণ ঔপন্যাসিক দেখতে চেয়েছিলেন চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জীবনে প্রতাপ কি সমস্যার সৃষ্টি করে এবং সেই সমস্যার হাত থেকে উদ্ধারের পথটাই বা কি? প্রতাপকে যদি সেদিন জল থেকে তুলে আনা না যেত তাহলে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় ব্যক্তিকে ঘিরে কোনো সমস্যারই উদয় হত না। মনের মধ্যে বারে বারেই একটি প্রশ্ন জাগে—বঙ্কিম যদি প্রতাপকে একবার বাঁচালেনই, তবে কাহিনীর শেষে আবার তাকে মেরেই বা ফেললেন কেন? যাকে

নিয়ে সমস্যা তাকে মেরে ফেলে কাহিনী হয়ত সহজে সমাপ্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে কি সমস্যার যথাযথ সমাধান হয়!

কপালকুণ্ডলার মূল কাহিনী কপালকুণ্ডলা নবকুমার ও মতিবিবিকে ঘিরে। এখানে কাহিনীর শেষে একসঙ্গে দুজনের মৃত্যু। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের মূল সমস্যা সূর্যমুখী নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে। এখানে কাহিনীর শেষে মৃত্যু ঘটেছে কুন্দের। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের মূল কাহিনী রচিত হয়েছে চন্দ্রশেখর শৈবলিনী ও প্রতাপকে ঘিরে। এখানে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে প্রতাপ। কৃষ্ণকান্তের উইলের মূল উপাখ্যান ভ্রমর রোহিণী ও গোবিন্দলালকে কেন্দ্র করে। এই উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটেছে দুটি চরিত্রের—রোহিণী ও ভ্রমরের। উপন্যাস যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন অবশ্য তিনজনেরই মৃত্যু ঘটেছিল—রোহিণী ভ্রমর এবং গোবিন্দলালেরও। বঙ্গদর্শনে বা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের একেবারে শেষাংশে গোবিন্দলাল সম্পর্কে ছিল, 'গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া, স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরের মূর্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন। পরদিন প্রভাতে যেখানে সাত বৎসর পূর্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।' এখানে দেখা যাচ্ছে গোবিন্দলালের মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা। এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয় গোবিন্দলালের পূর্বে আত্মহত্যায় মারা গেছে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমার, চন্দ্রশেখরে দলনী এবং প্রতাপ আর বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী।

বঙ্কিম একবার শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন, 'শ্রীশ, আমার না জন্মালেই ভাল হত। আমার দ্বারা সমাজের ঘোর অনিষ্ট হবে। কুন্দনন্দিনীকে দিয়ে বিষ খাইয়ে আমি অন্য মেয়েদের বিষ খাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছি, সেই অনুতাপে আমি দগ্ধ হচ্ছি। সেই দৃষ্টান্ত প্রথমেই অনুসরণ করে আমার মেয়ে।' আরও একজনকে বঙ্কিম এই একই কথা বলেছেন। বলেছেন, 'আমিই কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাইয়ে মেরেছি, আর আমার অদৃষ্টেই আমার মেয়ে বিষ খেয়ে মরেছে।'

বঙ্কিমের ছোট মেয়ে উৎপলকুমারী তার শ্বশুরবাড়িতে আত্মহত্যা করেছিল ১৮৮৭ সালের ৮ নবেম্বর।

৮

রূপশিল্পী

উপন্যাসে নারীচরিত্রের রূপবর্ণনায় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশিষ্ট প্রবণতাগুলি লক্ষিত হয়েছে তা প্রধানতঃ এই—

ক. রূপের মধ্যে চারিত্রিক বৈচিত্র্যের সন্ধান

খ. রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে সঠিক বয়স উল্লেখের প্রতি আগ্রহ

গ. যুবতী অপেক্ষা বালিকার রূপের প্রতি পক্ষপাত

ঘ. নির্দোষ সুন্দরী অঙ্কনে অনিচ্ছা

ঙ. নারীর চক্ষু ও কটাক্ষের প্রতি কৌতূহল

চ. রূপবর্ণনাকালে ঔপন্যাসিকের মধ্যে কবিসত্তার আবির্ভাব

ছ. রূপবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিচিত্র কল্পিত কাহিনীর সংযোজন

জ. উপমা নির্বাচনের সমারোহ

ঝ. ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়া রূপের সজীবতা আনয়ন

ঞ. বিভিন্ন সংস্করণে রূপবর্ণনা অংশের পাঠপরিবর্তন

বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ববিচার নয়, রূপনির্মাণ প্রসঙ্গে তাঁর যে বিশিষ্ট শিল্পীসত্তার প্রকাশ ঘটেছে তারই পরিচয় গ্রহণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর সপ্তম পরিচ্ছেদে তিলোত্তমার রূপ বর্ণিত হয়েছে। লেখকের বর্ণনা, 'তিলোত্তমা সুন্দরী।...তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং দেহায়তন প্রগল্‌ভবয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতি প্রশস্তও নহে, নিশীথ-কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাব প্রকাশক; তৎপার্শ্বে অতি নিবিড়বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশসকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি

সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে ; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড় বর্ণ, চিত্রকর-লিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার ; আর এক সূতা স্থূল হইলে নির্দোষ হইত।' যুবতী অপেক্ষা বালিকার রূপ বঙ্কিমের অধিক প্রিয় ছিল। এ কথা পরেও আমরা লক্ষ্য করব। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের যে ভাবে রূপবর্ণনা করেছেন তার মধ্য দিয়ে তিনি কৌশলে সেই সব নারীর চারিত্রিক বিশিষ্টতাই যেন ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। চোখের চাহনি, ভ্রূযুগের বঙ্কিমতা, অধরের হাসি দেখে তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে বুঝতে চেয়েছেন। চরিত্র ও রূপের মধ্যে এমন আশ্চর্য মিল ঘটান শক্তিশালী লেখকের পক্ষেই সম্ভব।

বঙ্কিম তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলিকে সর্বদা নির্দোষ সুন্দরী করেন নি। তিলোত্তমার ভ্রূযুগ সম্বন্ধে বলেছেন, 'আর এক সূতা স্থূল হইলে নির্দোষ হইত।' এর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের আশ্চর্য বাস্তব রূপবোধের পরিচয় পাওয়া যায় ; এবং রূপবর্ণনায় এখানেই তাঁর মৌলিকতা।

রূপবর্ণনায় বঙ্কিম প্রায়ই উপমা প্রয়োগ করতেন। কোনো উপমা প্রাচীন সাহিত্য থেকে গৃহীত, আবার কোনো উপমা তাঁর অপূর্ব কবিদৃষ্টির পরিচয়বাহী। রূপবর্ণনার মধ্যে বঙ্কিমের প্রকৃতি-চেতনারও একটা বড় পরিচয় পাওয়া যায়।

বিমলা পঞ্চত্রিংশৎবর্ষীয়া। কিন্তু কোনোও ষোড়শী বিমলা অপেক্ষা কোমলা নয়। 'বিমলার আজও রূপে শরীর ঢলঢল করিতেছে, রসে মন টলটল করিতেছে।' রূপবর্ণনা কালে বঙ্কিম বহুক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করে গিয়েছেন। বঙ্কিম বুঝতেন রূপেরও একটা ছন্দ আছে, একটা ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি আছে ; ধ্বন্যাত্মক শব্দ সেই ধ্বনিকেই প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

দুর্গেশনন্দিনীর দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আশমানির রূপ বর্ণিত হয়েছে। এখানে লেখক প্রচলিত প্রণালীর রূপবর্ণনার ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ করেছেন। বঙ্কিম বলেছেন, 'স্ত্রীলোকের রূপবর্ণনা বিষয়ে গ্রন্থকারগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন, আমার সদৃশ অকিঞ্চন জনের তৎপদ্ধতিবহির্ভূত হওয়া অতি ধৃষ্টতার বিষয়।' তাই লেখক রূপবর্ণনার আদিতে প্রচলিত প্রণালী অনুযায়ী মঙ্গলাচরণ করেছেন। এই মঙ্গলাচরণের ভাষা ও ভঙ্গি পরবর্তিকালে রচিত কমলাকান্ত গ্রন্থের ভাষা ও রচনারীতির বিশিষ্টতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মঙ্গলাচরণের লঘু পরিহাসভঙ্গির মধ্য থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত সুলভ রূপবর্ণনার বিরুদ্ধে বঙ্কিমের প্রযুক্ত মন্তব্যগুলি লক্ষণীয়। শ্রীহর্ষ, ভারতচন্দ্র প্রমুখের রচনায় রূপবর্ণনার যে আতিশয্য দেখা যায়, যে অসংযম লক্ষিত হয় ; কালিদাস, বাল্মীকি, ভবভূতি বা ভারবির সাহিত্যে সে

অসংযম অপরিপক্কতা ও আতিশয্য নেই। মঙ্গলাচরণের মধ্যে বটতলার উল্লেখও অর্থময়। বঙ্কিম আশমানির রূপবর্ণনায় ইচ্ছাপূর্বক ক্লাসিকাল রীতির অনুসরণ করেন নি। যে নারী দিগ্‌গজ গজপতির মনোমোহিনী তার রূপবর্ণনায় লঘুভঙ্গির ব্যবহার রসের দিক থেকে স্বাভাবিক হয়েছে।

সাপের মাথায় ফণা কেন? স্ত্রীলোকের ঘোমটা সৃষ্টির আদিকথা কি? নয়ন-খঞ্জনকে কোন্ পিঞ্জরে বদ্ধ রাখব? দাড়িম্ব বঙ্গদেশ ছেড়ে পাটনা অঞ্চলে পালাল কেন?—ইত্যাদি বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর আছে আশমানির রূপবর্ণনা অংশে। রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম কতকগুলি চমৎকার কল্পিত কাহিনী রচনা করেছেন।

প্রথম সংস্করণে আশমানির রূপবর্ণনা অংশে ছিল, 'নিতম্ব ধরার অপেক্ষা বৃহৎ, তাহাতে বিস্তর গাছপালা, গো মনুষ্যাদি থাকিতে পারে, কিন্তু নিকটে উরুস্বরূপ দুইটা কদলী গাছ; কদলী গাছের আওতায় অন্য গাছ গজায় না, আর পাছে কলা-গাছ খাইয়া ফেলে বলিয়া বিধাতা তথায় গো মনুষ্যের সৃষ্টি করেন নাই।' পরবর্তি-কালে এই অংশ বর্জন করে বঙ্কিম তাঁর স্বাভাবিক সংযমবোধেরই পরিচয় দিয়েছেন।

লঘুভঙ্গিতে রূপবর্ণনা করবার পর বঙ্কিম বলছেন, 'এই বর্ণনায় যদি কোন অরসিক পাঠক আশমাণির স্বরূপ নিরূপণ করিতে না পারিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে সোজা কথায় বলিয়া দিতে পারি। বিমলার অপেক্ষা আশমানির বয়স প্রায় সাত বৎসর ন্যূন; মুখ, চোখ, নাক, কান সামান্য মত; বর্ণ শ্যামোজ্জ্বল; মুখখানি একটু হাসি হাসি, চক্ষুও সেইভাব; দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে, শ্রী আছে। আকার খর্ব; গঠন স্থূল; বেশবিন্যাসের বড়ই পারি-পাট্য।' প্রথম সংস্করণের এই অংশ পরবর্তী সংস্করণে বাহুল্যবোধে বর্জিত হয়েছে। বোধ করি বঙ্কিম ক্রমে লক্ষ্য করেছেন যে তাঁর পাঠকমণ্ডলী অরসিক নয়।

দুর্গেশনন্দিনীর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আয়েষার রূপের বর্ণনা পাই। প্রায় আড়াই শত শব্দের একটি মাত্র চরণে আয়েষার রূপ বর্ণিত হয়েছে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক ও কবিপ্রতিভার আশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছে। বর্ণনা অংশটি দীর্ঘ বলে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে হল। তাছাড়া ওই বিখ্যাত অংশটি বঙ্কিম-অনুরাগী সকল পাঠকের স্মরণে আছে—এটা সহজেই অনুমান করা যায়।

দুর্গেশনন্দিনীর বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আয়েষার রূপবর্ণনাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাধিক দরদ লক্ষ্য করা যায়। প্রমথনাথ বিশী 'বঙ্কিম-সরণী' গ্রন্থে বঙ্কিমের এই দৃষ্টিকে রূপমুগ্ধ কবির ও প্রণয়ীর দৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। হরপ্রসাদ মিত্র তাঁর 'বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠ' গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন, 'নারীর রূপবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের

একরকম অতি প্রগল্‌ভতা দেখা যায়। তিলোত্তমা, আয়েষা, বিমলার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অতি প্রগল্‌ভতা ঠিক নিন্দার্থে নয়, তাঁর কবিদৃষ্টির বিশেষ প্রকৃতিটি সূচিত করবার জন্যেই এ শব্দের প্রয়োগ করা হল।' সত্যি কথাই, বিভিন্ন রূপ-বর্ণনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই উপন্যাসে তিলোত্তমা, বিমলা ও আয়েষার রূপসৌন্দর্য লেখক পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন। তিলোত্তমা, বিমলা ও আয়েষার রূপ যথাক্রমে বাসন্তীমল্লিকা, স্থলপদ্ম ও জলপদ্ম—এই তিন ফুলের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। তিনজনের 'রূপের আলো'ও ভিন্ন। বঙ্কিম বলেছেন, 'কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য বাসন্তীমল্লিকার ন্যায় নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্ণের স্থলপদ্মের ন্যায়, নির্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য নব-রবিকরফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়; সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত; না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক, কোমল, অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না।' উপমা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তিনজনের রূপের পার্থক্য চমৎকার বর্ণিত হয়েছে। এই উপমা প্রয়োগের মধ্যে যে বিশিষ্টতা দেখা গেল তা লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

বিশাল কেশরাশির আড়ালে কপালকুণ্ডলার দেহরত্ন সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নি। বঙ্কিম এই বিস্তৃত কেশরাশির বর্ণনা করেছেন, তার বিশাললোচনের কটাক্ষটি দেখেছেন, আর কেশভারের মধ্য থেকে বাহুযুগলের যতটুকু দেখা যাচ্ছিল উল্লেখ করেছেন। সমুদ্রতীরবর্তী পরিবেশের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার রূপের আশ্চর্য সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে। কপালকুণ্ডলা যে সমাজজীবন থেকে দূরে বন্য প্রকৃতির মধ্যে বর্ধিতা, সে কথা তার রূপবর্ণনার মধ্যেই চমৎকার ফুটেছে। কপালকুণ্ডলার কটাক্ষটি কিরূপ? বঙ্কিমের বর্ণনায়, 'বিশাললোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগর হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ-লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।' বঙ্কিম তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলির মধ্যে তাদের চাহনির কটাক্ষটি সর্বাগ্রে লক্ষ্য করেছেন। লেখক মনে করতেন এই কটাক্ষ নারীর চরিত্র বুঝবার পক্ষে একটি বড় রকমের সামগ্রী। লক্ষ্য করলে দেখব কপালকুণ্ডলা ও তিলোত্তমা—দুইজনের কটাক্ষ অনেকটা একরূপ। দুইজনেরই কটাক্ষ স্থির, প্রশান্ত এবং স্নিগ্ধ।

তিলোত্তমাকে বঙ্কিম নির্দোষ সুন্দরী করে আঁকেন নি—এ কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কপালকুণ্ডলায় মতিবিবিও নির্দোষ সুন্দরী নয়। বঙ্কিমের মতে রমণী যদি নির্দোষ সৌন্দর্যবিশিষ্টা হয় তবে তার রূপের বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু মতিবিবি সর্বাঙ্গসুন্দরী নয় বলেই বঙ্কিমকে তার রূপের ব্যাখ্যা বিস্তৃতভাবে করতে হয়েছে। দীর্ঘ রূপবর্ণনার মধ্যে একস্থানে লেখক বলছেন, 'ইনি শ্যামবর্ণা। শ্যামা মা বা শ্যামসুন্দর যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে। তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম।' মতিবিবির চোখ দুটিও বঙ্কিম নিপুণভাবে লক্ষ্য করেছেন। বর্ণনা এইরূপ: 'চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে, কিন্তু সুবঙ্কিম পল্লব-রেখাবিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির অথচ মর্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহময় রসে গলিয়া যায়। আবার কখনও বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তি প্রকাশমাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখনও বা লালসাবিস্ফারিত, মদনরসে টলমলায়মান। আবার কখনও বা লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘ মধ্যে বিদ্যুৎদ্দাম।' মতিবিবির সম্পূর্ণ রূপবর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করলাম না। কিন্তু এই বিস্তৃত রূপবর্ণনার অংশটি লক্ষ্য করলে দেখব বঙ্কিমের পূর্বোল্লিখিত বিশিষ্টতাগুলি এখানেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এখানেও দেখি রূপবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রকে মাঝে মাঝে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা আছে, চোখের চাহনিগুলি নানাভাবে দেখা হয়েছে, প্রয়োজনমত ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার আছে এবং সংগৃহীত বা মৌলিক বহু উপমা প্রযুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন উপমার মধ্যে বঙ্কিমের প্রকৃতি চেতনারও একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

আরও একটি কথা। এই শ্যামাঙ্গীর রূপবর্ণনার মধ্যে দুটি শব্দের ব্যবহার আছে—শ্যামসুন্দর ও ভ্রমর। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে মৃন্ময়ীর ননন্দার নাম শ্যামা-সুন্দরী, আর কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলালের স্ত্রীর নাম ভ্রমর—দুইজনেই কিন্তু শ্যামবর্ণা। শ্যামবর্ণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের উপমা নানা স্থানে এনেছেন।

উপন্যাস যখন দ্রুতবেগে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, সেই সময়ও বঙ্কিম কিছুক্ষণ থেমে নারীর রূপবর্ণনার কাজটি সেরে নিয়েছেন। এ কাজে তাঁর কোনো অবহেলা বা ঔদাসীন্য ছিল না। কপালকুণ্ডলার শ্যামাসুন্দরী একটি অপ্রধান চরিত্র। তারও বিস্তৃত রূপবর্ণনা করে বঙ্কিম তাঁর বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক প্রবণতারই পরিচয় দিয়েছেন। রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বয়সের উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি স্থায়ী স্বভাব।

শ্যামাসুন্দরী 'কৃষ্ণাঙ্গী ; তিনি সুমুখী ষোড়শী, তাঁহার ক্ষুদ্র দেহ, মুখখানি ক্ষুদ্র, তাহার উপরার্দ্ধে চারিদিক দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কুন্তলদাম বেড়িয়া পড়িয়াছে ; যেন নীলোৎপলদলরাজি উৎপলমধ্যকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। নয়নযুগল বিস্ফারিত, কোমল-শ্বেতবর্ণ, সফরীসদৃশ ; অঙ্গুলিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সঙ্গিনীর কেশতরঙ্গমধ্যে ন্যস্ত হইয়াছে।'

আর একজন ষোড়শীকে পাচ্ছি মৃণালিনী উপন্যাসে। সে হল গায়িকা গিরিজায়া। বঙ্কিম বলেছেন, 'গায়িকার বয়স ষোল বৎসর। ষোড়শী, খর্বাকৃতা এবং কৃষ্ণাঙ্গী।' বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে, 'বয়স ষোল বৎসর' এবং 'ষোড়শী' শব্দ দুটি এক অর্থবাহক নয়। তা হলে তিনি দুটি শব্দ পরপর ব্যবহার করতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ষোড়শী শব্দটি অনেক ব্যঞ্জনাধর্মী। ষোড়শী অর্থ ষোল বৎসর বয়স্কা নয়, পূর্ণ যুবতী। লেখক গিরিজায়া প্রসঙ্গে বলছেন, 'সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা। তাই বলিয়া তাহার গায়ে ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালি মাখিলে জল মাখিয়াছে বোধ হইত, কিংবা জল মাখিলে কালি বোধ হইত, এমন নহে। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে কালো বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ণ যেমনই হউক না কেন, ভিখারিণী কুরূপা নহে। তাহার অঙ্গ পরিষ্কার, সুমার্জিত, চাকচিক্যবিশিষ্ট ; মুখখানি প্রফুল্ল, চক্ষু দুটি বড়, চঞ্চল, হাস্যময়, লোচনতারা নিবিড়কৃষ্ণ, একটি তারার পার্শ্বে একটি তিল। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, রক্তপ্রভ, তদন্তরে অতি পরিষ্কার অমলশ্বেত, কুন্দকলিকাসন্নিভ দুই শ্রেণী দন্ত। কেশগুলি সূক্ষ্ম, গ্রীবার উপরে মোহিনী কবরী, তাহাতে যূথিকার মালা বেষ্টিত। যৌবনসঞ্চারে শরীরের গঠন সুন্দর হইয়াছিল, যেন কৃষ্ণপ্রস্তরে কোন শিল্পকার পুত্তল খোদিত করিয়াছিল।' 'একটি তারার পার্শ্বে একটি তিল'—বাংলা সাহিত্যে আর কোন্ ঔপন্যাসিক এমনটি লক্ষ্য করেছেন ?

এইবার মনোরমার রূপের বর্ণনা। মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ, ষোড়শ কি তদধিক, কি তন্ন্যূন—তা সিদ্ধান্তের ভার বঙ্কিম পাঠকের হাতেই তুলে দিয়েছেন। বঙ্কিম বলেছেন, 'মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাঁহার রূপরাশি অতুল-চক্ষুতে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, সর্বকালে সে রূপরাশি দুর্লভ।' প্রথম সংস্করণের উপন্যাসে মনোরমার রূপের অধিকতর বিস্তৃত বর্ণনা ছিল। পরবর্তী সংস্করণে সেই অংশটি বর্জন করে বঙ্কিম তাঁর পরিণত ও সংযত শিল্প মনেরই পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী ষোড়শী নয়, তার বয়স তের বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্র

কুন্দের রূপ নিজে বর্ণনা করেন নি। হরদেব ঘোষালকে লিখিত পত্রে নগেন্দ্রনাথ কুন্দের রূপের কথা বলেছেন। তিলোত্তমা ও মতিবিবি যে নির্দোষ সুন্দরী নয় তা আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি। কুন্দনন্দিনীও নির্দোষ সুন্দরী নয়। নগেন্দ্র পত্রে লিখছে, 'কুন্দ যে নির্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত-মাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।' শুধু রূপ নয়, কুন্দনন্দিনীতে এমন একটা কিছু আছে, যা নগেন্দ্রনাথকে অধিকতর আকৃষ্ট করেছিল।

সূর্যমুখীর বয়স প্রায় ষড়বিংশতি। কপালকুণ্ডলায় মতিবিবির বর্ণ ছিল তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়। সূর্যমুখীও 'পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা।...সূর্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শী ভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিমপল্লবরেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণতারাসনাথ, মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎ স্ফীত, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট।...সূর্যমুখীর আকার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিত লতার ন্যায় সৌন্দর্যভরে দুলিতেছে।' আর হীরা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হয়েছে সে 'পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী।'

ইন্দিরা উপন্যাসে ইন্দিরা বড় সুন্দরী। তবে গ্রন্থমধ্যে তার রূপ পৃথকভাবে বর্ণিত হয় নি, কারণ সে সুযোগ ছিল না। উপন্যাসটি তারই উত্তমপুরুষে কথিত। সুভাষিনী ও রমণবাবুর বাড়িতে উপেন্দ্র ইন্দিরার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল—তা আমরা জানি। উপেন্দ্রের দু-একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি: 'কালাদীঘিতে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না।' 'মল্লিকা ফুলের চেয়ে মানুষ সুন্দর এই প্রথম দেখিলাম।' পাঠকের মনে থাকতে পারে, দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বাসন্তীমল্লিকা ফুলের উপমা প্রয়োগ করা হয়েছিল। রাধারাণীতেও কামাখ্যাবাবুর বর্ণ 'স্ফুটিত মল্লিকারাশির মত গৌর।'

ইন্দিরা প্রথম পরিচ্ছেদেই বলেছে, 'আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম।' সুভাষিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে সে বলছে, 'মানুষটি আমারই বয়সী হইবে।...এমন মুখ দেখি নাই। যেন পদ্মটি ফুটিয়া আছে—চারিদিক হইতে সাপের মত কোঁকড়া চুলগুলা ফণা তুলিয়া পদ্মটা ঘেরিয়াছে।' রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বয়সের উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। কেবল নারী প্রসঙ্গে নয়, অধিকাংশ পুরুষ চরিত্রেরও তিনি বয়স উল্লেখ করেছেন।

চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীর মুখমণ্ডলের একটু বিস্তৃত বিবরণ পাই। শৈবলিনী

শয্যোপরি নিদ্রিতা। চন্দ্রশেখর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করল। শৈবলিনীর রূপবর্ণনায় আমরা আবার কবি ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রকে একই সঙ্গে পাই। শৈবলিনীর হাসির সঙ্গে 'জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ' উপমা প্রয়োগ করে উপমা-নির্বাচনে লেখক আশ্চর্য চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন।

প্রকৃতির রূপের সঙ্গে দলনীর রূপ মিলে মিশে গিয়েছে। দলনী 'সুন্দরী—নবীনা—সবেমাত্র যৌবনবর্ষায় রূপের নদী পুরিয়া উঠিতেছে—ভরা বসন্তে অঙ্গ-মুকুল সব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্ত বর্ষায় একত্রে মিশিয়াছে।'

রজনী উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে অমরনাথ লবঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে, 'বস্তুতঃ অতীতশৈশব অথচ অপ্রাপ্তযৌবনার সৌন্দর্য এবং অস্ফুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য, ইহাই মনোহর—যৌবনের সৌন্দর্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসনভূষণের ঘটা, হাসি চাহনীর ঘটা,—বেনীর দোলানি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ একপ্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য দেখি, তাহাও বিকৃত। যে সৌন্দর্যের উপভোগ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্ত-ভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই সৌন্দর্যই সৌন্দর্য।—এ উক্তি বস্তুতঃ অমরনাথের নয়; যে বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরের লেখক, এ সেই বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের রচনা।

তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রজনীর রূপ বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিম তাঁর সৃষ্ট কোনো নারীকেই সর্বাঙ্গসুন্দরী করে আঁকতে চান নি। রজনীকে তিনি বলেছেন সর্বাঙ্গসুন্দরী। বস্তুতঃ সেও সর্বাঙ্গসুন্দরী নয়। তার সৌন্দর্য বা রূপের বড় উপকরণটাই নেই, তার চক্ষুর কটাক্ষই নেই—তার চক্ষু বাক্‌রুদ্ধ।

যে 'প্রগল্‌ভতা'র কথা হরপ্রসাদ মিত্র উল্লেখ করেছেন, লক্ষ্য করলে দেখব কৃষ্ণকান্তের উইলে তা আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত। রোহিণীর রূপের বর্ণনা বঙ্কিম এক ছত্রে সেরেছেন, 'রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপে উথলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ।' আর ভ্রমর সম্বন্ধে বলেছেন, 'ভোমরা কালো'; এর অধিক আর কিছু নয়।

রাজসিংহ উপন্যাসেও এই প্রগল্‌ভতার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। চঞ্চলকুমারীর রূপের কোনো বিস্তৃত বিবরণ নেই। তাকে কেবল 'দেবী প্রতিমা' বলে উল্লেখ করেই বঙ্কিম কাজ সেরেছেন। আর দরিয়া বিবি সম্বন্ধে কেবল বলা হয়েছে, দরিয়া বিবির বয়স সতের বৎসরের বেশি নহে—তাহাতে আবার কিছু খর্বাকার,

পনের বছরের বেশি দেখাইত না। দরিয়া বিবি বড় সুন্দরী, ফুটন্ত ফুলের মত, সর্বদা প্রফুল্ল।' জেব-উন্নিসার রূপেরও বিস্তারিত বর্ণনা নেই। দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে এইটুকুমাত্র উল্লেখ আছে যে প্রৌঢ়া সুন্দরী জেব-উন্নিসার সৌন্দর্য তার বিলাসগৃহের সকল পুষ্পরাশি, রত্নরাজিকে ম্লান করেছে। আর উদিপুরীর 'অতুল্য রূপে'র কথা উল্লেখ করেই লেখক প্রসঙ্গান্তরে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহের সমালোচনায় এই উপন্যাসের গতির দ্রুততা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন।

শুধু কৃষ্ণকান্তের উইল বা রাজসিংহে নয়, কৃষ্ণকান্তের উইল ও তৎপরবর্তী, অর্থাৎ শেষপর্বের সকল উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেহরূপবর্ণনায় আশ্চর্য সংযম প্রদর্শন করেছেন। উপমার ঘনঘটা নেই, ধ্বন্যাত্মক ও তৎসম শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগ অনুপস্থিত, উচ্ছ্বাসের আতিশয্য বিসর্জিত, সমারোহের চিহ্ন মাত্র নেই। কৃষ্ণকান্তের উইলের পর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক রীতির একটা বড় রকম মোড় ঘুরেছে বলা যায়। এবং তা বঙ্কিম-প্রতিভার পরিণতিরই ইঙ্গিতবাহী।

৯

বঙ্কিমদর্পণ কমলাকান্ত

কমলাকান্তের দপ্তর সমগ্র বঙ্কিমসাহিত্যের দর্পণস্বরূপ। ঢেঁকি (বঙ্গদর্শন ১২৮৯ বৈশাখ) ব্যতীত দপ্তরের সবকটি নিবন্ধের প্রকাশ কাল ১২৮০ ভাদ্র থেকে ১২৮১-র চৈত্রের মধ্যে। চন্দ্রালোকে, স্ত্রীলোকের রূপ ও মশক বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা না হওয়ায় তা আমাদের এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত নয়।

বঙ্গদর্শনে দপ্তরগুলির প্রকাশ কালে চন্দ্রশেখর উপন্যাস সম্পূর্ণ (১২৮০ শ্রাবণ—১২৮১ ভাদ্র) এবং রজনীর সাতটি সংখ্যা (১২৮১ আশ্বিন—চৈত্র, সম্পূর্ণ উপন্যাসটি শেষ হয় ১২৮২-র অগ্রহায়ণে) মুদ্রিত হয়। সাধারণভাবে চন্দ্রশেখর ও রজনী এই উভয় উপন্যাসকেই কমলাকান্তের দপ্তর রচনার সমকালীন বলা যায়। তাহলে দপ্তরের পূর্ববর্তী রচনা হিসেবে পাচ্ছি দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা ও যুগলাঙ্গুরীয়; এবং দপ্তরের পরবর্তী উপন্যাসগুলি হল রাধারাণী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম। উভয় পর্বেই ছয়টি করে উপন্যাস এবং মধ্যে দুটি। আমাদের বক্তব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস-গুলির বাণী যেমন তাঁর দপ্তরের রচনাগুলিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তদ্রূপ পরবর্তী পর্যায়ের সাহিত্যেও দপ্তরের মূল সুরেরই যেন অনুরণন শুনতে পাই। কমলাকান্তের দপ্তরকে বঙ্কিম-গ্রন্থমালিকার মধ্যমণি বা বঙ্কিমসাহিত্যের মুখ্য প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করতে হয়।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী থেকে জানতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রও নাকি কমলা-কান্তের দপ্তরকেই তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে মত প্রকাশ করেছিলেন।

'প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।'—মনে হয় এইটি সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রধানতম বাণী। একদিকে দুর্গেশনন্দিনী থেকে সীতারাম, অপরদিকে প্রবন্ধগ্রন্থাবলীতেও বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাণী নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে দেখতে পাই।

আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে দপ্তর অংশ থেকে প্রণয় সম্পর্কিত বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যগুলি একত্রে সংকলন করে নিই।

ক. কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

—একা।

খ. প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসংগীত। অনন্তকাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

—একা।

গ. পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।

—আমার মন।

ঘ. কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে? যত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, দার্শনিক, সংসারতত্ত্ববিৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না? নাই। আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, একদিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই! এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে!

—আমার মন।

ঙ. ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধনে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্য-জাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

—আমার মন।

চ. আমি বিলাসপ্রিয়ের মুখে 'এসো এসো বঁধু এসো' বুঝিতে পারি না। কিন্তু

ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্য হৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্যহৃদয়কামনা। মনুষ্য-হৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, 'এসো এসো বঁধু এসো।'

—একটি গীত।

ছ. ধর্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম।

—বিড়াল।

শুধু প্রণয় ভাবনা নয়, সামগ্রিকভাবে আমরা দেখতে চেষ্টা করব বঙ্কিমসাহিত্যে কমলাকান্তের দপ্তরের পূর্বাভাস ও প্রভাবের পরিমাণ কতখানি।

কমলাকান্তের প্রণয়ভাবনার পূর্বাভাস দুর্গেশনন্দিনীতে পাই। দুর্গেশনন্দিনীর একবিংশতিতম পরিচ্ছেদে দেখি রুগ্না তিলোত্তমা ক্রমেই সবলা ও সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু কেমন করে? কি ঔষধে? কোন্ চিকিৎসাপ্রণালীতে? মনুষ্যকে পুনরুৎফুল্ল করতে পারে কে? বঙ্কিমের উক্তি, 'এ সংসারের প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ। ব্যাধি-প্রতিকারের প্রধান ঔষধ প্রণয়। নহিলে হৃদয়-ব্যাধি কে উপশম করিতে পারে?'

দুর্গেশনন্দিনীতে দেখি জগৎসিংহের প্রণয়ই তিলোত্তমার হৃদয়-ব্যাধি-প্রতিকারের একমাত্র ঔষধ।

'বিড়াল' নিবন্ধে বলা হয়েছে—'ধর্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম।' এই বাণীর চরিত্ররূপ পাই কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে। নবকুমারের জীবন এই বাণীর ধারক ও বাহক। তাই বঙ্কিম উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন, 'আত্মোপকারীকে, বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?'

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে এল। নবকুমারের মাতা মহাসমারোহে বধূবরণ করে ঘরে নিলেন। 'নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম এই নবকুমারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল; বিরক্তিজনকের প্রতি বিরাগের লাঘব হইল; মনুষ্যমাত্র প্রেমের

পাত্র হইল ; পৃথিবী সৎকর্মের জন্য মাত্র সৃষ্টা বোধ হইতে লাগিল ; সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রণয় এইরূপ ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।' বঙ্কিমের মতে প্রীতি শিক্ষাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বিবাহের মূল নয়। 'আমার মন' নিবন্ধে কমলাকান্তের উক্তি, 'যদি বিবাহবন্ধনে তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া, তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ।' এই প্রসঙ্গে কমলাকান্তের দপ্তর থেকে সংকলিত ও চিহ্নিত উদ্ধৃতিটি লক্ষণীয়।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে নবকুমারের বর্ণনা ছিল ; তৃতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে পাই লুৎফ-উন্নিসা বা মতিবিবির বর্ণনা। লুৎফ-উন্নিসা নিজের সম্বন্ধে পেষমন্‌কে বলছে, 'সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তি জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম ? কোন্ দুষ্কর্ম না করিয়াছি ? আর যে যে উদ্দেশে এত দূর করিলাম, তাহার কোন্‌টাই বা হস্তগত হয় নাই ? ঐশ্বর্য, সম্পদ্, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, সকলই ত প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল ? আজি এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, এক দিনের তরেও সুখী হই নাই, এক মুহূর্তজন্যও কখনও সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই।' এখন প্রশ্ন, এত বিলাস ও প্রতিষ্ঠার মধ্যেও মতিবিবি সুখী নয় কেন ? কেন নয় তা মতিবিবি জেনেছে। মতিবিবি নিজেই পেষমন্‌কে প্রশ্ন করেছে, 'আমি এই আগ্রায় কখনও কাহাকে ভালবাসিয়াছি ?' পেষমনের চুপি চুপি উত্তর 'কাহাকেও না।' এই একটি মাত্র কারণে ঐশ্বর্যে নিমগ্ন হয়েও মতিবিবি একদিনের তরেও সুখী হতে পারে নি, এক মুহূর্তের জন্যও কখনো সুখ ভোগ করে নি। 'আমার মন' নিবন্ধে কমলাকান্ত বলেছে, 'এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের হইলাম না, এইজন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই।...আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে।' কমলাকান্তে যে কথা তত্ত্বাকারে ব্যক্ত হয়েছে, সে কথা অনেক পূর্বেই বঙ্কিম মতিবিবির চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিবৃত করেছেন। কমলাকান্তে যা তত্ত্ব, কপালকুণ্ডলায় তা উদাহরণ।

'আমার মন' নিবন্ধে আছে, 'কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?' কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উচ্ছলিত হয়েছিল, কিন্তু কপালকুণ্ডলার চিত্তভাব কিরূপ? চতুর্থ খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিকের উক্তি, 'এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না। তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে?' সংসার-জগৎ যে কপালকুণ্ডলাকে শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট করতে পারে নি প্রণয়-বন্ধনের অভাবই তার বড় কারণ।

কমলাকান্তের দপ্তরে 'পতঙ্গ' নামে একটি নিবন্ধ আছে। অগ্নির প্রতি পতঙ্গের আকর্ষণ—এই চিত্রকল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রের অতি প্রিয়। এই চিত্রকল্পটি অবলম্বন করেই তাঁর 'পতঙ্গ' নিবন্ধ রচিত, তবে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও নানা প্রসঙ্গে বঙ্কিম পতঙ্গের এই চিত্রকল্পটি ব্যবহার করেছেন দেখতে পাই—কি কমলাকান্তের দপ্তরের আগে কি পরে।

কপালকুণ্ডলা : চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

'কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।'

মৃণালিনী : চতুর্থ খণ্ড চতুর্দশ পরিচ্ছেদ :

'দেখিলেন, দেবী অষ্টভূজার মন্দির অগ্নিকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জ্বলিতেছে। পশুপতি পতঙ্গবৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।'

বিষবৃক্ষ : অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ :

'তাঁহার শয়নাগার চিনিত—ফিরিতে ফিরিতে তাহা দেখিতে পাইল—বাতায়নপথে আলো দেখা যাইতেছে। কবাট খোলা—সাসী বন্ধ—অন্ধকারমধ্যে তিনটি জানেলা জ্বলিতেছে; তাহার উপর পতঙ্গজাতি উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। আলো দেখিয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু রুদ্ধ পথে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কাচে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কুন্দনন্দিনী এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের জন্য হৃদয়মধ্যে পীড়িতা হইল।'

চন্দ্রশেখর : দ্বিতীয় খণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদ :

'সে আবার কে? কে, তাহা জানি না—সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি।'

চন্দ্রশেখর : পঞ্চম খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

'দলনী-পতঙ্গ বহ্নিমুখবিবিক্ষু হইল।'

কৃষ্ণকান্তের উইল : প্রথম খণ্ড চতুর্দশ পরিচ্ছেদ :

'এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী রোহিণী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া আবার—পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ—সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল।'

কমলাকান্তের বাণীর পূর্বাভাস মৃণালিনী উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মনোরমা ও হেমচন্দ্রের কথোপকথনের মধ্যে পাই।—

'মনোরমা।...প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শত-মুখী হয়; প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শত পাত্রে ন্যস্ত হয়—পরিশেষে সাগরসঙ্গমে লয়প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্বজীবে বিলীন হয়।

হেমচন্দ্র। তোমার উপদেষ্টা কি বলিয়াছেন, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই? পাপাসক্তকে কি ভালবাসিতে হইবে?

ম। পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে; কেন না, প্রণয় অমূল্য।'

হেমচন্দ্রের মতে ধর্মের অপেক্ষা প্রণয় ন্যূন। 'ধর্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে।' এর উত্তরে মনোরমা বলেছে, 'আমি ধর্মাধর্ম কাহাকে বলে, তাহা জানি না। আমি এইমাত্র জানি, ধর্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।' বঙ্কিমের নিকট প্রণয় ও ধর্মের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। ধর্মই প্রেম, প্রেমই ধর্ম; প্রীতি ঈশ্বর, ঈশ্বরই প্রীতি।

কমলাকান্তের রচনায় স্বাদেশিকতা ও স্বদেশপ্রেমের যে প্রকাশ দেখা যায় তার সূত্রপাত ঘটেছে এই মৃণালিনী উপন্যাসেই। মৃণালিনীতে যার সূত্রপাত, কমলাকান্তে যার সার্থক প্রকাশ আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে সেই মাতৃমন্ত্রের পূর্ণ পরিণতি ঘটেছে। কমলাকান্ত-চরিত্রের পূর্বাভাস অমরনাথের চরিত্রে অতি স্পষ্ট।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসেও বঙ্কিম যথার্থ প্রণয় কি তা ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে হরদেব ঘোষাল কমলাকান্তের মত বঙ্কিমের অপর একজন বাণীপ্রচারক। একই বাণীর দুই প্রচারক মাত্র, মতের বৈপরীত্য নেই। এখানে হরদেবের কলমে (দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ) বঙ্কিম বলেছেন, 'প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক' এবং এ প্রেমেরও পরিণাম 'আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জন।' হরদেবের আড়ালে বঙ্কিমের মন্তব্য, 'এই যথার্থ প্রণয়; সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা; আসঙ্গলিপ্সা

সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি।'

মৃণালিনী উপন্যাসে মনোরমা বলেছিল প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নেই—প্রণয় অমূল্য। বিষবৃক্ষে সে কথাই হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রনাথকে জানিয়েছে। হরদেব বলেছে, সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করলেও কুন্দনন্দিনী অযত্নের যোগ্য নয়। 'কেন না, ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।' বঙ্কিমের মতে নগেন্দ্রের প্রকৃত অপরাধ কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসায় নয়। বস্তুতঃ কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের যে আকর্ষণ ছিল তা নিতান্তই রূপজমোহজনিত। রূপদর্শনজনিত চিত্তবিকৃতি ও প্রণয় এক নয়। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রনাথের যথার্থ প্রণয় কখনো জন্মায় নি বলেই বিবাহের একমাসের মধ্যেই কুন্দ নগেন্দ্রের 'চক্ষুঃশূল' হয়েছে।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বিড়ালের প্রসঙ্গ আছে। বিষবৃক্ষের বিড়ালটিকে কমলাকান্তের 'বিড়ালে'র পূর্বস্থরী বলা চলে। তার ভাব-ভঙ্গী ও চিন্তাধারার সঙ্গে কমলাকান্তের বিড়ালের আশ্চর্য সাদৃশ্য।

বিষবৃক্ষে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে আছে, কমলমণি শয্যাগৃহে পা ছড়িয়ে বসে কার্পেট তুলছে ও শিশুপুত্র সতীশ মায়ের নিকট থেকে উল অপহরণের অবকাশ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত একটি মৃন্ময় ব্যাঘ্রের মুণ্ডলেহনে প্রবৃত্ত। বঙ্কিমের বর্ণনা, 'দূরে একটা বিড়াল, থাবা পাতিয়া বসিয়া, উভয়কে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার ভাব অতি গম্ভীর; মুখে বিশেষ বিজ্ঞতার লক্ষণ; এবং চিত্ত চাঞ্চল্যশূন্য। বোধ হয় বিড়াল ভাবিতেছিল—মানুষের দশা অতি ভয়ানক, সর্বদা কার্পেটতোলা, পুতুল-খেলা প্রভৃতি তুচ্ছ কাজে ইহাদের মন নিবিষ্ট, ধর্মে-কর্মে মতি নাই, বিড়ালজাতির আহার যোগাইবার মন নাই, অতএব ইহাদের পরকালে কি হইবে?"

'বিড়াল' নিবন্ধটিকে 'সাম্য', 'বাংলার কৃষক', 'রামধন পোদ' প্রভৃতি রচনার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা আবশ্যক। সমাজ ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমের যাবতীয় ধারণার মূল কমলাকান্তে পাওয়া যায়।

ইন্দিরা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ বা পঞ্চম সংস্করণের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ; ইন্দিরা যে উপেন্দ্রেরই স্ত্রী—এ কথা সে তখনও প্রকাশ করে নি। উপেন্দ্রের প্রতি সেই ইন্দিরার উক্তি, 'আমি যে তোমা হেন রত্ন ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, ইহাতেই আমার মনের দুঃখ বুঝিও। কিন্তু কি করিব? ধর্মই

আমাদিগের একমাত্র প্রধান উপায়—একদিনের সুখের জন্য আমি ধর্ম ত্যাগ করিব না।' ইন্দিরার এ কথা ছলনা মাত্র নয়। ইন্দিরার সমগ্র চরিত্রই তার উক্তির প্রমাণ।

ইন্দিরার পঞ্চম সংস্করণের ষোড়শ পরিচ্ছেদে ইন্দিরা বলছে (প্রথম সংস্করণে নেই), 'আমি যদি তাঁর হাসিতে, তাঁর চাহনিতে, তাঁর চুম্বনাকাঙ্ক্ষায়, এতটুকু ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার লক্ষণ দেখিতাম, তবে আমিই জয়ী হইতাম। তাহা নহে। সে হাসি, সে চাহনি, সে অধরোষ্ঠবিস্ফুরণে, কেবল স্নেহ—অপরিমিত ভালবাসা। কাজেই আমিই হারিলাম। হারিয়া স্বীকার করিলাম যে, ইহাই পৃথিবীর ষোল আনা সুখ। যে দেবতা, ইহার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে, তাহার নিজের দেহ যে ছাই হইয়া গিয়াছে, খুব হইয়াছে।' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা ও তার পরিতৃপ্তি যে বিবাহজীবনের উদ্দেশ্য মাত্র নয়—এ কথা ইন্দিরাও অনুভব করেছে। ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা ও যথার্থ প্রণয়ের মধ্যে প্রভেদের পরিমাণ কতখানি তা ইন্দিরার নিকট অতি স্পষ্ট। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে ইন্দিরার এই শেষোক্ত চিন্তাভাবনার চিত্রটি কেবল উপন্যাসের পঞ্চম সংস্করণেই প্রথম চিত্রিত হয়। পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ ইন্দিরার এই অংশটিকে কমলাকান্তের দপ্তরের পরবর্তিকালের রচনা হিসেবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং ইন্দিরার এই অংশে দপ্তরের পূর্বাভাস নয়, প্রভাব আছে বলতে হবে।

বিবাহ কিসের কারণে—না প্রীতি শিক্ষার প্রয়োজনে। আত্মসুখের চরিতার্থতা বিবাহ নয়। এ কথার যাথার্থ্য চন্দ্রশেখর বোঝে। এবং বোঝে বলেই চন্দ্রশেখর নিজের মনেই স্বীকার করেছে, 'আমি নিতান্ত আত্মসুখ পরায়ণ—সেইজন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল।' (প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। কেবল ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিই আত্মসুখের একমাত্র লক্ষণ নয়। ধন-যশ-বিদ্যা এগুলিও আত্মসুখের কারণ। চন্দ্রশেখর অনুভব করেছে তার প্রণয়ানুরাগ অপেক্ষা শাস্ত্রানুরাগ অধিক, এবং সেই কারণেই সে নিজেকে আত্মসুখপরায়ণ বলে ধিক্কৃত করেছে।

শৈবলিনীর ইন্দ্রিয়ানুরাগ অধিক। প্রতাপ-প্রণয়িনী শৈবলিনী শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করে অতৃপ্ত। প্রতাপের প্রতি চন্দ্রশেখর-পত্নী শৈবলিনীর আকর্ষণ ও অনুরাগ অপরিমিত। বঙ্কিম সমগ্র উপন্যাস জুড়ে এই শৈবলিনী-'পাপীয়সী'র 'প্রায়শ্চিত্ত' করিয়েছেন নানা কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে। চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কমলাকান্ত-বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, 'মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ

বন্ধ কর।' চন্দ্রশেখর উপন্যাসের বঙ্কিমচন্দ্র এবং কমলাকান্তের দপ্তরের কমলাকান্ত রচনাকালের দিক থেকে একেবারে সমবয়সী, বলা যাবে না কে ছোট বা কে বড়।

চন্দ্রশেখরের পরবর্তী উপন্যাস রজনী। এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে প্রধান প্রধান চরিত্রই কাহিনী বর্ণনা করেছে, ঔপন্যাসিকের কোনো বিবৃতি বা ভূমিকা এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যেন নিজেকে কিছুটা প্রচ্ছন্ন রাখতেই চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়। বঙ্কিম নিজেও ভূমিকায় গ্রন্থের আঙ্গিক প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।' এই কারণে রজনীর বঙ্কিমচন্দ্রে দপ্তর-রচয়িতা কমলাকান্তের প্রভাব তেমন প্রত্যক্ষ নয়। যাই হোক, আমাদের কমলাকান্ত একবার 'বড বাজার'এ 'গামছা কাঁধে করিয়া, বাজার করিতে বাহির' হয়েছিল। তার প্রথম গন্তব্য ছিল রূপের দোকানে। রজনীর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে অমরনাথ বলছে, 'যুবতীর রূপের বিকাশ একপ্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য দেখি তাহাও বিকৃত। যে সৌন্দর্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সৌন্দর্যই সৌন্দর্য।'

কমলাকান্তের দপ্তরে 'বসন্তের কোকিল' একটি বিখ্যাত রচনা। সেখানে কমলাকান্ত কোকিলের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।' তারপরেই বলেছেন, 'রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেকে আছেন।' সেই প্রসঙ্গেই নশীবাবুর বৈঠকখানার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'যখন নশীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়…। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নশীবাবুর পুত্রটির অকাল মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না।…আসল কথা, সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন?'

বঙ্গদর্শনে 'বসন্তের কোকিল' প্রকাশিত হয় ১২৮০ চৈত্র সংখ্যায়। রাধারাণী উপন্যাসটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় ১২৮২ কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। রাধারাণীর শেষ পরিচ্ছেদে কমলাকান্তের বসন্তের কোকিলকে দেখতে পাই। পুরোহিত কর্তৃক রুক্মিণীকুমার ও রাধারাণীর বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেলে সকলেই আনন্দমুহূর্তে এসে পৌছল। কামাখ্যাবাবুর কন্যা 'বসন্ত আসিল, কামাখ্যাবাবুর পুত্রেরা এবং পরিবারবর্গ সকলেই আসিল, আর যত বসন্তের কোকিল, সময়ের বন্ধু, যে যেখানে

ছিল, সকলেই আসিল।' রাধারাণী ছাড়াও অন্যত্র 'বসন্তের কোকিলে'র আবির্ভাব ঘটেছে।

দপ্তরের পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে অনেক স্থলেই কমলাকান্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণকান্তের উইলে কমলাকান্তের প্রণয় তত্ত্বটি স্পষ্ট দেখতে পাই। গোবিন্দলাল দুজন স্ত্রীলোককে ভালবেসেছে—নামে একজন ভ্রমর অপর জন রোহিণী, আর তত্ত্বে একজন প্রণয় অন্যজন রূপতৃষ্ণা বঙ্কিমের বর্ণনা 'রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই [গোবিন্দলাল] জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, এ ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাস-নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে।…যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সংগীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল।' কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর মৃত্যু প্রণয়ের নিকট রূপতৃষ্ণার পরাজয়ের প্রতীক।

কমলাকান্তের বসন্তের কোকিল একেবারে উড়ে এসে বসেছে কৃষ্ণকান্তের বারুণী পুষ্করিণীর উদ্যানে। কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি পরিপূর্ণভাবে কমলাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনা বলেই মনে হয়। উভয় রচনার নৈকট্যের পরিমাণ কিরূপ তা দুই গ্রন্থের দুটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করলেই প্রমাণিত হবে।

'বসন্তের কোকিল' নিবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদ :

'তা ভাই, বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, জলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত, লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু—উ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু—উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই 'কু'—তবে যত পার, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, 'কু—উ।' যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে তোমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, 'কু—উ'—কেন না, তুমি সৌন্দর্যশূন্য, পরান্নপ্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনই ডাকিয়া বলিও, 'কু—উঃ।' যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও,

'কু—উঃ।' যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘনবিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে—তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ 'কু—উঃ।' যখন দেখিবে, শুভ্র-মুখী, শুদ্ধশরীরা, সুন্দরী নবমল্লিকা সন্ধ্যা-শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক-প্রাখর্যের হ্রাস দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে—স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দল-রাজি বিকশিত করিবার উপক্রম করিতেছে, যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া—'আদরেতে আগুসারি'—কণ্ঠভরা গুন্‌গুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে—তখন, হে কালামুখ! আবার 'কু—উঃ' বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও। আর যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণস্থ দাড়িম্বশাখায় বসিয়া দেখিবে, সেই গৃহপুষ্পরূপিণী কন্যাগণে সেই লতার দোলনি, সেই গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বাস, সেই মল্লিকার অমলতা, একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর, ঐ পঞ্চম-স্বরে, গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এত রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা—এ 'কু—উঃ!' ঐটি তোমার জিত ঐ পঞ্চম-স্বর। নহিলে তোমার ও কু—উ কেহ শুনিত না।'

অপর দিকে কৃষ্ণকান্তের উইলের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের বর্ণনা: 'তুমি বসন্তের কোকিল! প্রাণ ভরিয়া ডাক তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে, সময় বুঝিয়া ডাকিবে। সময়ে, অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে। দেখ, আমি বহু সন্ধানে. লেখনী মসীপাত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইয়া, আরও অধিক অনুসন্ধানের পর মনের সাক্ষাৎ পাইয়া, কৃষ্ণকান্তের উইলের কথা ফাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম, এমত সময়ে তুমি আকাশ হইতে ডাকিলে 'কুহু! কুহু! কুহু!' তুমি সুকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই। যাই হউক, আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এ সব স্থানে তোমার ডাকাডাকিতে যায় আসে না। কিন্তু দেখ, যখন নব্যবাবু টাকার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া জমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন, তখন তুমি হয়ত আপিসের ভগ্নপ্রাচীরের কাছ হইতে ডাকিলে, 'কুহূঃ'—বাবুর আর জমাখরচ মিলিল না। যখন বিরহসন্তপ্তা সুন্দরী, প্রায় সমস্ত দিনের পর অর্থাৎ বেলা নয়টার সময় দুটি ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন, কেবল ক্ষীরের বাটিটি

কোলে টানিয়া লইযাছেন মাত্র, অমনি তুমি ডাকিলে—'কুহু'—সুন্দরীর ক্ষীরের বাটি অমনি রহিল—হয ত, তাহাতে অন্যমনে লুণ মাখিযা খাইলেন। যাহা হউক, তোমার কুহু রবে কিছু যাদু আছে, নহিলে যখন তুমি বকুল গাছে বসিয়া ডাকিতেছিলে—আর বিধবা রোহিণী কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল—তখন—।'

কৃষ্ণকান্তের উইলে বসন্তের কোকিলের গুরুত্ব কম নয়। তার পঞ্চম স্বর তার কুহুধ্বনি রোহিণীকে ব্যাকুল করে তোলে। 'যেন এ জীবন বৃথায গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য কিছুই ভোগ করা হইল না।' রোহিণী সরোবরসোপানে অবতরণ করছিল, এমন সময অশোকেব ডালে বসে কোকিল আবার পঞ্চম স্বরে ডাক দিল কুহু। তখন রোহিণী কলসী জলে ভাসিযে নিজে কাঁদতে বসল। কমলাকান্তের দপ্তরেও বসন্তের কোকিল অশোকের ডালে বসে ডাক দিযেছিল কুহু। কিন্তু প্রশ্ন, কৃষ্ণকান্তের উইলে কোকিলের এতই বা ডাকাডাকি কেন। রোহিণীব কান্নার দিকে তাকিযে বঙ্কিম বলেছেন, 'কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বডই সন্দেহ হয, ঐ দুষ্ট কোকিল বোহিণীকে কাঁদাইযাছে।' বস্তুতঃ কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলাল ভ্রমর রোহিণীর মত বারুণী এবং বসন্তের কোকিলও যেন এক একটি চরিত্র-বিশেষ।

মৃণালিনী উপন্যাস প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই বলেছি কমলাকান্তের মাতৃমন্ত্র আনন্দমঠে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। বঙ্গদর্শনে ১২৮১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায দপ্তরের অন্তর্গত 'আমার দুর্গোৎসব' প্রকাশিত হয। বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রথম জন্মভূমির মাতৃরূপ দর্শন করলেন। আনন্দমঠের মূল আদর্শ মুখ্যতঃ এই পরিকল্পনারই পরিণতি। এই পরিণতি বুঝতে গেলে কমলাকান্তকে স্মরণ না করে উপায নেই।

'দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিযা প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চডিযা ভাসিযা যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিযা ডাকিতেছি! আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি?...চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে

কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্ভুজা, নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!…

তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? ঐ ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাহার ছয় কোটি সন্তান—তাহার ভাবনা কি?…

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এসো, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এসো, অন্ধকারে ভয় কি? সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?'

আনন্দমঠের মূলমন্ত্র 'বন্দেমাতরমে'র অন্তর্নিহিত তত্ত্বও এই—'মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?' প্রভেদ শুধু 'আমার দুর্গোৎসবে'র ছয় কোটি সন্তান আনন্দমঠে বৃদ্ধি পেয়ে সপ্ত কোটি হয়েছে, এবং 'বন্দেমাতরম্' হল আশাবাদীর সংগীত।

হিন্দু জাতিকে স্বাধীন দেখবার আকাঙ্ক্ষা বঙ্কিমের মন থেকে কখনো নির্বাপিত হয় নি। যদিও পরিণত বুদ্ধির সহায়তায় তিনি ভাল করেই অনুধাবন করেছিলেন যে বর্তমান অবস্থায় এই স্বাধীনতা হিন্দু জাতির লক্ষ্য নয়। স্বাধীন হিন্দুজাতির ইতিকথাও বঙ্কিমের পরম সুখানুভূতির কারণ। কমলাকান্তের দপ্তরের 'একটি গীতে' যে আকুলতার প্রকাশ ঘটেছে, আনন্দমঠে তা পরিণততর রূপ লাভ করে। 'একটি গীতে' কমলাকান্ত বলছে—

'গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি।…

মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরব বিঘ্নিত করিয়া, যবন-সেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কাল পূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন।'

আনন্দমঠের সন্তানগণ বঙ্গজননীর এই লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবার সাধনা করেছিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় অপরিসীম ব্যাকুলতা সত্ত্বেও আনন্দমঠের সন্তান-সম্প্রদায়কে বিজয়-গৌরব দিতে পারেন নি।

আনন্দমঠ প্রসঙ্গে সীতারাম ও পুনঃপ্রণীত রাজসিংহ উপন্যাসের কথাও আসে। যে দেশপ্রেমের আবেগ কমলাকান্তে দেখেছি, সেই আবেগেই বঙ্কিমকে আনন্দমঠ সীতারাম বা রাজসিংহের মত দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

স্বদেশের প্রতি কমলাকান্ত বঙ্কিমের প্রণয় গভীর, কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রতি প্রণয় গভীরতর। 'প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি'—মনে হয় এটিই সমগ্র বঙ্কিমসাহিত্যের মুখ্য সুর। যে মনুষ্যপ্রীতির অপূর্ব জয়গান কমলাকান্তের মধ্যে আছে তার বিকাশ যে শুধু উপন্যাসেই ঘটেছে তা নয়। বঙ্কিমের বিখ্যাত গ্রন্থ ধর্মতত্ত্ব বা কৃষ্ণচরিত্রেও এই তত্ত্বই বিকাশ লাভ করেছে দেখিতে পাই। আর বিবিধ প্রবন্ধের কোনো কোনো প্রবন্ধও এ-প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়।

কমলাকান্তে বঙ্কিম মনুষ্যপ্রীতি ঈশ্বরপ্রীতি ও ধর্ম—এই তিন বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জগৎসংসারে প্রীতি সর্বব্যাপিনী, এবং সেই প্রীতিরই অপর নাম ঈশ্বরপ্রীতি। এই প্রীতিই মনুষ্যজীবনের সুখের মূল। বিবিধ প্রবন্ধের 'ধর্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন, 'ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম। ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী মূর্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে?' দপ্তরের 'একটি গীত' নিবন্ধে কমলাকান্তের স্পষ্ট উচ্চারণ, 'লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী, বুঝিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জন্য পরনন্দশনের আকাঙ্ক্ষা, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্মার দপ্তর-মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। কমলাকান্তে বঙ্কিম বার বার ইন্দ্রিয়ানুরাগের অসারতা ব্যাখ্যা করেছেন, ইন্দ্রিয়সংযমের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে কি মনুষ্যজীবনে নরনারীর বিবাহ বা সংসারস্থাপন অকল্যাণকর? তা কখনই নয়। কমলাকান্ত নিজেই একবার বলেছে, 'কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে

পার?' এ কোন্ বিবাহ? যে বিবাহে আত্মপরিবারকে ভালবেসে সমগ্র মনুষ্যজাতিকে ভালবাসার শিক্ষা লাভ করা যায়—সেই বিবাহ। বিবিধ প্রবন্ধের 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন, 'আত্মরক্ষার্থে বা ধর্মরক্ষার্থে অর্থাৎ ঐশিক নিয়মরক্ষার্থে যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অভিলাষ করে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই; যে না করে, তাহার হইয়াছে।' কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযমই শেষ কথা নয়। তার চেয়েও বড় প্রয়োজন হল চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি কি? 'যখন আপনি যেমন, পর তেমন, এই কথা বুঝিব, যখন আপনার সুখ যেমন খুঁজিব, পরের সুখ তেমনি খুঁজিব, যখন আপনা হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, যখন ক্রমশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পরকে সর্বস্ব জ্ঞান করিতে পারিব, যখন পরেতে আপনাকে নিমজ্জিত রাখিতে পারিব, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি হইবে।' কমলাকান্তের দপ্তরে যা মনুষ্যজাতির প্রতি প্রীতি, অন্যত্র তাকেই বলা হয়েছে ধর্ম বা চিত্তশুদ্ধি।

১০

উত্তরচরিতের বঙ্কিম

'উত্তরচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত একটি অতি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-নিবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিত' বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৭৯ বঙ্গাব্দের (১৮৭২ খ্রী) জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন এই পাঁচ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। স্মরণ রাখা আবশ্যক এই আলোচনা প্রকাশের দশ বৎসর কাল পূর্বে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'সীতার বনবাস' গ্রন্থ এবং তারও কয়েক বৎসর পূর্বে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' মুদ্রিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের সূচনাতেই লিখেছেন, 'অন্যের কথা দূরে থাকুক, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভবভূতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষদেব ও বাণভট্টের পর তদীয় নাম-নির্দেশ, বোধ হয়, অসঙ্গত নহে। আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং লোকহিতৈষী বলিয়া মান্য করি, কিন্তু তাদৃশ কাব্যরসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না। যাহা হউক, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী হইতে এইরূপ সমালোচনার নিঃসরণ, অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ। বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিতের মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদুবাবু, মধুবাবু তাহার কি বুঝিবেন?'[১] 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের উক্তি প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ মন্তব্য করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই ভবভূতি সম্পর্কে বিদ্যাসাগর কি বলেছেন তা দেখা প্রয়োজন। ভবভূতি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু তা বিশেষ গভীর এবং অর্থবহ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনায় পূর্ববর্তী সমালোচক বিদ্যাসাগরকে কতখানি অতিক্রম করেছেন কিংবা আদৌ

১ বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে এই অংশ নেই। দ্রষ্টব্য বঙ্গদর্শন ১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৮৭।

করতে পেরেছেন কিনা আমাদের কৌতূহলের বিষয়। আমরা প্রথমেই ভবভূতি ও তাঁর নাটক উত্তরচরিত সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য উদ্ধৃত করি।

'ভবভূতি একজন অতি প্রধান কবি ছিলেন। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি শ্রীহর্ষদেব ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনিদেশ, বোধ হয়, অসঙ্গত নহে। ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও অতি চমৎকারিণী। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতি প্রণীত নাটকত্রয়ের [বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব] রচনা সে সকল অপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়। ইনি, অন্য অন্য কবিগণের ন্যায় মধুর ও কোমল রচনায় বিলক্ষণ প্রবীণ ছিলেন, অধিকন্তু, ইঁহার নাটকে মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য দেখিতে পাওয়া যায় অন্য অন্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই যে, অন্য অন্য কবিরা অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও, আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন, ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান। অনাবশ্যক স্থলে কোনও ক্রমেই স্বীয় রচনাকে আদিরসে দূষিত করেন নাই আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। ইঁহার যেমন বিশেষ গুণ আছে তেমনই কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে। রচনার দোষে স্থানে স্থানে অর্থবোধ [illegible] দুর্ঘট, এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা আছে যে, তাহাতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। নাটকের কথোপকথন স্থলে সেরূপ দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দূষ্য।'

অতঃপর 'উত্তরচরিত' সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের উক্তি 'উত্তরচরিত ভবভূতির সর্বপ্রধান নাটক। এই নাটক করুণরসাশ্রিত। বর্ণনা সকল কারুণ্য, মাধুর্য ও অর্থের গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর ললিত ও প্রগাঢ়। ফলতঃ শকুন্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরস বিষয়ে সেইরূপ। এই নাটক পাঠ করিলে মধ্যে মধ্যে অশ্রুপাত করিতে হয়।'

এখন বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উত্তরচরিত প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কবিবর্গের মধ্যে ভবভূতির ষষ্ঠ স্থান নির্দেশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ভবভূতির নাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়েকজন নাট্যকারের নামের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, 'পৃথিবীর নাটক প্রণেতৃগণমধ্যে যে শ্রেণীতে সেক্ষপীয়র, এস্কিলস, সফোক্লস, কাল্দেরণ, এবং কালিদাস, ভবভূতি সেই শ্রেণীভুক্ত না হউন, তাঁহাদের নিকটবর্তী বটে।'[1] এই

১ বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে এই অংশ নেই। দ্রষ্টব্য বঙ্গদর্শন [illegible] পৃ ৮৭।

কয়জন নাট্যকারের মধ্যে বঙ্কিম যে তাঁর সমালোচনায় সকলের সঙ্গেই ভবভূতির তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তা নয়, তিনি ভবভূতির দোষগুণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনো কোনো স্থলে শেক্সপীয়র ও কালিদাসের সঙ্গে ভবভূতির তুলনা করে দেখিয়েছেন। সর্বক্ষেত্রে ঠিক তুলনামূলক বিচার বলা সঙ্গত হবে না। তুলনামূলক বিচার এক বস্তু, এবং দুই কবি বা নাট্যকারের রচনায় সাধারণ সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আবিষ্কার করা আর-এক। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আবিষ্কারে যত্নবান হয়েছেন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সেই সমালোচনাকে তুলনামূলক বিচার অভিধায় উল্লেখ করা চলে না। যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ ইউরোপীয় সাহিত্যরস আস্বাদন করে এবং ইউরোপীয় সমালোচনা রীতির আদর্শানুসরণে বর্তমান নিবন্ধ রচনা করেন। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি যে তাঁর বিশেষ ভক্তি নেই, বঙ্কিম স্বীয় রচনায় এ-কথা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন। 'পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জনা করিবেন। আমরা আলঙ্কারিক নহি। অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি আমাদিগের বিশেষ ভক্তি নাই।...পাঠকের নিকট আমাদের অনুরোধ যে, অলঙ্কারশাস্ত্র তিনি একবারে বিস্মৃত হউন, নচেৎ নাটকের রসগ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমরা সোজা কথায় তাঁহাকে বুঝাইতে চাহি—এই কবির সৃষ্টি মধ্যে কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না। পাঠক যদি ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা না করেন, তবে আমাদিগের অনুবর্তী হউন।'[৩] এই ঘোষণা সত্ত্বেও, বঙ্কিম স্বীয় সমালোচনা রীতিতেও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠ সমালোচক।

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, 'আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচনা করি নাই। পাঠকের সহিত আনুপূর্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক একখানি প্রস্তর পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্যমূর্তির অনির্বচনীয় শোভা বর্ণন করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের। এ স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্বাংশের পর্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ

৩ দ্রষ্টব্য বঙ্গদর্শন ১২৭৯ আষাঢ়, পৃ ১০৭-১০৮।

বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত করিতে হইলে, তাহার অনন্তবিস্তার এক কালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনাও সেইরূপ।'

সুতরাং যে রীতি বঙ্কিমের মতে প্রকৃত সমালোচনা, 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে তা অনুসৃত হয় নি। এই সমালোচনায় প্রথমাবধি গ্রন্থের বিভিন্ন অঙ্কের 'সারমর্ম' উদ্ধার ও দোষগুণের বিশ্লেষণ করা হয়েছে; কিন্তু যে দৃষ্টিতে সামগ্রিক সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত হতে পারে তা অনুসৃত হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়টি তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহারে এসে অনুভব করেন। ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শনের চার সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, আশ্বিন সংখ্যায় শেষ কিস্তি প্রকাশিত হচ্ছে। এমন সময় বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করলেন উত্তরচরিতের 'প্রকৃত সমালোচনা' হয় নি। তাই প্রবন্ধের শেষ কিস্তির শেষাংশে অতি সংক্ষেপে উত্তরচরিতের সামগ্রিক মূল্যনির্ধারণে প্রয়াসী হন। বঙ্কিমের উক্তি, 'উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপর দুই চারিটা কথা না বলিলে নয়। অধিক বলিবার স্থান নাই।' নিতান্তই কি স্থানের অভাবে উত্তরচরিতের 'প্রকৃত সমালোচনা' সংক্ষিপ্ত?

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমগ্র প্রবন্ধে উত্তরচরিতের বিভিন্ন অঙ্কের সৌন্দর্য যেমন আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে নানা অংশের দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতাও তেমনই বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম অঙ্কে চিত্রদর্শন, দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক, তৃতীয়াঙ্ক ও তৃতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক, ছায়াসীতা, ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভক প্রভৃতি অংশকে পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করে সমালোচক প্রশংসা করেছেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, কালিদাসের শকুন্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, ভবভূতির উত্তরচরিত করুণরস বিষয়ে সেইরূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।

চিত্রদর্শন পর্যায়ে ভবভূতির বর্ণনাশক্তি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বঙ্কিম এই উক্তি করেছেন। কালিদাস বর্ণনা শক্তিতে প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতি তদপেক্ষা হীন নন। কালিদাস একটি একটি করে খুঁজে খুঁজে সুন্দর সামগ্রীগুলি শুধু একত্রিত করেন, অপর দিকে ভবভূতি, যা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলে বোধ করেন, তাই অঙ্কিত করেন। কালিদাসের বর্ণনা তাঁর অতুল উপমা প্রয়োগে মনোহারিণী; ভবভূতির উপমা প্রয়োগ অতি বিরল, কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁর লেখনীমুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভা ধারণ করে।

বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধে ভবভূতি-সৃষ্ট রামচন্দ্রের সঙ্গে রামায়ণের রামের তুলনা করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর-প্রণীত 'সীতার বনবাসে'র রামচন্দ্রের উল্লেখ করেছেন। 'উত্তরচরিতে'র প্রথম অঙ্কের রামবিলাপ সমালোচকের প্রশংসা লাভ করে নি। ভবভূতির রামচন্দ্র চরিত্র রামায়ণের রামচন্দ্রের তুলনায় অধিকতর কোমল প্রকৃতির বলে তাঁর বোধ হয়েছে। রামায়ণের রাম যেখানে মহাবীর, এবং তাঁর চরিত্র যেখানে গাম্ভীর্য ও ধৈর্যে পরিপূর্ণ; ভবভূতির সৃষ্ট রামচরিত্র সেখানে কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট, বীরলক্ষণ কিছুই প্রায় নেই, গাম্ভীর্য ও ধৈর্যেরও নিতান্তই অভাব। ভবভূতির রামচন্দ্র সম্পর্কে বঙ্কিমের উক্তি, 'তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতাপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ।' এবং নাট্যকার সম্বন্ধে মন্তব্য, 'এইরূপ রচনা ভবভূতির ন্যায় মহাকবির অযোগ্য—কেবল আধুনিক বিদ্যা-লঙ্কারদিগের যোগ্য।' ভবভূতির রামবিলাপের সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র পরিশেষে বলেছেন, 'কিন্তু ইহাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মন উঠে নাই। তিনি সীতার বনবাসের দ্বিতীয় তৃতীয় পরিচ্ছেদে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। তাহা পাঠ কালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালীর মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে।' বিদ্যাসাগরের রামচন্দ্র সম্পর্কে বঙ্কিমের এই মন্তব্যের (বঙ্গদর্শন ১২৭৯ আষাঢ়, পৃ ১১৫) যাথার্থ্য নির্ধারণ আবশ্যক।

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্ক থেকে যে অংশ উদ্ধৃত করে ভবভূতির অপ্রশংসা করেছেন, বিদ্যাসাগর সেই স্থলে কিরূপ অনুবাদ করেছেন দেখা যেতে পারে। 'সীতার বনবাসে' রামচন্দ্রের উক্তি, 'হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্যবাসসহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর।' ভবভূতির রামের বিলাপোক্তির তুলনায় এই অংশ অনেক সংক্ষিপ্ত ও সংযত। বিদ্যাসাগর ভবভূতির করুণরসের মত্ত প্রবাহ এ স্থলে অনেকখানি সংহত আকারে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং বিদ্যাসাগর তাঁর রামের বিলাপোক্তিকে 'আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন'—এ মন্তব্য সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সামগ্রিকভাবে করুণরসের প্রতি বিদ্যাসাগরের আন্তরিক অনুরাগ ছিল, এ কথা ত সত্য।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরচরিতের প্রথম ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে কালগত অনৈক্য এবং তৃতীয় অঙ্কে ক্রিয়াপারম্পর্যের অভাব লক্ষ্য করেছেন। কাব্যাংশের দিক থেকে

তৃতীয় অঙ্ক অত্যন্ত প্রশংসনীয় হলেও, উপসংহৃতির উদ্যোজক না হওয়ায় এই অঙ্ক নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক বলে বঙ্কিমচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করেছেন।

যে অঙ্ক নাটকের পক্ষে অনাবশ্যক, যেখানে 'রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য', বঙ্কিমচন্দ্র সেই অঙ্কেরই দীর্ঘতম বিবরণ দিয়েছেন তাঁর রচনায়। সেই তুলনায় সমালোচনা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র কয়েক ছত্রে সম্পূর্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কের মর্মকথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে বলেছেন, 'উত্তরচরিত সমালোচন ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিয়াছে যে আর ইহাতে অধিক স্থান নিয়োগ করা কর্তব্য নহে।' তাই দেখি পরবর্তী অঙ্কগুলির বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত, সমালোচনা সংক্ষিপ্ততর।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিত' নিবন্ধটি শুধু সমালোচনা মাত্র নয়, এটি একাধারে উত্তরচরিতের অনুবাদ, ভাবানুবাদ ও সমালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্র তার নিবন্ধে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের যেরূপ পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন, পরবর্তী অঙ্কগুলির বর্ণনায় যদি সেইরূপ সামঞ্জস্য রক্ষিত হত, তাহলে এটিও একটি সম্পূর্ণ 'সীতার বনবাস' রূপে সংকলিত হতে পারত। তদ্রূপ বলা চলে বিদ্যাসাগর তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে ভবভূতির নাট্যপ্রতিভার যে আলোচনা করেছিলেন, তা আরও একটু বিস্তারিত আকারে 'সীতার বনবাস' গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত হলে, তিনিই উত্তরচরিতের সমালোচক হিসাবে বঙ্কিমের পূর্বেই সম্মান লাভের সুযোগ পেতেন। তবে এখানে মনে রাখা আবশ্যক 'সীতার বনবাসে' উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্কটিই বিশেষভাবে পরিগৃহীত হয়েছিল।

বঙ্কিম উত্তরচরিতের প্রথম তিন অঙ্কের যেরূপ বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং পরবর্তী গণ্ডগুলির বর্ণনা অকস্মাৎ যেভাবে সংক্ষেপে পরিসমাপ্ত করেছেন, তাতে সামগ্রিকভাবে রচনাটিতে ভারসাম্যের অভাব লক্ষিত হয়। এটি অবশ্যই এই প্রবন্ধের একটি গুরুতর ত্রুটি হিসাবে চিহ্নিত হবে। প্রবন্ধের কাঠামোটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ সতর্ক ছিলেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া 'উত্তরচরিত' বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রথম সাহিত্যসমালোচনা। এতদ্ব্যতীত মনে হয় এই প্রবন্ধের ভারসাম্য ও সংহতির অভাবের একটি বড় কারণ—রচনাটি দীর্ঘ পাঁচ মাস খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। বঙ্গদর্শন তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে। একই মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের চারটি পাঁচটি রচনা মুদ্রিত হচ্ছে। বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'উত্তরচরিতে'র প্রথম কিস্তি মুদ্রিত হয়। এ-ছাড়াও এ-সংখ্যায় আছে ধারাবাহিক বিষবৃক্ষ উপন্যাসের অংশ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং কবিতা। উপন্যাস, সমালোচনা, কবিতা, বিজ্ঞান—

বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে লিখছেন। তাই মনে হয় বঙ্কিম তাঁর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটি পত্রিকার প্রয়োজনে মাসে মাসে খণ্ডে খণ্ডে লিখে সমাপ্ত করেছেন; অবসরের অভাবে সমগ্র রচনাটি একটানা লেখবার সুযোগ হয়ত তিনি পান নি। পত্রিকার স্থানাভাবের জন্যও তাঁর রচনা যে কোথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'উত্তরচরিত নাটকের উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং করুণ রসপূর্ণ।' এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম বাল্মীকি রামায়ণ থেকে সুদীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করেন। উদ্ধৃত অংশের নীচে সমালোচক লিখেছেন, 'স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা এই দুই সর্গের অনুবাদ করিয়া দিতে পারিলাম না।' অথচ লক্ষণীয় বিষয় হল, এই সমালোচনা বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে অনুবাদ সহ-ই সংকলিত হয়েছে।

স্থানাভাবের কথা বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্রও উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধের শেষাংশে ভবভূতির রামবিলাপের প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন করে বলেছেন, 'আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, রামবিলাপের সহিত, আর কয়খানি প্রসিদ্ধ নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই। কিন্তু স্থানাভাবে পারিলাম না।'

লক্ষ্য করবার বিষয়, পরবর্তী কালে বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে এই উক্তিই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। প্রবন্ধের মধ্যে বার বার স্থানাভাবের অজুহাত রচনার গৌরব বৃদ্ধি করে না। পরিবর্তে লেখকের অনেক মন্তব্য সেক্ষেত্রে বাচনিক কৌশল মাত্র বলে ভ্রম হবার সম্ভাবনা থাকে।

ভবভূতির সমগ্র উত্তরচরিত নাটক সাতটি অঙ্কে সম্পূর্ণ। সেগুলি হল—চিত্রদর্শনো নাম প্রথমাঙ্ক, পঞ্চবটীপ্রবেশো নাম দ্বিতীয়াঙ্ক, ছায়া নাম তৃতীয়াঙ্ক, কৌশল্যাজনকযোগো নাম চতুর্থাঙ্ক, কুমারবিক্রমো নাম পঞ্চমাঙ্ক, কুমারপ্রত্যাভিজ্ঞানো নাম ষষ্ঠাঙ্ক, সম্মেলনং নাম সপ্তমাঙ্ক।

এই সাতটি অঙ্কের পৃথক পৃথক পরিচয় দান ও আলোচনার শেষে বঙ্কিম 'মোটের উপর দুই চারিটা কথা'য় উত্তরচরিতের সামগ্রিক মূল্যনিরূপণের প্রয়াসী হন। এই অংশে তিনি কাব্যের যথার্থ উদ্দেশ্য কি—সে কথা আলোচনা করে তারই আলোকে ভবভূতির সৃষ্ট চরিত্র ও তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির এবং তাঁর রসোদ্ভাবন ক্ষমতা ও ভাষাব্যবহার ইত্যাদির সমালোচনা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে যে 'সৃষ্টি'-ক্ষমতা বাল্মীকির আছে, মহাভারতকারের আছে, যে ক্ষমতার প্রকাশ শ্রীমদ্ভাগবতে বা শকুন্তলায় বর্তমান, ভবভূতির উত্তরচরিতে সেই সৃষ্টিগুণের পরিচয় নেই। অপ্রধান চরিত্র অঙ্কন প্রশংসনীয় হলেও, রাম ও সীতা—

এই দুই প্রধান চরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির কৃতিত্বের পরিচয় পান নি। সমালোচকের মতে ভবভূতির সীতা রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতিমাত্র এবং রামের চরিত্র রামায়ণের রামচরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নয়, ভবভূতির হাতে সেই মহৎ চিত্র বিকৃত হয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমের উক্তি, 'উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেকদূর পর্যন্ত বাল্মীকির অনুবর্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব, এবং সৃষ্টিচাতুর্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই।'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য কিছুটা স্ববিরোধী বলে মনে হয়। কারণ উত্তরচরিত প্রবন্ধের গোড়াতেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'স্থূল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু উপাখ্যানবর্ণন কার্যাদি সকল ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনায় পুনর্মিলন, এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতলপ্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরচরিতে সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তর-চরিতে সীতার রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ, এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনর্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবভূতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।' এই প্রসঙ্গে সমালোচক আবার ভব-ভূতির সঙ্গে শেক্সপীয়রেরও তুলনা করেছেন। শেক্সপীয়র অদ্বিতীয় কবি, তিনি স্বীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ বুঝতেন। তিনি তাঁর অধিকাংশ নাটকেরই উপাখ্যান অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, এবং ইচ্ছাপূর্বকই পূর্ববর্তী লেখকবর্গের অনুবর্তী হয়েছিলেন। 'কেবল একখানি নাটকের উপাখ্যানভাগ তিনি হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ট্রৈলস্ ও ক্রেসিদা নাটক প্রণয়ন কালে, ভবভূতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্নপথে গমন করিয়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন।' প্রবন্ধের সূচনায় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশের পর আলোচনার উপসংহারে লেখক যদি বলেন ভবভূতি বিশেষভাবে বাল্মীকির অনুবর্তী হওয়ার ফলেই নাটকে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার প্রকাশ ঘটে নি—তবে অবশ্যই অভিমত দুটিকে স্ববিরোধী বলে উল্লেখ করা যায়।

সৃষ্টিকৌশল ব্যতীত কবির অপর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন। আলঙ্কারিকরা যাকে স্থায়ীভাব বলেন, বঙ্কিম তারই কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন অভিধায় উল্লেখ করেছেন। সমালোচকের মতে রামবিলাপ ব্যতীত ভবভূতি অন্যত্র তাঁর ব্যাপক রসোদ্ভাবন ক্ষমতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন।

বিদ্যাসাগর ভবভূতির ভাষার সর্বত্র প্রশংসা করেন নি। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার নাট্যকার যেখানে যেখানে দীর্ঘ সমাস ব্যবহার করে রসাস্বাদে ব্যাঘাত

ঘটিয়েছেন, বিদ্যাসাগর সেই সকল অংশের নিন্দা করেছিলেন। তাঁর মতে, 'নাটকের কথোপকথন স্থলে সেরূপ দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দুষ্য।' বঙ্কিম উত্তরচরিত থেকে কয়েকটি দীর্ঘ সমাস উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনার দোষ-মধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। যাহা কিছুতে অর্থবোধের বিঘ্ন হয়, তাহাই দোষ। ঈদৃশ সমাসে অর্থবোধের হানি, সুতরাং ইহা দোষ। নাটকে ইহা যে বিশেষ দোষ, তাহাও স্বীকার করি, কেননা ইহাতে নাটকের অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়। এ সকল কথা স্বীকার করিয়াও আমরা বলি, উত্তরচরিতের অনেক সরলাংশ পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি এই সমাসগুলিন ত্যাগ করিতে পারি না। স্বতন্ত্র কাব্যাংশ হিসাবে এই সমাসগুলির মূল্য থাকলেও এগুলি যে নাটকের রসোপলব্ধির পক্ষে বিঘ্নের কারণ—সে বিষয়ে বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের মন্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন। তবে বিদ্যাসাগর যে তাঁর আলোচনায় আরও একটি কথার উল্লেখ করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সে কথাটিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারতেন। কারণ বিদ্যাসাগর তাঁর প্রস্তাবে বলেছিলেন, 'বিশেষতঃ, অর্থবোধের কষ্ট ও অতিদীর্ঘ সমাস প্রভৃতি ভবভূতির যে সমস্ত দোষ আছে, সে সমুদায় মালতীমাধবেই ভূরি পরিমাণে উপলব্ধ হয়।' অর্থাৎ বিদ্যাসাগর দীর্ঘ সমাস ও অর্থবোধের বিঘ্ন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষভাবে উত্তরচরিত প্রসঙ্গে নয়, সাধারণভাবে ভবভূতির রচনা সম্পর্কে, এবং নির্দিষ্টভাবে মালতীমাধব নাটক প্রসঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরচরিতের ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ভবভূতির ভাষা অতি চমৎকারিণী। তাঁহার রচনা সমাসবহুলতা ও দুর্বোধ্যতা দোষে কলঙ্কিতা বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে।' বঙ্কিমের এই মন্তব্য যথাযথ নয়। কারণ বিদ্যাসাগর তাঁর আলোচনায় এ কথাই বলেছেন যে, ভবভূতির রচনায় দীর্ঘসমাস ব্যবহারজনিত কিছু ত্রুটি আছে, কিন্তু তা বিশেষভাবে মালতীমাধব নাটকেই ব্যবহৃত। উত্তরচরিতের ভাষা দুর্বোধ্যতাদোষে কলঙ্কিতা—বিদ্যাসাগরের রচনায় এমন মন্তব্য বা ইঙ্গিত কোথাও নেই।

১১.

বাংলা গদ্যরীতি ও বঙ্কিম

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধটি বাংলা গদ্যের রীতি বা style সম্পর্কিত একখানি অতি মূল্যবান আলোচনা। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর গ্রন্থে আলালী রীতির নিন্দা ও বিদ্যাসাগরী রচনার প্রশংসা করেছিলেন; অপরপক্ষে তৎকালীন কলিকাতা রিভিউ পত্রে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত রীতির প্রভাব পরিত্যাগের প্রস্তাব দেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও রামগতি ন্যায়রত্নকে নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ গ্রহণ করে তাঁদের বক্তব্য বিশ্লেষণ ও আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

আমরা এতদিন 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করে এই ধারণাই পোষণ করে এসেছি যে, বঙ্কিম তার এই রচনায় প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে বিদ্যাসাগরী রীতির নিন্দা ও আলালী রীতির প্রশংসা করেছেন। 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য, 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা ভাষা নামে প্রবন্ধটি আগাগোড়াই প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে বিদ্যাসাগরী রীতির নিন্দা ও আলালী রীতির প্রশংসা।...বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বিদ্যাসাগরী ভাষা নিন্দার যোগ্য, কেননা তা সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃতানুসারী, আর টেকচাঁদের ভাষা প্রশংসাই, কেননা, তা কথোপকথনের ভাষা এবং প্রচলিত ভাষা।' বঙ্কিমের প্রবন্ধটি অনুধাবন করার পূর্বে আমাদের একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে সাহিত্য সংক্রান্ত মত এবং ভাষা ও রীতি সংক্রান্ত মতামতকে আমরা যেন মিলিয়ে না ফেলি। কারণ গদ্যসাহিত্য এবং গদ্যরীতি এক বস্তু নয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থের আবির্ভাব

গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে বঙ্কিমচন্দ্র মত প্রকাশ করেছেন। টেকচাঁদের পূর্বে 'সংস্কৃত-প্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া' ছিল। 'টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে টেকচাঁদ সংস্কৃতানুকারিতার বেড়া ভেঙে স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার থেকে স্বীয় রচনার উপাদান সংগ্রহ করে যে সাহিত্য রচনা করে গেলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা এক নূতন পথের দিশারী হিসাবে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করলেও, আলালের ভাষা বা আলালী রীতি সম্পর্কে বঙ্কিমের অভিমত কি? বঙ্কিম কি আলালী ভাষার প্রশংসা করেছেন? তিনি কি কোথাও এমন বলেছেন যে বিদ্যাসাগরী রীতি নিন্দনীয় ও পরিহারযোগ্য এবং আলালী রীতিই একমাত্র আদর্শ ও গ্রহণযোগ্য?

এই প্রসঙ্গে 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটির সঙ্গে বঙ্কিম-রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' শীর্ষক রচনাটির বক্তব্যও আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিম হুতোমি ও আলালী উভয় ভাষা সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। হুতোমি ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্তব্য, 'আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্যজ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোমপেচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার প্রশংসা করি না।'

অতঃপর টেকচাঁদি ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমের উক্তি, 'টেকচাঁদি ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ্ কবি বর্ণস্ হাস্য ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেননা, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত।' 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' প্রবন্ধে বঙ্কিম

'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের প্রশংসা করলেও ভাষা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন, 'আমি এমন বলিতেছি না আলালের ঘরের দুলালের ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাবসকল, সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ।' 'আলালের ঘরের দুলালে'র কৃতিত্ব ও তার মূল্য বঙ্কিমচন্দ্র অন্যদিক থেকে বিচার করে দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালি জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাহার অক্ষয় কীর্তি।'

এই অংশ পাঠ করলে সহজেই বোঝা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ ভাষারীতি হিসেবে সংস্কৃতানুসারী ও আলালী এই উভয়রীতির কোনটিকেই যেমন সম্পূর্ণ স্বীকার করেন নি, সেইরূপ আদর্শ ভাষা নির্মাণে এই উভয় রীতির অবস্থান ও প্রয়োজনীয়তাও কোথাও অস্বীকার করেন নি। সংস্কৃতানুসারী ভাষা বা বিদ্যাসাগরী রীতি নিন্দনীয়, এবং আদর্শ ভাষা নির্মাণে এই রীতির কোনপ্রকার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা নেই—এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বা অন্যত্র কোথাও বলেন নি। পরিবর্তে বঙ্কিমচন্দ্র স্বতন্ত্রভাবে কোথাও আলালী রীতির প্রশংসা করেন নি, তবে আলালী রীতির আবির্ভাবকে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে একটি শুভসূচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সংস্কৃতানুসারী রীতিও স্বতন্ত্রভাবে বঙ্কিমের নিকট কখনই প্রশংসিত হয় নি। তাই রামগতি ন্যায়রত্নের মত কোনো সমালোচক যখন অন্ধভাবে আলালী রীতির নিন্দা ও সংস্কৃতানুসারী তথা বিদ্যাসাগরী রীতির প্রশংসা করেন তখন বঙ্কিমচন্দ্রকে নিছক সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ন্যায়রত্নের মন্তব্যের

বিরোধিতা করতে হয়। আলালী ভাষা বিচারে ন্যায়রত্নের যথার্থ কোথায় ভ্রান্তি ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্র তা চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছেন। ন্যায়রত্ন বলেছিলেন, 'পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না।' এর উত্তরে বঙ্কিম যা বলেছেন তাতে বিদ্যাসাগর বা বিদ্যাসাগরী রীতির সমালোচনা নয়, ন্যায়রত্নের একদেশদর্শী মনোভাবেরই সমালোচনা করা হয়েছে মাত্র। বঙ্কিম বলছেন, 'তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতাপুত্রে একত্র বসিযা অসঙ্কুচিত মুখে টেকচাঁদি ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতা পুত্রে একত্র বসিযা রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমা কীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' ভাববস্তুর বিচার ও ভাষারীতির বিচার যে এক কথা নয়, তা রামগতি ন্যায়রত্নের মত সমালোচকের পক্ষে জানা থাকবার কথা নয়। বঙ্কিম বলেছেন, 'ন্যায়রত্ন মহাশয সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরেজি জানেন না— পাশ্চাত্য সাহিত্য তাহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিযা ন্যায়রত্ন মহাশয কিছু লোক হাসাইয়াছেন।' এই রামগতির ভ্রান্তি ও অবিদ্যাজনিত কোন প্রকার সমালোচনাই বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন লাভের সুযোগ পায নি।

তদ্রূপ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায নব্য রীতির সমর্থক হলেও, তাঁরও সকল বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করতে পারেন নি। শ্যামাচরণ তাঁর প্রবন্ধে সংস্কৃত রীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল সংস্কারমুক্ত মন। তিনি যে রামগতির মতো, এক রীতির নিন্দা করেছেন বলেই আর এক রীতির মহিমা কীর্তনে প্রবৃত্ত হবেন, সে জাতের মানুষ বঙ্কিম নয়। শ্যামাচরণের প্রবন্ধ 'সারগর্ভ' বলে স্বীকার করলেও, তিনি যে 'বাঙ্গালা ভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন' এ-কথা বলতে বঙ্কিম কুণ্ঠিত হন না। তাঁর প্রবন্ধ আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিম বাংলা ভাষায় অনেক স্থলেই যে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আছে সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বাংলা শব্দ ত্রিবিধ। তদ্ভব, তৎসম এবং অবশিষ্ট শব্দ—যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য। তদ্ভব শব্দ প্রসঙ্গে শ্যামাচরণের বক্তব্য হল, মাথার পরিবর্তে মস্তক, বামনের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্তব্য নয়। এ স্থলে বঙ্কিমের যুক্তি, 'যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সাধ্যও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা

হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্ চাষা আছে যে, ধান্য, পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্হ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়ংদশে ধনশূন্য হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্য করা কোনক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে।'

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তরিত না হয়েই বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে, বঙ্কিমের মতে সেগুলি পরিত্যাগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

তৃতীয় শ্রেণীর শব্দ, যে শব্দগুলি সংস্কৃতের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য, সেগুলি সম্পর্কে বঙ্কিম শ্যামাচরণের সঙ্গে একমত। ভাষার সমৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত অ-সংস্কৃত সকল প্রকার শব্দই গ্রহণ করতে হবে, কোনো সংকীর্ণতার আশ্রয় সেখানে নেই। বাংলা ভাষায় শব্দের অভাব দেখা দিলে কোন্ ভাষা থেকে সবপ্রথম শব্দ সংগ্রহ করব? বঙ্কিমের বক্তব্য, 'কর্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী, ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, অনেকে বুঝিতে পারে, ইংরেজি বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? 'মাধ্যাকর্ষণ' বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। 'গ্রাবিটেশন্' বলিলে ইংরেজি যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে।' অর্থাৎ, শ্যামাচরণের প্রবন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বক্তব্যগুলি দাড়াল এই রকম: তৎসম শব্দ থাকবে, প্রচলিত সকল তদ্ভব শব্দও গৃহীত হবে, এবং বাংলা শব্দের অভাবে ইংরেজি বা আরবী অপেক্ষা অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দও অধিক গ্রহণীয়। এতদ্ সত্ত্বেও 'সংস্কৃতপ্রিয়তা' ও 'সংস্কৃতানুকারিতা' যেমন বঙ্কিম কর্তৃক নিন্দিত, সেইরূপ আলালী ভাষাও তৎকর্তৃক আদর্শ ভাষা রূপে গৃহীত হয় নি।

প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 'বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।' বঙ্কিমের মতে সরলতা স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য এই তিনটি রচনার প্রধান গুণ। এই তিনটি গুণ যাতে সহজে প্রকাশ পায় তজ্জন্য লেখক উচ্চ বা সামান্য—যে কোনো রচনা-রীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। যদি আলালী রীতিই সে ক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য হয়, তবে তাই গ্রহণ করতে হবে; আবার বিদ্যাসাগরী রীতিই যদি

একমাত্র আবশ্যক হয় তবে সেই রীতি ভিন্ন অন্য কোনো রীতি সে ক্ষেত্রে গ্রহণীয় নয়। বঙ্কিমের ভাষায়, 'যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু-প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।'

সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বিদ্যাসাগরের যশে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু ঈর্ষালু ছিলেন।…সমসাময়িক শক্তিশালা গদ্যলেখকদিগের মধ্যে অনেকের প্রতিই তিনি অবিচার করিয়া গিয়াছেন।… আলালের ঘরের দুলালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও বোধকরি কতকটা বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষ প্রণোদিত।' বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমের নানা বিষয়ে যে কিছু বিদ্বিষ্ট মনোভাব ছিল তা আমাদের অজ্ঞাত নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র অবিচার করেছেন এমন কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। বরং 'আলালের ঘরের দুলালে'র রচয়িতা প্যারীচাঁদের 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি সম্পর্কে যেরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, তা উদ্ধৃত করলে, এ-বিষয়ে বোধকরি আর কোনো মতবিরোধের অবকাশ থাকে না।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই।'

বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্র্য ও কৃতিত্ব কোথায় তা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি বঙ্কিমকর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হলেও মনে রাখা আবশ্যক, এই গদ্যরীতিকে কখন তিনি বাংলা সাহিত্যের পক্ষে আদর্শ রীতি হিসেবে মতপ্রকাশ করেন নি। আলালী বা হুতোমি রীতিকেও বঙ্কিম কখন আদর্শ গদ্যরীতি হিসেবে স্বীকৃতি জানান নি।

এতক্ষণে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে আদর্শ রীতির লেখক কে?' অন্ততঃ বঙ্কিম-কল্পিত আদর্শ রীতির কাছাকাছি এসেছেন এমন ব্যক্তিটি কে? এই প্রশ্নের উত্তর কোথায়? সন্ধান করে বঙ্কিমের অভিমত পাওয়া গেল তাঁর ইংরেজিতে রচিত Bengali Literature শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে বলেছেন,

'One of the best masters of a pure and vigorous Bengali style—neither characterized by the somewhat pedantic purity of Vidyasagar, nor rough and homely like Tekchand and Hutam—one of the best masters, we say, of Bengali style is Babu Bhudeb Mukherji.'

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও এই রীতি অনুসরণে প্রয়াসী ছিলেন বলে মনে হয়।

১২

সেকালের ছড়া ছবি ও প্রহসনে বঙ্কিমচন্দ্র

সেকালে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক নানারকমের ছড়া ছবি ও প্রহসন রচিত হয়েছিল। কেউ ছড়া ও ছন্দে তাঁকে আক্রমণ করলেন, কেউ ব্যঙ্গাত্মক নাটক-প্রহসনে তাঁকে নায়কের আসনে বসিয়ে দিলেন, আবার কেউ বা অশালীন কার্টুন চিত্র অঙ্কন করে বঙ্কিম বিরোধিতায় উল্লসিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক পদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।'

শত শত ক্ষুদ্র শত্রুর সঙ্গে একা বঙ্কিমচন্দ্রের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে বলা বাহুল্য যিনি বিজয় গৌরব লাভ করেছিলেন তিনি সত্যদ্রষ্টা সমরকুশলী সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র। বর্তমান অধ্যায়ে বঙ্কিম-বিরোধী সেই বিজিত বিস্মৃত সৈনিকসম্প্রদায়ের কিছু তথ্যভিত্তিক পরিচয় দানের চেষ্টা করা যাবে।

কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ বঙ্কিমশত্রুদলের একজন বড় যোদ্ধা। 'বাউল শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী' ছদ্মনামে ইনি 'বঙ্গীয় সমালোচক' শীর্ষক একখানি ক্ষুদ্র 'কাব্য' রচনা করেছিলেন ১২৮৭ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থের নামপত্রটি এরকম : বঙ্গীয় সমালোচক / (কাব্য) / বাউল / শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী বিরচিত / বাবাজীর প্রবীণ চেলা কৃত টীকা / ও / দুইখানি চিত্র সমেত। / নিমতলা-গঙ্গাতীর। / সন ১২৮৭ সাল / মূল্য এক আনা। পুস্তিকাটি আঠারো পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, গ্রন্থশেষে লেখা, 'Printed at the Sudhakar Press, Bhowanipore.' নামপত্রেই লক্ষ্য করা গেছে গ্রন্থ মধ্যে দুটি চিত্র আছে। প্রথম চিত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে বানররূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। একটি ফলবান কাঁঠাল বৃক্ষ, বৃক্ষতলে একটি বানর বঙ্গদর্শন-পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান। কেতনে এইরূপ লেখা : আজ্ঞো পান্ত পাঠ করুন। / বঙ্গ। ভারত। স্বদেশ /

উন্নতি। সভ্যতা। স্বাধীনতা / সাহিত্য। বিজ্ঞান। দর্শন। দ্বিতীয় চিত্রের বক্তব্য, বানর কাঁঠাল খাচ্ছে এবং তার কোয়াগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রথম চিত্রটি কাব্যের গোড়াতেই মুদ্রিত হয়েছে। ছবির নীচ থেকে কাব্যের যথার্থ সূচনা। গ্রন্থ থেকে এখানে সামান্য কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

অথ সমালোচকাখ্য
বানরের রূপ বর্ণনা।

কাঁঠাল গাছের কাছে বানর বসিয়া আছে
[বসে কি দাঁড়ায়ে কেবা করিবে নির্ণয় ?]
কি বাহার মরে যাই ! চরণে পাদুকা নাই
চাপকানে অঙ্গঢাকা দেখে দুঃখ হয়।
মরি কি রূপের ছটা কোমর বন্ধক আঁটা
বিলোলিত লাঙ্গুলের কি সুষমা হায় !
শোভিয়া হৃদয় রাকা ও চাঁদ বদন বাঁকা
কলঙ্ক বিষম গোঁফ আঁকা আছে তায়।
জগতে ভাবিয়া তুচ্ছ ধরেছে হংসের পুচ্ছ
বাম হস্তে ধরিয়াছে যশের নিশান,
কি বাহার আদ্যোপান্তে দেখ বিদ্যমান !
সুশোভিত শিরস্ত্রাণ বর্ধিত করেছে মান
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা মরি নিশানের ভরে।
তুলনা মিলেনা আর ভারত ভিতরে॥

অথ সমালোচকের কীর্তি বর্ণনা।
(অথবা সমালোচনার নমুনা।)

কে লিখেছে—হেমচন্দ্র বলিহারি যাই,
এমন সুন্দর বই আর দেখি নাই॥
পদের লালিত্য হেন—শুধু তাই বলি কেন
ভাবের গৌরব আর সুন্দর সমাস
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।
এ গ্রন্থ অমূল্য বলি মিলটন যাও চলি
স্বর্গ মর্ত রসাতল—নরক সংসার
এক কালে এক গ্রন্থে প্রবেশ সবার।

এ কি বই ? কে লিখেছে ? সুহৃদ্ আমার ?
উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বলি—কি বলিব আর ?
দোষগুণ দুই(ই) আছে ; উচিত সবার কাছে
এক এক খানা রাখা ; মনোহর অতি,
কল্পনার প্রতিকৃতি মোহন মূরতি ।
এটি কার লীলা খেলা—গ্রন্থে নাম নাই
এই বার কি বলিব ভাবিতেছি তাই
বুঝিয়াছি প্রিয়তম অমুকাখ্যমিত্র মম
করেছেন এই চারু গ্রন্থ প্রণয়ন
তবে এ অবশ্য ভাল বুঝিনু এখন ।
আশা করি ভবিষ্যতে গ্রন্থকার এ ভারতে
প্রকাশিয়া নিজ নাম, যশের নিশান
উত্তোলিয়া লভিবেন অশেষ সম্মান ।

কবিতা পুস্তক

উপন্যাসে মজা লুটে কাব্যের বাজারে,
সুরসিক কোন কবি উঁকি-ঝুঁকি মারে ।
ইনি যে সমালোচক সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক
লিখেছেন বঙ্গদেশে বহু উপন্যাস ।
কবিতা পুস্তকে এঁর বিদ্যার প্রকাশ,
বিশ্বকর্মা শিল্পকর জগন্নাথে চরাচর
সহজেই বুঝিয়াছে ; ওগো সম্পাদক !
সব হ'লো বাকি কেন বাঙ্গালা নাটক ?

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বিধবার দাঁতে মিশি' সেকালের একখানি প্রহসন গ্রন্থ। প্রকাশ কাল ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮। এই প্রহসনটি সেকালের বঙ্কিম-বিদ্বেষ ও বিরোধিতার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রহসনটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের নামকরণ হয়েছে উডুম্বর চট্টোপাধ্যায়। কোথাও বঙ্কিমকে বঙ্কিমচন্দ্র নামে উল্লেখ করা হয় নি। তবে উডুম্বর চরিত্রটি যে বঙ্কিমকে ব্যঙ্গ করবার উদ্দেশেই চিত্রিত হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। পুস্তকের নামপত্রটি বাংলা ইংরেজি—দুই ভাষায় মুদ্রিত। বিধবার দাঁতে মিশি। / (দৃশ্য কাব্য) / শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় / প্রণীত। / **Bidhobar Dante Misee / By / Gopal Chundra**

Mukhopadhyaya, / Calcutta / Printed by G. C. Parial, at the Local Press. / No 38 Sooryparah Lane, Simlah. / All Rights Reserved / 1874.

শিবপুরের জমিদার কমলাকান্ত রায়, ভ্রাতুষ্পুত্র বরদাকান্ত, কমলাকান্তের বন্ধু সূর্যকুমার ও গোরাচাঁদ, বরদাকান্তের বন্ধু উড়ুম্বর চট্টোপাধ্যায়, বরদাকান্তের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া সৌদামিনী ও স্ত্রী হেমাঙ্গিনী, গোরাচাঁদের পত্নী যামিনী—এ'কজন নাট্য-গ্রন্থের প্রধান প্রধান চরিত্র। পুরুষ চরিত্রের মদ্যপান নীচতা চরিত্রহীনতা ও অপর-দিকে নির্যাতিতা নারীচরিত্রগুলির কাহিনী অবলম্বনে রচিত প্রহসন হল 'বিধবার দাঁতে মিশি'। গ্রন্থটি পাঁচটি অঙ্কে সম্পূর্ণ। প্রথম অঙ্কে আছে দুটি গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কেও দুটি, আর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম—এই তিনটি অঙ্কেই আছে তিনটি করে গর্ভাঙ্ক। রুচির কারণে সমগ্র গ্রন্থের কাহিনী আলোচনা থেকে আমরা বিরত থাকলাম। এই নাট্যগ্রন্থে আমাদের একমাত্র প্রয়োজন উড়ুম্বর চট্টোপাধ্যায়কে। বঙ্কিমচন্দ্রকে যে সেযুগে কত কণ্টক বাধা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছিল তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে বর্তমান প্রহসনটিতে। একটা যুগের দুর্বল শক্তিহীন অযোগ্য কিছু মানুষের পরিচয়ও সঞ্চিত হয়েছে এই শ্রেণীর বিদ্বেষপ্রসূত রচনাসমূহের মধ্যে। আমরা এখানে 'বিধবার দাঁতে মিশি' প্রহসনের প্রথম অঙ্ক থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

উড়ুম্বর। গুডনাইট বরদা বাবু!

গোরাচাঁদ। আইয়ে ইণ্ডিয়ান সার ওয়ালটার স্কট!

উড়ু। কেন আর জ্বালাও বাবা?

গোরা। আর একবার বল, দোহাই ইণ্ডিয়ান স্কট।

উড়ু। আমি তোমার কি করেছি, তা একশবারি তামাসা কোচ্চ?

গোরা। আজকাল তুমি কল্পনা কামিনীর সঙ্গে প্রেম করে, বঙ্গভাষা রূপ বীর্য দ্বারা যেসব ছেলে মেয়ে উৎপাদন কোচ্চ, তাতে আমি কেন? —ইণ্ডিয়ার সকলেই ত তোমারে ইণ্ডিয়ান ওয়ালটার স্কট বলে সম্ভাষণ কোচ্চে, কেবল আমার ওপর ঝাল ঝাড়লে কি হবে? হয় কল্পনা বারবিলাসিনীর প্রেমে বিসর্জন দাও, নয় সকলে তোমাকে ইণ্ডিয়ান ওয়ালটার স্কট' বলে ডাকুক, তাতে তুমি ন্যাজ ফুলিও না।

বরদাকান্ত। কেন ভাই! উড়ুম্বর বাবু যে ক'খানি পুস্তক রচনা করেছেন, সবগুলিই ত উত্তম।

গোরা। উত্তম? উত্তমের উত্তম, অত্যুৎকৃষ্ট, রাম, দুর্গা, মহাভারত।

বরদা। বিশে—

(নেপথ্যে আজ্ঞা যাই)

বরদা। তুমি যাই বল, আজকাল যে-কজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন কোচ্চেন, তার মধ্যে কেউই এ পর্যন্ত উড়ুম্বর বাবুর সমকক্ষ হতে পারেন নাই। বিশেষ রহস্য রচনা বিষয়ে উড়ুম্বর বাবু অদ্বিতীয়।

গোরা। আমিও তো সেইজন্যে ওঁকে ইণ্ডিয়ান ওয়ালটার স্কট বলি। আর উড়ুম্বর বাবুর রসবোধ বিষয়ে তোমারে বলে জানতে হবে কেন? বাঙ্গালার সকলেই তো বলে যে, উড়ুম্বর বাবুর রচনা ঠিক ঢাকার সদর রাস্তার মত।

(ডিকেণ্টর প্রভৃতি লইয়া বিশুর প্রবেশ ও বাবুদের নিকট রাখিয়া প্রস্থান।)

বরদা। (মদ্যপান) সে কিরকম গোরাচাঁদবাবু?

গোরা। তাও বুঝতে পাল্লে না; ঢাকার সদর রাস্তার মধ্যে যেমন এক একটি বাড়ির অন্তরে, কোথাও বা বাড়ির গায়ে গায়ে এক একটি সুরামন্দির আছেই আছে, সেইরূপ উড়ুম্বর বাবুর প্রত্যেক পুস্তকের—প্রত্যেক পরিচ্ছেদের মধ্যে একটি না একটি রসকুণ্ড আছেই আছে। (মুখের কাছে হাত নাড়িয়া)—

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।
উড়ুম্বরের রসকুণ্ড রাসভরঞ্জন।

উড়ু। কবি হয়েছ যে? (মদ্যপান)

গোরা। হব না কেন? আজকাল রামা মুর্দফরাস থেকে সেরাজদ্দৌলা পর্যন্ত সকলেই যখন কবি হচ্চে, তখন আমিই বা কেন বাকি থাকি?

উড়ু। নিজের ঘট থেকে কিছু বায় করতে পার, তবে বলি যে, হাঁা একজন কবি বটে।

গোরা। (হাস্য) বড় কথাটাই মনে করে দিলে; অক্ষয় বাবুর তৃতীয় ভাগ চারুপাঠের ধর্মবিষয়ক স্বপ্নটি যদি সত্য হত, তাহলে এত দিনে ধর্মপুরুষের ধর্মদণ্ডের জ্যোতিঃ তোমার কালির আকরগুলি সব জ্বালিয়ে দিয়ে বাহাদুরী বের করে দিত। (মদ্যপান)

বরদা। কেন আর উড়ুম্বর বাবুকে রাগাচ্চ? উনি নাকি আমাদের ইণ্টিমেট ফ্রেণ্ড তাই কিছু বলচেন না, অন্য হলে টের পেতে। (মদ্যপান)

গোরা। তুমি ত কিছু বোঝ না। হক কথা বললে, বিধিরও সাধ্য নাই যে, কোন কথা বলে, মিথ্যে কথা হলে উড়ুম্বর এতক্ষণ ন্যাজ ফোলাতে কসুর করতেন না।

বরদা ও সব কথা এখন রেখে দাও। উড়ুম্বর বাবু নাও। (মদের গেলাস দান)

উড়ু। (গেলাস ধরিয়া) নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে। (হাস্য ও মদ্যপান)

গোরা। ব্রেভো ইণ্ডিয়ান স্কট। (করতালি দান) ও সুবুদ্ধি মশায়। প্রাতঃ প্রণাম। ন্যাজটা ভাল করে গুটিয়ে বসুন, সব বুদ্ধি বেরিয়ে গেলে, রচনা করবার মুস্কিল হবে।

একসময় বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে কিছু মত-বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়কে কেন্দ্র করে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের মতামত সম্পর্কে কিছু তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও এ প্রসঙ্গটি স্বীকার করে গেছেন তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ নামক গ্রন্থখানির মধ্যে। বঙ্কিম লিখেছেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহু-বিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন।' তৎকালীন সমাজে এর কিছু প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছিল। সেই প্রতিক্রিয়ার চিত্র বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থটি থেকে সংগ্রহ করা যায়। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলছেন, 'জানি, শিক্ষিত সমাজ বিদ্যাসাগরের ভাষা অথবা জীবনের কোনও প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা কখনও সহ্য করিতে পারে নাই। বঙ্কিম তাঁহার বঙ্গদর্শনে ভারতচন্দ্রের ও বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন।' তৎকালীন 'হালিসহর পত্রিকা' নামক একখানি কাগজ বঙ্কিমকে কি ভাবে 'নাস্তানাবুদ' করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোক্ত ছড়াটিতে।—

কভু বা ব্যাসের মাথা চিবাইয়া খেয়ে
নাচিতেছে যাদুমণি হাততালি দিয়ে।
যারে পায় তারে ধবে দিগাদিগ্‌ নাই,
বাহবা বুকের পাটা বলিহারি যাই!
আবোল-তাবোল বকে সকলই নীরস,
সাগরে সাঁতার দিতে করেছে সাহস।
কালো চোখে কচি খোকা পরিয়া কাজল
আপন রূপেতে হন আপনি পাগল।

ঈশ্বরচন্দ্রেতে দিতে কলঙ্কের রেখা,
সেদিন শহরে আসি দিয়াছিল দেখা।
ভারতের মধুমাখা কবিতা লহরী
অনা'সে ফেলিল ছিঁড়ে আব্দার করি।
এখন 'ছিঁড়িব' বলি পড়িয়াছে ধূম।
আয় আয় আয় বঙ্গদর্শনের ঘুম॥

বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর বিরোধকে কেন্দ্র করে আরো কিছু কবিতার নিদর্শন পাওয়া যায়, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্যারীমোহন কবিরত্নের 'গীতাবলী' গ্রন্থখানির মধ্যে। বিদ্যাসাগরের ভক্ত প্যারীমোহন বিভিন্ন আসরে বঙ্কিমের নামে ছড়া বেঁধে যে-সকল গান গাইতেন তারই একটি—

বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার,
এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কা'র ?
অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন,
          সমালোচন কেন তা'র ?
পদে পদে দেখতে পাই,
কর্মকর্তা বোধ নাই,
ভাব রসের মা গোঁসাই,
কেন লেখার ছল ধরে ?
দুটো একটা গল্প লিখে,
রাধাকৃষ্ণ বলতে শিখে,
          ধরাটাকে সরাসম জ্ঞান করে।
এ আস্পর্দ্ধা কব কারে
গোষ্পদ বলে না যারে
          ডাগর সাগরে খোঁচা দিতে
               ভয় হলো না তার ?
হতেন যদি কূপ কি ডোবা,
তা' হ'লেও ত পেতো শোভা,
          নদ নদী মধ্যে খুঁজে মেলা ভার।
এখন গ্রন্থকর্তা ঘরে ঘরে,
Editor বহু নরে,

কিন্তু কলম যে কিরূপে ধরে তা অনেকে জানে না।
ভূষিমাল গদাভরা
ভেতরেও ময়লা পোরা,
কাগজগুলা কেবল ভাল
Binding পরিপাটি ,
একখানা বিকোয় না দেশে,
মসলা বান্ধে অবশেষে,
তবু কত সর্বনেশে,
কলম ধরতে ছাড়ে না।
আঁতি যাচ্ছে তাই,
যা' দেখতে পাই,
'সাগর' বৈ কে লিখতে জানে,
কা'র লেখায় কি উপকার ?
'হুতোম প্যাঁচা' বলে ছিল,
(বলতে বলতে মনে হলো)
বেওয়ারিশ বাঙ্গালা ভাষা,
যা'র যা ইচ্ছা তাই করে।

শুধু লেখার মধ্যে নয়, পুরাতন পত্রিকার পৃষ্ঠায় শিল্পীর আঁকা কার্টুন চিত্রের মধ্যেও ইতিহাসের তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে যে ছবিটির কথা উল্লেখ করছি সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজি পাঞ্চের (Punch) অনুসরণে 'বসন্তক' (১২৮০-১২৮২) নামক একখানি পত্রিকায়। পত্রিকাটিতে প্রতি সংখ্যায় পৃষ্ঠাব্যাপী অনেক ছবি থাকত। গিরীন্দ্রনাথ দত্তের আঁকা এই সকল ছবির মধ্যে একখানি চিত্রের নাম 'The Bull and the Frog'। ঈশপের গল্পের অনুসরণে চিত্রটি পরিকল্পিত। এই ছবিতে বুড়ো ব্যাঙটির গায়ে 'বঙ্গদর্শন' আর দুই শিঙ্-বিশিষ্ট বলিষ্ঠ ষণ্ডটির গায়ে 'বিদ্যাসাগর' নাম চিহ্নিত আছে। ছবিতে বুড়ো ব্যাঙ্ বলছে, 'এত গবল গায়ে ছেড়ে দিলাম তবুও কিছু হোল না. রোস আমি ফুলে ওর সমান হোচ্ছি। দেখ দেখি ওর মতন হইনি ?' এর উত্তরে 'দলস্থ খুদে খুদে বেংচয়—বাহবা বাহবা আর একটু ফুলিলেই হবে।' বুড়ো ব্যাঙ্‌টি তো হল বঙ্গদর্শন, কিন্তু খুদে ব্যাঙের দলটি কাদের নিয়ে ?

'বসন্তকে'র যে সংখ্যায় ছবিটি মুদ্রিত হয়েছিল, তার ঠিক পরের সংখ্যাতেই

অর্থাৎ নবম সংখ্যায় এই ছবি সম্পর্কে কিছু মন্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পত্রিকায় বলা হয়েছে, 'আমাদিগের পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, শিবের অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গি, কৃষ্ণের স্বদাম ছিদাম, রামের অনুচর নল, নীল, গয়গবাক্ষ, আপনি বঙ্গদর্শনের নিকট কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুচর ভেকনৃত্য করিতেছে লিখিয়াছেন, এ অনুচর ভেক-গুলি কে? এ অনুচরগুলি মহাপ্রভু রাম প্রভৃতির অনুচর অপেক্ষা সামান্য ব্যক্তি নন। ইঁহাদের দুইজন জাগ্রত হইয়াছেন। এব সকলে সত্বর জাগ্রত হইবেন। এই দুইজনের নাম সাধারণী ও ভ্রমর।' উভয় পত্রিকাই বঙ্কিম-সহায়তাপুষ্ট। 'সাধারণী'র সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার আর বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র কর্তৃক 'ভ্রমর' পত্রিকাটি সম্পাদিত হয়েছিল।

এতগুলি সাক্ষ্যের মধ্য থেকে দেখা গেল সেযুগে বঙ্কিমচন্দ্র কতরকমভাবে কত বিভিন্ন শ্রেণীর শত্রুর হস্তে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই আক্রমণ ও উপদ্রবের অনেক আঘাত বঙ্কিমচন্দ্রকে সহ্য করতে হয়েছে সত্য, কিন্তু বঙ্কিম-মহিমাকে ম্লান করবার মত শক্তি সেযুগে কারোরই ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর এই শত্রুসম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনো দিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই।'

১৩

বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মকথন ঃ স্রষ্টার চোখে সৃষ্টি

নিজের জীবন ও তার নিজের সৃষ্ট সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত কি?

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রমেশচন্দ্র দত্তকে বলেছিলেন, 'আমার জীবনী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যেন রচিত না হয়।' সে-স্থলে সুদীর্ঘ আশি বৎসরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত। তথাপি তাঁর জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও পর্যন্ত রচিত হল না।

প্রায় বছর পনের পূর্বে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী রচনায় একবার উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সে-কাজ শেষ পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ করেন নি। এ-কারণে তাঁর প্রতি পাঠকের অনুযোগ কম নয়। প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'বঙ্কিমসরণী' গ্রন্থটি রবীন্দ্রবাবুকে উৎসর্গ করে ভূমিকায় বলেছিলেন, 'শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'কথাসাহিত্যে' বঙ্কিমজীবনী লিখতে আরম্ভ করলে অনেকেই আশ্বস্ত হয়েছিল—এতদিনে বঙ্কিমচন্দ্রের একখানা নির্ভরযোগ্য জীবনী পাওয়া যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে তাঁর কলম কালিদাসের মেঘের চেয়েও মন্থরতর।… সুহৃদের এই অনুযোগেও যে রবীন্দ্রবাবুর কলম ত্বরান্বিত হয়ে উঠবে এমন ভরসা নেই।'

বঙ্গদর্শনের অন্যতম লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমের জীবৎকালেই তাঁর জীবনের উপকরণ সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শ্রীশচন্দ্র বঙ্কিমকে বলেছিলেন, 'আমার ইচ্ছা আপনার জীবনী সম্বন্ধে কতক কতক নোট এখন হইতে সংগ্রহ করি। আপনি কিছু কিছু নোট দিতে পারেন কি?' বঙ্কিমচন্দ্র তখন হাস্য-সহকারে কথাটি একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। রসিকতা করে বলেছিলেন, 'আমার জীবন অসার, তা লিখিয়া কি হইবে?'

বঙ্কিমচন্দ্র জীবৎকালে তাঁর কোনো জীবনী রচনায় উৎসাহ দেন নি, মৃত্যুর তিন

দশকের মধ্যে তাঁর কোনো জীবনী রচিত হোক চান নি এবং নিজেও কোনো আত্মবিবরণী লিখে যান নি।

আমরা এখানে বঙ্কিমের আত্মকথা সংগ্রহের চেষ্টা করলাম—এবং তা কেবল তাঁর নিজের সাহিত্য-প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত প্রথম গ্রন্থ—ললিতা পুরাকালিক গল্প তথা মানস, প্রকাশকাল ১৮৫৬, কিন্তু রচিত হয়েছিল তিন বৎসর পূর্বে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমের কিছু মন্তব্য পাই তাঁর ওই গ্রন্থের ভূমিকাতেই। পরে ১৮৭৮-এ প্রকাশিত কবিতাপুস্তক এবং ১৮৯১-এ প্রকাশিত গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক গ্রন্থের ভূমিকাতেও স্বীয় রচিত কবিতা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য পাই।

প্রথম কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিম লেখেন, 'অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়।' বঙ্কিম জানিয়েছেন, 'তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন।' এই গ্রন্থ প্রকাশে লেখক সম্ভবতঃ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন না। তার প্রথম কারণ গ্রন্থটি রচনার পর তিন বৎসর অপ্রকাশিত ছিল। বঙ্কিম বলেছেন, 'তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না।' ১২৯১ বঙ্গাব্দে বঙ্কিম 'প্রচারে' লিখেছিলেন, 'যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছু কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।' দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমের প্রথম গ্রন্থই লেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করা হয় নি—রচনার পর দীর্ঘ তিন বৎসর ফেলে রাখা হয়েছিল। পরে বঙ্কিম উক্ত কাব্যগ্রন্থটি তাঁর 'কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধু'কে পড়ে শোনান। প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীও প্রকাশের পূর্বে কয়েকজনকে পড়ে শোনানো হয়েছিল। যাই হোক, সুহৃদ্বর্গের অনুরোধে ও আগ্রহে ললিতা ও মানস প্রকাশিত হয়।

যে কাব্য তিন বৎসর পূর্বে রচিত এবং যা তিন বৎসর পর মুদ্রিত—সেই কাব্য কি পরিমার্জিত হয়ে প্রকাশিত হল—না কি অসংশোধিতরূপেই মুদ্রিত হল? বঙ্কিমের সমগ্র জীবনের প্রবণতা দেখে মনে হয় না যে সে-রচনা অসংশোধিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ললিতা ও মানস কোনো সাময়িকপত্রে নয়,

গ্রন্থাকারেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ফলে মূল রচনা গ্রন্থপ্রকাশকালে সংশোধিত হয়েছিল কি না প্রত্যক্ষভাবে জানবার উপায় নেই।

'কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধু' কে? এ কথার সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে দুজনের নাম আমার মনে হয়। এক দীনবন্ধু মিত্র, দুই দ্বারকানাথ অধিকারী। এঁরা দুজনেই বঙ্কিমের কৈশোরের সুহৃৎ, কাব্যযুদ্ধের সৈনিক এবং সুরসজ্ঞ তো বটেই। সৈনিক বললাম এই কারণে যে, 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় যে তিন জন কবিযোদ্ধা 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে' অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ অধিকারী।[১]

ললিতা ও মানস ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হলেও সে-গ্রন্থ যে ১৮৫৬-তে রচিত নয়—এ কথা বঙ্কিম তাঁর ভূমিকায় পাঠককে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। শচীশচন্দ্রের লেখা জীবনী থেকে জানতে পাই দুর্গেশনন্দিনীও প্রকাশের দু-তিন বৎসর পূর্বেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু এ সংবাদ দুর্গেশনন্দিনীর ভূমিকায় নেই। অথচ ললিতা ও মানসের ভূমিকায় রচনাকালের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় বঙ্কিম তাঁর কবিতাগুলির উৎকর্ষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে সুহৃদেরা অবশ্যই উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমের একেবারেই আগ্রহ ছিল না—এ কথা কি জোর করে বলা যায়? প্রথম পুস্তক প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা থাকাটাই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া বঙ্কিম নিজেও কবিযশঃপ্রার্থী ছিলেন। ১৮৫২ থেকেই সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় তিনি কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৫২ থেকে '৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর রচিত বহু কবিতা 'সংবাদ প্রভাকরে' মুদ্রিত হয়, 'সমাচার দর্পণে'ও তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং বন্ধুবর্গের অনুরোধ থাকলেও, তাঁর নিজেরও যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহ ছিল—তা অনুমান করা যায়।

বঙ্কিম তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'গ্রন্থকার স্বকর্মার্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনাজনিত তাবৎ লিপি-দোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।' অর্থাৎ এই গ্রন্থের যদি কোনো লিপিদোষ থাকে তবে তা 'অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনাজনিত'। এর থেকে মনে হয়, (ক) বঙ্কিম তিন বৎসর পূর্বে যে কাব্যখানি লিখেছিলেন তা সংশোধন না করেই ছাপান, (খ) সংশোধন করা হলেও সে রচনা সম্পূর্ণ মনঃপুত না হওয়ায় অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের রচনা বলেই প্রচার করেন। অর্থাৎ আঠার

১ কৈশোরে কবিতাযুদ্ধ শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বৎসর বয়সে যে-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সেই গ্রন্থ পঞ্চদশবর্ষীয় কবির রচনা বলে বিজ্ঞাপিত হল। রজনী উপন্যাস ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক মুদ্রিত হয় ও পরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও রজনী উপন্যাস ১৮৭৪-৭৫এ রচিত হয়েছিল বলা যায়। কিন্তু যে রচনা সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত না হয়ে সরাসরি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, সে-রচনা যবেই রচিত হোক না কেন পুস্তকের প্রকাশকাল অনুসরণেই কবিকে বিচার করতে হয়। তিন বৎসর পূর্বের রচনা বলে কেউ অধিকতর সহানুভূতি পাবার অধিকারী হতে পারেন না বা ইতিহাসগ্রন্থে তাঁর নাম তিন বৎসর পূর্বের পাতায় লিপিবদ্ধ হতে পারে না।

তবে কি এখন বঙ্কিমের ললিতা ও মানস কাব্যগ্রন্থকে তাঁর অষ্টাদশ বৎসরের রচনা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে?

এমন কি হতে পারে যে এটি বঙ্কিমের অষ্টাদশ বৎসরেরই রচনা, প্রথম গ্রন্থ—ভয় ও দ্বিধা স্বাভাবিক; এবং সেই কারণেই স্বীয় গ্রন্থকে 'অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের' রচনা বলে প্রচার করেছেন—যদি কোনো কঠিন সমালোচনা হয় আত্মরক্ষার কিছু উপায় থাকবে।

ললিতা সুদীর্ঘ কবিতা, কিন্তু মানস তত দীর্ঘ নয়। সাময়িকপত্রে ললিতার মত একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশের সুযোগ বঙ্কিম নাও পেয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু মানস সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় নি কেন? বঙ্কিম এই দুটি কবিতার রচনাকাল ১৮৫৩ বলেছেন। সেই সময় তাঁর বহু কবিতা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল—এ-কথা পূর্বে বলেছি। তাহলে মানস ১৮৫৩-য় রচিত হয়েও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হল না কেন? অথচ আমরা দেখেছি মানসের ন্যায় দীর্ঘ কবিতা সে-সময় বঙ্কিম আরও লিখেছিলেন যা 'সংবাদ প্রভাকরে'র পাতায় মুদ্রিত হয়েছিল।

ললিতা ও মানস প্রকাশের পর 'সংবাদ প্রভাকরে' ১৮৫৬-র ৩০ জুন যে বিজ্ঞাপন বেরোয় তাতেও গ্রন্থটি তিন বৎসর পূর্বের রচনা বলে উল্লেখ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার লেখেন, 'অন্য কবিতাগুলি সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে দুইটি বাল্যরচনা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, তাহার কোন মার্জ্জনা নাই। ঐ কবিতাদ্বয়ের কোন গুণ নাই। ইহা নীরস, দুরূহ, এবং বালক-সুলভ অসার কথায় পরিপূর্ণ। যখন আমি কলেজের ছাত্র, তখন উহা প্রথম প্রচারিত হয়। পড়িয়া উহার দুরূহতা দেখিয়া, আমার একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, 'ওগুলি হিয়ালি।' অধ্যাপক মহাশয় অন্যায় কথা বলেন নাই। ঐ প্রথম সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না—

অনেক কপি আমি স্বয়ং নষ্ট করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার অনেকগুলি বন্ধু, আমার প্রতি স্নেহবশতঃ ঐ বাল্যরচনা দেখিতে কৌতূহলী। তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যর্থই এই দুইটি কবিতা পুনর্মুদ্রিত হইল।'

গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থেও ললিতা ও মানস পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কবিতারম্ভের পূর্বে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে বঙ্কিম লিখেছেন, 'এই কবিতাগুলি লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়। লিখিত হওয়ার তিন বৎসর পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারীতেই পচে—বিক্রয় হয় নাই। তাহার পর আর এ সকল পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্য বিবেচনা করি নাই, এখনও আমার এমন বিবেচনা হয় না যে, ইহা পুনর্মুদ্রিত করা বিধেয়। বাল্যকালে কিরূপ লিখিয়াছিলাম, তাহা দেখাইয়া বাহাদুরী করিবার ভরসা কিছুমাত্র নাই; কেন না, অনেকেই অল্প বয়সে এরূপ কবিতা লিখিতে পারে। যাহা অপাঠ্য, তাহা বালকপ্রণীত হউক বা বৃদ্ধপ্রণীত হউক, তুল্যরূপে পরিহার্য। অতএব কিছু পরিবর্তন না করিয়া ললিতা নামক কাব্যখানি পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। মানস নামক কাব্যখানিতে পরিবর্তন বড় সহজ নহে, এ জন্যে সে চেষ্টা করিলাম না। তথাপি সামান্যরূপ পরিবর্তন করা গিয়াছে।'

কোন্ কবিতায় কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে তার নিদর্শন দেখা যেতে পারে।

পরিবর্তন দুই রকম: এক পরিবর্জন, দুই রূপান্তর। ললিতার পরিবর্জন ও পরিমার্জন দুইই বেশি, মানসে কম। ললিতায় একটি চরণ ছিল, 'কোন কীট গতায়াতে নাড়া দেয় বনে।' হয়েছে, 'কোন কীট যায় আসে নাড়া দিয়ে বনে।' কিংবা প্রথমে ছিল, 'যেন কোন স্বপ্নে দেখা মত শোভাময়'; পরিবর্তে হয়, 'যেন কোন স্বপ্ন-দৃষ্ট মত শোভাময়'। পরিবর্জনের একটি উদারণ দিই মানস থেকে। কাব্যের প্রথম চারটি চরণের পরেই বারটি চরণ ছিল যা পরে পরিত্যক্ত হয়। সেই অংশ—

একমাত্র সুখ মম ছিল যে সংসারে,
আঁধার জীবনাকাশে একাকিনী তারা।
একবার জ্বলিয়ে সে মিশেছে আঁধারে,
সংসার জন্মেরি মত হইয়াছে সারা॥
যেতে যদি চিহ্ন মাত্র রাখিয়ে আমায়।
ভিজাতেম আঁখি জলে, বুকে করি তায়॥

অনিবার দহে হৃদি একই যাতনা।
সে যেন জীবন মাঝে, একই ঘটনা॥
হৃদয় কুসুম যারা ভাবিত আমায়।
কে জানে কেন রে আর, ফিরিয়া না চায়॥
তবু যে বাসিত ভাল মুছাতো নয়ন।
তাহারো হয়েছি বিষ কপাল যেমন॥

বঙ্কিম পরিণত বয়সে যে-সকল কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কি?

কবিতাপুস্তকের ভূমিকায় বঙ্কিম লেখেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে কিছু অভাব থাকুক, গীতিকাব্যের অভাব নাই। বিদ্যাপতির সময় হইতে আজি পর্যন্ত, বাঙ্গালী কবিরা গীতিকাব্যের বৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন। এমন সময়ে এই কয়খানি সামান্য গীতিকাব্য পুনর্মুদ্রিত করিয়া বোধ হয় জনসাধারণের কেবল বিরক্তিই জন্মাইতেছি। এ মহাসমুদ্রে শিশিরবিন্দুনিষেকের প্রয়োজন ছিল না। আমারও ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই এতদিন এ সকল পুনর্মুদ্রিত করি নাই।

তবে কেন এখন এ দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম? একদা বঙ্গদর্শন আপিসে এক পত্র আসিল—তাহাতে কোন মহাত্মা লিখিতেছেন যে, বঙ্গদর্শনে যে সকল কবিতা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। তিনি সেই সকল পুনর্মুদ্রিত করিতে চাহেন। অন্যে মনে করিবেন যে, রহস্য মন্দ নহে। আমি ভাবিলাম, এই বেলা আপনার পথ দেখা ভাল, নহিলে কোন দিন কাহার হাতে মারা পড়িব। সেইজন্য পাঠককে এ যন্ত্রণা দিলাম। বিশেষ, যাহা প্রচারিত হইয়াছে, ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহার পুনঃপ্রচারে নূতন পাপ কিছুই নাই। অনেক প্রকার রচনা সাধারণ সমীপস্থ করিয়া আমি অনেক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি; শত অপরাধের যদি মার্জনা হইয়া থাকে, তবে আর একটি অপরাধেরও মার্জনা হইতে পারে।

কবিতাপুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্য প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে, *এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কি না, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয়বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের

ব্যবহারই ভাল। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য। নহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা একপ্রকার সং সাজিতে বসা। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণ স্বরূপ তিনটি গদ্য কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। অনেকে বলিবেন, এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই। সে কথায় আমার আপত্তি নাই। আমার উত্তর যে, এই গদ্য যেরূপ কবিত্বশূন্য, আমার পদ্যও তদ্রূপ। অতএব তুলনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না।'

কবিতাপুস্তক প্রকাশের তের বৎসর পর উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক নামে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ভূমিকায় বঙ্কিম লেখেন, 'বাঙ্গালা কবিতা পুনর্মুদ্রিত করিবার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চাহিতে হয়। তবে সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক অপরাধ করিতেছেন, সে সকল পাঠক যদি ক্ষমা করেন, আমার এ অপরাধও ক্ষমা করিবেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের পর উক্ত গ্রন্থ 'আইভ্যানহো'র ছায়াবলম্বনে রচিত বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছিলেন। এ বিষয়ে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য কি তা আমরা সংগ্রহ করতে পারি। কালীনাথ দত্তকে বঙ্কিম বলেছেন, 'Ivanhoe-র ছায়া লইয়া দুর্গেশনন্দিনী রচিত হয় নাই।' শ্রীশ মজুমদারকে বলেছেন, 'দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে আইভ্যানহো পড়ি নাই।' চন্দ্রনাথ বসুকে বঙ্কিম বলেছিলেন, 'দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার আগে আইভ্যানহো পড়ি নাই।'

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু উপন্যাসটি রচিত হয় কোন্ সময়? শ্রীশচন্দ্রকে বঙ্কিম বলেছেন, 'আমি যখন দুর্গেশনন্দিনী লিখি তখন আমার বয়স ২৪ বৎসর।' অর্থাৎ গ্রন্থ প্রকাশের তিন বৎসর পূর্বে ১৮৬২-তে বঙ্কিম উপন্যাস রচনায় হাত দেন।

রাজসাহী কলেজের শিক্ষক লোকনাথ চক্রবর্তী বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছিলেন দুর্গেশনন্দিনীর পরবর্তীকালের সংস্করণে বিদ্যাদিগ্‌গজকে নূতন রূপ দেওয়া হয় কেন? বঙ্কিমচন্দ্র জানান যে এক শ্রেণীর অনুকরণপ্রিয় লেখক বিদ্যাদিগ্‌গজ চরিত্রের নামে বঙ্গসাহিত্যে অশ্লীলতা আনছে। তাঁদের মুখ বন্ধ করার জন্যই তাঁকে উক্ত চরিত্রের কোনো কোনো স্থল নূতন করতে হয়েছে।

পরিবর্তন কিরূপ?

উদাহরণস্বরূপ একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ

পরিচ্ছেদের নাম 'আশমানির প্রেম'। এই অংশে দিগ্‌গজ ও আশমানির কাহিনী রীতিমত পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তন করে বঙ্কিম কি লিখেছেন তা তো আমরা তাঁর প্রচলিত সংস্করণেই পাচ্ছি। কিন্তু প্রথমে কি ছিল—যা অবলম্বনে কোনো কোনো অনুকরণপ্রিয় লেখক বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতা বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন? 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণের 'আশমানির প্রেম' অধ্যায় থেকে বর্জিত অংশের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি—

'কই সুন্দরি অধরসুধা কই?'

'মর আগে হাত মুখ মোছ্‌।'

ব্রাহ্মণ ত্রস্ত হইয়া কোঁচায় হাত মুখ পুঁছিতে লাগিলেন। সাড়ে চারি হাত ধুতির কোঁচা তাঁহার মুখ পর্যন্ত তুলিলে কাপড় পরা বৃথা হয়,—তা কি করেন?

'এখন সুন্দরি?'

'এদিকে আইস।' দিগ্‌গজ আশমানির কাছে গিয়া বসিলেন।

'মুখের কাছে মুখ আন।' দিগ্‌গজ আশমানির মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

'হাঁ কর।' যা বলে তাই, দিগ্‌গজ আধ হাত হাঁ করিলেন। আশমানি রুমাল হইতে একটি তাম্বুল লইয়া চর্বণ করিতে লাগিল। দিগ্‌গজ হাঁ করিয়াই রহিলেন।

পাণ চিবাইয়া পাণের পিক এক গাল পরিপূর্ণ হইলে আশমানি সেই সমুদায় ছেপ্‌ দিগ্‌গজের হাঁর ভিতর নিক্ষেপ করিল।'

প্রথম সংস্করণে এছাড়াও দিগ্‌গজের আরও অনেক প্রসঙ্গ আছে যা বঙ্কিম পরে পরিবর্তন করেন। এখানে সে-সকল পরিবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ সম্ভব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে দুর্গেশনন্দিনীর তেরটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শচীশ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত হিসাব থেকে জানা যায় সেই সময় দুর্গেশনন্দিনী পুস্তকের মোট বিক্রয় সংখ্যা ছিল ১২৫০০ কপি। এই গ্রন্থের একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। শচীশ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দুর্গেশনন্দিনীর একাদশ সংস্করণ মুদ্রিত হয়ে ঘরে এলে বঙ্কিম বলেছিলেন, 'এই পুস্তকখানির লোকে যত নিন্দা করিয়াছে তত আর কোন পুস্তকের করে নাই; তাই এ পুস্তকের বিক্রি বেশি।'

দুর্গেশনন্দিনী প্রথম প্রকাশিত হলে নিন্দা প্রশংসা দুই-ই যথেষ্ট পরিমানে হয়েছিল।[২]

২ দুর্গেশনন্দিনী : সমকালীনের চোখে শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কপালকুণ্ডলা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হলেও এর অনেক পূর্ব হতেই যে বঙ্কিম এই উপন্যাসের পরিকল্পনা করছিলেন তা তাঁর উক্তি থেকেই জানতে পারা যায়। ১৮৬০-এর নভেম্বরে বঙ্কিম মেদিনীপুরের নেগুঁয়া, বর্তমানে কাঁথি মহকুমা থেকে খুলনায় বদলি হন। এখানে তিনি ১৮৬৪-র ৪ মার্চ পর্যন্ত ছিলেন। খুলনায় আসার কিছুকাল পর একদিন বন্ধু দীনবন্ধু মিত্র এলে বঙ্কিম তাঁকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেই প্রশ্নটি প্রমাণ করে যে বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস প্রকাশের পূর্বেই কপালকুণ্ডলার কাহিনী চিন্তা করছিলেন।

বঙ্কিম দীনবন্ধুকে যখন প্রশ্নটি করেন তখন বঙ্কিম-অনুজ পূর্ণচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিম কি প্রশ্ন করেছিলেন পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেকথা আমাদের জানিয়েছেন।

বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করেন, 'যদি শিশু কাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিতা হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ-সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে ও তাহার উপর কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?'

বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রীশ মজুমদার বলেছিলেন, সকলে কপালকুণ্ডলাকেই সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস বলে থাকে। এ বিষয়ে স্বয়ং ঔপন্যাসিকের অভিমত কি? এর উত্তরে বঙ্কিম বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, কাব্যাংশে খুব উঁচু বটে।'

শ্রীশচন্দ্রকে বঙ্কিম আরও জানিয়েছে, 'কপালকুণ্ডলা লেখার সময় শেক্সপীয়র বড় পড়িতাম।' এর প্রমাণ উপন্যাসের মধ্যে আছে। কপালকুণ্ডলা গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদেব শীর্ষে যে উদ্ধৃতি আছে, তার মধ্যে শেক্সপীয়র থেকে ছয়টি উদ্ধৃতি দেখতে পাই। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই Comedy of Errors থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে King Lear, অষ্টম পরিচ্ছেদে Romeo and Juliet, তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে Macbeth, চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে Hamlet এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে Othello থেকে উদ্ধৃতি আছে। উপন্যাসে মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা একত্রিশ। শেক্সপীয়র ছাড়া কালিদাস ও মাইকেল থেকেও ছয়টি করে উদ্ধৃতি আছে এই গ্রন্থে। মাইকেলের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকেই গৃহীত হয়েছে তিনটি।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'মাইকেলের

মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমের কি ভাব হইয়াছিল, তিনি এই কাব্যের ছন্দ ও রচনা কৌশল সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন তাহাও এখন জানিবার উপায় নাই।' ১৮৬১-তে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম কোনো মন্তব্য করেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু পরবর্তী কালে মাইকেলের রচনা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে বঙ্কিমের একাধিক মন্তব্য বা আলোচনা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। মধুসূদনের মৃত্যু ঘটে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন তখন সবে এক বৎসর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বৎসরে পড়েছে। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'এই কবির সঙ্গে বঙ্কিমের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোন সংবাদ নাই।' আমরাও নূতন কোনো অতিরিক্ত সংবাদ এ-বিষয়ে উদ্ধার করতে পারি নি। তবে এ কথা সত্য যে মাইকেলের রচনার প্রতি বঙ্কিম বরাবরই শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ বোধ করে এসেছিলেন। সমগ্র বঙ্কিমসাহিত্যে (অদ্যাবধি রচনাবলীতে অসংকলিত রচনাসহ) মাইকেলের কথা বহু স্থলে আছে।। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করি 'শ্রীমধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে।[৩]

যাই হোক, বঙ্কিম যদিও বলেছিলেন কপালকুণ্ডলা রচনার সময় শেক্সপীয়র খুব বেশি পড়তেন, তথাপি এক দিক থেকে মনে হয় কালিদাস ও মধুসূদনের প্রতিও তাঁর আগ্রহ সে-সময় কিছু কম ছিল না।

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মৃণালিনীর প্রথম সংস্করণে নায়কের এক তীরে হস্তী বধের ঘটনাটি পরে কেন বাদ দেওয়া হল? বঙ্কিমচন্দ্র এর উত্তরে তাঁকে বলেছিলেন, 'প্রথমে মনে ছিল হেমচন্দ্র খুব লড়াই করিবে; কিন্তু সে সব তো কিছুই হইল না। তাই ওটা উঠাইয়া দিলাম।'

প্রথম সংস্করণে হেমচন্দ্র কর্তৃক হস্তী নিধনের ঘটনাটা কি? প্রথম সংস্করণের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদেই এই কাহিনী বিবৃত হয়েছিল। পরবর্তী কালে প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ বঙ্কিম পরিত্যাগ করেন। পরিচ্ছেদ দুটির নাম যথাক্রমে 'রঙ্গভূমি' ও 'গজহন্তা'। প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে বর্জিত কাহিনীর মূল অংশটি উদ্ধৃত করি—

'হস্তী উদ্ধশুণ্ডে বখ্‌তিয়ারকে আক্রমণ করিল। কবিরাজ আত্মবেগভরে তাঁহার পৃষ্ঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; একেবারে বখ্‌তিয়ারকে দলিত করিবার মানসে, নিজ বিশাল চরণ উত্তোলন করিল কিন্তু তাহা বখ্‌তিয়ারের স্কন্ধে স্থাপিত হইতে না হইতেই ক্ষয়িতমূল অট্টালিকার ন্যায়, সশব্দে রজ-উৎকীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ যূথপতি ভূতলে পড়িয়া গেল। অমনি তাহার মৃত্যু হইল।

যাহারা সবিশেষ দেখিতে না পাইল, তাহারা বিবেচনা করিল যে বখ্‌তিয়ার খিলিজি কোন কৌশলে হস্তির বধ সাধন করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ মুসলমান মণ্ডলী মধ্যে ঘোরতর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। কিন্তু অন্যে দেখিতে পাইল যে হস্তির গ্রীবার উপর একটি তীর বিদ্ধ রহিয়াছে। কুতবউদ্দীন বিস্মিত হইয়া সবিশেষ জানিবার জন্য মৃতগজের নিকট আসিলেন, এবং স্বীয় অস্ত্রবিদ্যার প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন যে এই শরবেধই হস্তির মৃত্যুর একমাত্র কারণ। বুঝিলেন যে শর, অসাধারণ বাহুবলে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্থূল হস্তিচর্মে, তৎপরে হস্তীগ্রীবার বিপুল মাংসরাশি ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক বিদ্ধ করিয়াছে। শরনিক্ষেপকারির আরও এক অপূর্ব নৈপুণ্যলক্ষণ দেখিলেন। গ্রীবার যে স্থানে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড মধ্যস্থ মজ্জার সংযোগ হইয়াছে সেই স্থানেই তীর প্রবিদ্ধ হইয়াছে। তথায় সূচিমাত্র প্রবিষ্ট হইলে জীবের প্রাণ বিনষ্ট হয়—পলকমাত্রও বিলম্ব হয় না। এই স্থানে শর বিদ্ধ না হইলে কখনই বখতিয়ারের রক্ষা সিদ্ধ হইত না। কুতবউদ্দীন, আরও দেখিলেন তীরের গঠন সাধারণ হইতে ভিন্ন। তাহার ফলক অতি দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, এবং একটি বিশেষ চিহ্নে অঙ্কিত। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে ব্যক্তি এই শর ত্যাগ করিয়াছিল, সে অসাধারণ বাহুবলশালী, তাহার শিক্ষা বিচিত্র, এবং হস্ত অতি লঘুগতি।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গজহন্তার নাম জানা যায়, সে মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্র।

একবার শ্রীশচন্দ্র বঙ্কিমকে বলেছিলেন, 'আমার বোধ হয় যেন আপনার নাট্য সৃজনশক্তি এখন বাড়িতেছে।' একথা শ্রীশচন্দ্র যখন বলেন তখন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্কিম এর উত্তরে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, 'মৃণালিনীর নূতন সংস্করণ আগাগোড়া প্রায় নাটক, থিয়েটারে আমার বইয়ের যে দুর্দশা করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া ওরূপ করিতে আমার ইচ্ছা হয়েছিল।'

এখন প্রশ্ন, 'মৃণালিনীর নূতন সংস্করণ' বলতে কোন্ সংস্করণের কথা বলা হয়েছে?

আমরা দেখছি মৃণালিনীর সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং অষ্টম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৮৬। সুতরাং মৃণালিনীর নূতন সংস্করণ বলতে যে ১৮৮৩-র সপ্তম সংস্করণের কথাই বলা হয়েছে তা গ্রহণ করা যায়।

কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে মৃণালিনী প্রথম অভিনীত হয় ১৮৭৪-এর ২১ ফেব্রুঅরি।

মৃণালিনী উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭১-এ বঙ্কিম 'The Calcutta Review' পত্রে 'Bengali Literature' শীর্ষক দীর্ঘ সমালোচনা-

প্রবন্ধে তাঁর নিজের রচনারও উল্লেখ করেন। সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশকালে রচয়িতার নাম অপ্রকাশিত ছিল। বঙ্কিম তাঁর নিজের প্রসঙ্গে প্রবন্ধে বলেছিলেন, The only other writer of this class [romance writers] whose works it seems necessary to notice is Babu Bankim Chandra Chatarji, whose Durgesnandini, Kapal Kundala and Mrinalini are among the most popular of Bengali books. Perhaps we cannot do better than give a brief sketch of the story of Kapal Kundala which, if not the best, is the shortest and most easily reproduced of the three.' স্বতন্ত্রভাবে মৃণালিনী সম্পর্কে বলেছেন, 'Mrinalini is a book of a very different stamp, and many consider it Babu Bankim Chandra Chatarji's most successful production.'

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি? স্বয়ং ঔপন্যাসিককে এই প্রশ্ন করেছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। 'ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া কিছুমাত্র ইতস্তত: না করিয়া' বঙ্কিম বলেছিলেন—'বিষবৃক্ষ'। চন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, 'তখন বোধহয় চন্দ্রশেখর পর্যন্ত লিখিত হইয়াছিল।'

চন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকতকুঞ্জে' দ্বিতীয় কলেজ রি-ইউনিয়ন নামক মিলনসভার শেষে সন্ধ্যায় প্রবন্ধলেখক বঙ্কিমকে উপরিউক্ত প্রশ্ন করেছিলেন। চন্দ্রনাথ কথিত এই দ্বিতীয় কলেজ রি-ইউনিয়ন অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। চন্দ্রশেখর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। রাধারাণী এবং কমলাকান্তের দপ্তরও ১৮৭৫-এ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থরূপে রজনী প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু বঙ্গদর্শনে রজনী ধারাবাহিক মুদ্রিত হয় ১৮৭৬-এর পূর্বে; ১২৮১-র আশ্বিন থেকে ১২৮২-র অগ্রহায়ণে। অর্থাৎ ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্গদর্শনে কৃষ্ণকান্তের উইল শুরু হয় ১৮৭৫-এর ডিসেম্বর বা '৭৬-এর জানুঅরিতে, বঙ্গাব্দ ১২৮২-র পৌষ সংখ্যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে, ১৮৭৬-এ বঙ্কিম যখন বিষবৃক্ষ উপন্যাসটিকে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেন তখন তাঁর নিম্নলিখিত উপন্যাস-গুলি লেখা হয়েছে: দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী ও রজনী।

শ্রীশ মজুমদার বঙ্কিমকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'শুনেছি বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা?' উত্তরে বঙ্কিম বললেন, 'কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রঙ্ ফলাইতে হয়েছে।'

নবীনচন্দ্র সেন জানিয়েছেন, সূর্যমুখীর চরিত্র বঙ্কিমের স্ত্রীর প্রতিচ্ছবি। নবীনচন্দ্রের উক্তি, 'আমাকে অক্ষয়বাবু [অক্ষয়চন্দ্র সরকার] সত্য বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে নভেলিষ্ট করিয়াছে। তিনিই সূর্যমুখী।'

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ মজুমদারকে বলেছিলেন, 'একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড বেশি রকমের—আমার পরিবারের। আমাব জীবনী লিখিতে হইলে তাহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম প্রমাদ তিনি জানেন আর আমি জানি।'

নবীনচন্দ্র একবার বঙ্কিমকে বিষবৃক্ষ থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনাতে অনুরোধ করেছিলেন। বঙ্কিম বলেছিলেন, 'কোন্ স্থান পড়িব?' নবীনচন্দ্র বলেন, 'যে স্থান আপনার অভিরুচি।' বঙ্কিম তখন বিষবৃক্ষ খুলে যেখানে কমলমণির কাছে সূর্যমুখী তার পতিপ্রাণতা দেখিয়ে পত্র লিখেছিল, সেই স্থান পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর চোখ অশ্রুপূর্ণ হল। বললেন, 'বিষবৃক্ষ আমি পড়তে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনতে চাও তো পড়ি।'

চন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক বঙ্কিমের এক বিশেষ পরিচিত উকিল বঙ্কিমকে শ্রদ্ধাভরে বলেছিলেন, 'মশায়, অদ্ভুত অদ্ভুত বই সব লিখেছেন, দেশের কত মঙ্গল হবে।' উত্তরে বঙ্কিম বলেন, 'ছাই লিখেছি! আমিই কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাইয়ে মেরেছি, আর আমার অদৃষ্টেই আমার মেয়ে বিষ খেয়ে মরেছে।'

শ্রীশ মজুমদারকেও বঙ্কিম বলেছিলেন, 'শ্রীশ, আমার না জন্মালেই ভাল হত। আমার দ্বারা সমাজের ঘোর অনিষ্ট হবে। কুন্দনন্দিনীকে দিয়ে বিষ খাইয়ে আমি অন্য মেয়েদের বিষ খাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছি, সেই অনুতাপে আমি দগ্ধ হচ্ছি। সেই দৃষ্টান্ত প্রথমেই অনুসরণ করে আমার মেয়ে।'

১৮৮৭-র ৮ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা উৎপলকুমারী শ্বশুরালয়ে আত্মহত্যা করে।

বঙ্কিম শ্রীশচন্দ্রকে অন্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'কুন্দনন্দিনীর বিষ খাওয়াটা যে নীতি বিরুদ্ধ তাহা আমি স্বীকার করি।' ইন্দিরার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দিরার পঞ্চম সংস্করণ পুনর্লিখিত ও পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের ভূমিকায় লেখক যা বলেছেন তার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

'ইন্দিরা বড় হইয়া ভাল করিয়াছে, কি মন্দ করিয়াছে, সেটা খুব সংশয়ের স্থল। সেটার বিচার আবশ্যক বটে।...পাঠক বোধ হয়, ইন্দিরার কলেবর বৃদ্ধির কারণ

জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহা বুঝাইতে গেলে, আপনার পুস্তকের আপনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে অবিধেয় কার্যে আমার প্রবৃত্তি নাই। যিনি বোদ্ধা, তিনি ছোট ইন্দিরাখানি মনঃসংযোগ দিয়া পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, তাহাতে কি কি দোষ ছিল এবং এক্ষণে তাহা কি প্রকারে সংশোধিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, পুরাতন নামে এ একখানা নূতন গ্রন্থ। নূতন গ্রন্থ প্রণয়নে সকলেরই অধিকার আছে। গ্রন্থকারের ইহাই যথেষ্ট সাফাই।'

ইন্দিরা বড় হয়ে ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে—সে-বিষয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্কিমসাহিত্যের পাঠান্তর' শীর্ষক অধ্যায়ে।

চন্দ্রশেখর প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র বঙ্কিমকে বলেন, 'ভাষার লীলা, দৃশ্যের এমন উৎকর্ষ আপনার আর কোন কাব্যে দেখা যায় না। সেই অগাধ জলে সাঁতারের মত সুন্দর অপূর্ব দৃশ্য বড় দুর্লভ।' বঙ্কিম বক্তার কথা সমর্থন করে বলেছিলেন, 'অগাধ জলে সাঁতারের মত দৃশ্য আমি আর বই লিখি নাই।'

চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় বঙ্কিম জানিয়েছেন, 'ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সয়ের মতাক্ষরীন্ নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজী অনুবাদ আছে; ঐতিহাসিক বিষয়ে, কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়াছি।'

১৮৯৩-এ রাধারাণীর চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিম লেখেন, 'এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া, ইহার কলেবর বাড়াইতে হইয়াছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোন্‌টি? শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের ভগিনীপতি কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার রচনার মধ্যে আপনি কোন্ পুস্তকখানিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন?'

বঙ্কিম বলেন, 'তুমি বল দেখি?'

কৃষ্ণধন হেসে বলেন, 'আমি বলিব না—লিখিয়া রাখিতেছি। আমি জানিতে চাই, আপনার সহিত আমার মতের মিল হয় কি না।'

কৃষ্ণধন তখন লিখে রাখলেন; আর বঙ্কিমচন্দ্র পরমূহূর্তে একটুও চিন্তা না করে হাসতে হাসতে বললেন, 'কমলকান্তের দপ্তর।'

কৃষ্ণধন কাগজ উলটিয়ে দেখালেন, তাতে লেখা রয়েছে—কমলাকান্তের দপ্তর।

রজনী ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ভূমিকাংশ আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ভূমিকাটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি আবশ্যক।

'রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুণর্মুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে।

প্রথম লর্ড লিটন প্রণীত 'Last Days of pompeii' নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি 'কানা ফুলওয়ালী' আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে।

উপাখ্যানের অংশবিশেষ, নায়ক বা নায়িকাবিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা প্রচলিত রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্‌কি কলিন্সকৃত 'Woman in white' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসগিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।'

শ্রীশচন্দ্র বঙ্কিমকে সন্ন্যাসীচরিত্র সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিম অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। নানা কাহিনী মাঝে মধ্যে বলতেন। শ্রীশচন্দ্র বঙ্কিমকে বলেন এ-সকল বিষয় তিনি পূর্বে বিশ্বাস করতেন না; পরে রজনীর সন্ন্যাসী চরিত্র ও লর্ড লিটনের নভেল পড়ে তাঁর এ-বিষয়ে বিশ্বাস জন্মেছে। বঙ্কিম এ কথা শুনে হাসতে হাসতে বলেন যে—অনেক দেখে তবে লিখেছি।

সন্ন্যাসী চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমের আরও কথোপকথন হয়। সে বিবরণ শ্রীশচন্দ্রের রচনা থেকে উদ্ধৃত করি।

'কথায় কথায় আমি তাঁর নবেলসমূহে সন্ন্যাসী চরিত্রগুলির কথাই তুলিলাম। হাসিয়া বলিলেন, 'সব নবেলেই আছে বটে কিন্তু কেন থাকে জানি না।' আমি বলিলাম, 'আপনার পিতার সম্বন্ধীয় সন্ন্যাসীর গল্প সঞ্জীববাবুর কাছে শুনিয়াছি। হইতে পারে শৈশবাবধি তার দরুণ মনে একটি impression আছে।' বঙ্কিমবাবু; 'সে গল্প শুনিয়াছি বটে কিন্তু সে জন্য কিছু হইয়াছে আমার বোধ হয় না। তবে অনেক স্থানে অনেক সন্ন্যাসী দেখেছি।' আমি বলিলাম, 'বইয়ের অনুরূপ কোন

সন্ন্যাসীর আশ্চর্য কীর্তিকলাপ কখন দেখিয়াছেন কি না ?' একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, 'না'। তারপর সিনেট সাহেবের পুস্তকের কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'সিনেট দেখাইয়াছেন বটে যে মানুষের শক্তি কত বিকশিত হইতে পারে। কিন্তু Theosophy এদেশে আসিবার পূর্বে আমি তা লিখেছি।'

শ্রীশচন্দ্র বঙ্কিমের নিকট তাঁর স্ত্রী চরিত্রগুলির উৎকর্ষের কথা বলেন এবং পুরুষ চরিত্রেরও কোনো কোনোটি অতি সুন্দর বলে অভিমত প্রকাশ করেন। শ্রীশচন্দ্র লিখেছেন, 'অন্যান্য নামের সঙ্গে বঙ্কিমবাবু অমরনাথের নামও করিলেন। আমি বলিলাম, অমরনাথ ও প্রতাপ একই চরিত্রের দুইরূপ বিকাশ। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, প্রতাপ বরাবর ঐশ্বর্যশালী, তথাপি ইন্দ্রিয়জয়ী, কিন্তু অমরনাথ অবস্থার পরিবর্তনে মনঃসংযম করিতে পারিয়াছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে কৃষ্ণকান্তের উইলের চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কোনো সংস্করণেই কোনো ভূমিকা ছিল না।

কৃষ্ণকান্তের উইল প্রথম বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হয়। ১২৮৪-র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বর্ণনা : 'গোবিন্দলাল পিস্তলের ঘোঁড়া টানিলেন। শব্দ হইল, গোলা ছুটিল, রোহিণীর মস্তক ভেদ করিল। রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।'

মাঘ সংখ্যার বর্ণনা : 'ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ উপন্যাস লিখিলাম।' এর পরেই তারকাচিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় ঔপন্যাসিক লিখছেন, 'অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির হওয়ার পরে, অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'রোহিণীকে মারিলেন কেন ?' অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, 'আমার ঘাট হইয়াছে।' কাব্যগ্রন্থ, মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।'

শ্রীশ মজুমদার বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার কোন্ পুস্তক তাঁর মতে বেশি দিন স্থায়ী হবে ? বঙ্কিম উত্তরে বলেছিলেন, 'বলা বড় শক্ত, বোধ হয় কৃষ্ণকান্তের উইল।'

শ্রীশ মজুমদার বলেন, 'স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর নিজের মতে সর্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর, কৃষ্ণকান্তের উইল তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।'

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সাম্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ক্ষুদ্র ভূমিকায়

গ্রন্থকার লেখেন, 'সাম্যনীতি নূতন তত্ত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীয়রা যে ভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি সেইরূপ লিখিয়াছি। অতএব ইউরোপীয় নীতি শাস্ত্রের সহিত প্রভেদ দেখিলে, কেহ রাগ করিবেন না। আরও, স্বদেশীয় সাধারণ জনগণকে এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যদি ইহাতে কিছু পঠিতব্য না পান, আমি দুঃখিত হইব না। অশিক্ষিত পাঠকদিগের হৃদয়ে এই নীতি অঙ্কুরিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব।'

সাম্য প্রথম প্রকাশের পর আর পুনর্মুদ্রিত হয় নি। কেন? বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্রকে বলেছেন, 'এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে।...সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।'

সাম্য কেন পুনর্মুদ্রিত হয় নি, সে-কথা বঙ্কিম নিজেও লিখে গেছেন, 'আমি বঙ্গদর্শনে সাম্য নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পশ্চাৎ তাহা পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলাম। বঙ্গদেশের কৃষক আর পুনর্মুদ্রিত করিব না, বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ সাম্য-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই সাম্য শীর্ষক পুস্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছি। সুতরাং বঙ্গদেশের কৃষক পুনর্মুদ্রিত করার আর একটা কারণ হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রঘটিত ইহাতে কয়েকটি কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রান্তিশূন্য মনে করি না। কিন্তু অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন্ কথা ভ্রান্তি, আর কোন্ কথা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চিত করা দুসাধ্য। অতএব কোন প্রকার সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না।'

বঙ্গদর্শনে (১২৮৪ চৈত্র—১২৮৫ ভাদ্র) রাজসিংহের কয়েকটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। কেন বন্ধ হয়? চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন রাজসিংহ সম্পূর্ণ হচ্ছে না কেন? বঙ্কিম তখন তাঁর কোনও বন্ধুর নাম করে বলেছিলেন, 'এঁরা বলেন আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।' চন্দ্রশেখর ও বঙ্কিমের মধ্যে যখন এই কথাবার্তা হয় সেটা তখন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। এর কিছুদিন পরে ১৮৮২-র ৪ ফেব্রুঅরি রাজসিংহ 'ক্ষুদ্র কথা' রূপে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হল। চতুর্থ সংস্করণ 'পুনঃপ্রণীত' ও পরিবর্ধিত আকারে মুদ্রিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে।

এই সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিম বলেন, 'আমি পূর্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।'

এই গ্রন্থের ভাষা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বক্তব্য, 'এখন লেখকেরা বা ভাষাসমালোচকেরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের মত যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্বত্র সংস্কৃতানুযায়ী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত—যে, যাহা পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ বিরুদ্ধ হইলেও চলিতে পারে। আমি নিজে এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতের পক্ষপাতী, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এবং সকল স্থানে তাঁহাদের অনুমোদনে প্রস্তুত নহি। আমি যদিও ইতিপূর্বে সম্বোধনে 'ভগবন্' 'প্রভো' 'স্বামিন্' 'রাজকুমারি' 'পিতঃ' প্রভৃতি লিখিয়াছি, এক্ষণে এ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।'

গ্রন্থকারের এই ঘোষণা সত্ত্বেও দেখি চতুর্থ সংস্করণে সর্বত্রই সম্বোধনে 'রাজকুমারি' ব্যবহৃত হয়েছে। রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণ ও ইন্দিরার পঞ্চম সংস্করণ একই বৎসর প্রকাশিত। অথচ দেখতে পাই ইন্দিরার পঞ্চম সংস্করণের সম্বোধনে 'কামিনি' 'কামিনী'তে পরিবর্তিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছি 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্কিমসাহিত্যের পাঠান্তর' শীর্ষক অধ্যায়ে।

আমরা দেখেছি বঙ্কিম ধাপে ধাপে তাঁর এক-একটি গ্রন্থকে উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথমে বললেন কপালকুণ্ডলা, তারপর বললেন বিষবৃক্ষই শ্রেষ্ঠ, তারপর জানালেন কমলাকান্তের দপ্তর, অতঃপর কৃষ্ণকান্তের উইলের নাম করলেন। জীবনের একেবারে শেষ পাদে (১৮৯৪ খ্রী) যে উপন্যাসটিকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করে গেছেন তার নাম রাজসিংহ। অবশ্যই নূতন সংস্করণ রাজসিংহ। এ সংবাদ শ্রীশ মজুমদারের লেখা থেকে আমরা জানতে পাই।

আনন্দমঠ প্রথমে বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় বঙ্কিম ক্ষুদ্র ভূমিকায় লিখলেন, 'বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।'

বঙ্কিম নিজের সৃষ্ট স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্রকে বলেন, 'এদেশে স্ত্রীরাই মানুষ, সে কথা আমি একবার বুঝাইবার চেষ্টা পেয়েছি। ইউরোপের যত মনস্বিনী স্ত্রীর কথাই বল ঝান্সীর রাণীর চেয়ে কেহ উচ্চ নহে। রাজনীতি ক্ষেত্রে অমন নায়িকা আর নাই। ইংরেজ সেনাপতি রাণীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া বলিয়াছিল প্রাচ্যদিগের মধ্যে এই একমাত্র স্ত্রীলোক পুরুষ। আমার ইচ্ছা হয়, একবার সে

চরিত্র চিত্র করি, কিন্তু এক আনন্দমঠেই সাহেবেরা চটিয়াছে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।'

বঙ্কিমের জীবিতকালে আনন্দমঠের পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার লেখেন, 'যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল আর Captain Edwardes নামের পরিবর্তে Major wood নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না—কেন না, উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।'

বীরভূম, অজয়ের তীরবর্তী কোনও আরণ্য এবং পার্বত্যপ্রদেশ ছিল আনন্দমঠের ঘটনাস্থল। কিন্তু সন্ন্যাসী বিদ্রোহ আসলে সংঘটিত হয়েছিল অন্যত্র,—উত্তরবঙ্গে।

আনন্দমঠ উপন্যাস প্রকাশিত হবার পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র একদিন অক্ষয়চন্দ্র সরকারের হাতে পাণ্ডুলিপির শেষাংশ দেখাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার নিজের ইচ্ছাকৃত ভুল—অজয় নদ ও বীরভূমি।' পঞ্চম সংস্করণে এই ভুল সংশোধিত হয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে বঙ্কিম ভূমিকায় লেখেন, 'আনন্দমঠ প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক পরিচয় দিব।'

দেবী চৌধুরাণীর ভূমিকায় বঙ্কিম যখন এ কথা বলেন তখন আনন্দমঠের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৮৩ খ্রী) প্রকাশিত হয়ে গেছে। তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয় দেবী চৌধুরাণী প্রকাশের পর। আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিম লিখলেন, 'এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।'

ললিতচন্দ্র মিত্র ১৩১৮ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্যে' আনন্দমঠ সম্পর্কে বঙ্কিমের একটি উক্তি প্রচার করেন। বঙ্কিম নাকি বলেছিলেন, as a patriotic work আনন্দমঠ খুব ভাল বটে, কিন্তু তাতে আর্ট কম।

কালীপ্রসন্ন ঘোষকে এক পত্রে বঙ্কিম লেখেন, 'আমি বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি

করিব আর আপনি বা তাহার মূল মন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষাপরবশ আত্মোদর-পরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল বঙ্গে উদরং।'

'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি আনন্দমঠের পূর্বেই রচিত হয়েছিল। এই গানটি সম্পর্কে বঙ্কিম একদিন কি বলেছিলেন তা বঙ্কিম-অনুজ পূর্ণচন্দ্রের রচনা থেকে জানতে পাই।

পূর্ণচন্দ্রের লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করি—

'বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে দুই এক পাত matter কম পড়িলে পণ্ডিতমশায় আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা ঐ দিনেই লিখিয়া দিতেন। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে দুই একটি লোকরহস্যে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশিত হয় নাই। বন্দেমাতরম্ গীতটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিত-মহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় এক পাতা matter কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, আচ্ছা আজই পাবে। একখানা কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল, পণ্ডিতমশায়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল বোধহয় উহা পাঠও করিয়াছিলেন, কাগজখানিতে বন্দেমাতরম্ গীতটি লেখা ছিল। পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখা আছে—উহা মন্দ নয় ত—ঐটা দিন না কেন। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।'

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন, নবীনচন্দ্র সেন একবার কথায় কথায় আনন্দমঠের বিখ্যাত বন্দেমাতরম্ গানের একাংশ আবৃত্তি করে বঙ্কিমকে বলেছিলেন—এমন ভাল জিনিসকে আধ সংস্কৃত আধ বাংলা লিখে মাটি করা হয়েছে, এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত। লোকের ভাল লাগে না। এর উত্তরে বঙ্কিম ঈষৎ কুপিত স্বরে বলেছিলেন, 'আচ্ছা ভাই ভাল না লাগে পড়ো না। আমার ভাল লাগে তাই ও রকম লিখেছি। লোকের ভাল লাগবে কিনা ভেবে আমি লিখব!' এই ঘটনা নবীনচন্দ্রও নিজে উল্লেখ করেছেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনাতেও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিম যা বলেন তা বর্তমান প্রস্তাবের পক্ষে উদ্ধারযোগ্য। ভূমিকাটি এই—

'পাঠকদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই গ্রন্থ কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণী-বিশেষের লোককে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই। সাধারণ সমাজ ভিন্ন, কাহারও

প্রতি ইহাতে ব্যঙ্গ নাই। ইহাতে পাঠক যেরূপ মনুষ্য চরিত্র দেখিবেন, সেরূপ মনুষ্য চরিত্র সকল সমাজে, সকল কালেই বিদ্যমান। আধুনিক বাঙ্গালী সমাজ, এই গ্রন্থের বিশেষ লক্ষ্য বটে; কিন্তু তৎস্থিত কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ তাহার লক্ষ্য নহে। যদি কেহ বিবেচনা করেন যে, তিনিই ইহার লক্ষ্য, তবে ভরসা করি, তিনি কথাটা মনে মনেই রাখিবেন। প্রকাশে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখি না।'

দেবী চৌধুরাণীর ভূমিকায় বঙ্কিম বলেন, 'দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।'

'প্রচারে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছিলেন, 'নবজীবনের পনের দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম—যে হিন্দুধর্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম।'

১২৯১-এর শ্রাবণ থেকে 'প্রচার' প্রচারিত হয়। এর পনের দিন পূর্বে 'নবজীবন' প্রকাশিত হয়। 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' বঙ্কিম হিন্দুধর্মবিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেছিলেন। 'নবজীবনে' ধর্মতত্ত্ব অনুশীলনধর্ম এবং 'প্রচারে' কৃষ্ণচরিত্র ও দেবতত্ত্ব প্রকাশিত হতে থাকে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচরিত্র প্রথম ভাগ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় গ্রন্থকার তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ করে লিখেছেন, 'প্রায় দুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজি পর্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই। সমাপ্তি দূরে থাকুক, কোনটিও অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। একে বিষয়গুলি অতি মহৎ, অতি বিস্তারিত সমালোচনা ভিন্ন তন্মধ্যে কোন বিষয়েরই মীমাংসা হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ লেখকের সময়ও অতি অল্প; এবং পরিশ্রম করিবার শক্তিও মনুষ্যের চিরকাল সমান থাকে না। আগে 'অনুশীলন ধর্ম' পুনর্মুদ্রিত হইয়া তৎপরে 'কৃষ্ণচরিত্র' পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না, 'অনুশীলন ধর্মে' যাহা তত্ত্ব মাত্র, 'কৃষ্ণচরিত্রে' তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তারপর উদাহরণের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।'

২৫ আশ্বিন [১২৯২ বঙ্গাব্দ; ১০ অক্টোবর ১৮৮৫] তারিখের এক পত্রে বঙ্কিম শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন, 'কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চলিবে। আমি যাহা লিখিয়াছি (নবজীবন ও প্রচারে) ও যাহা লিখিব, তাহাতে এই দুইটি তত্ত্ব প্রমাণিত হইবে। ১। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন। ২। ধর্মযুদ্ধ আছে। ধর্মার্থেই মনুষ্যকে অনেক সময় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় (যথা William the Silent)। ধর্মযুদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধর্ম। সে সকল স্থানে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কখনও প্রবৃত্ত নহেন। ৩। অন্যে যাহাতে ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন। মনুষ্যে ইহার বেশি পারে না। কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্য চরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।'

কৃষ্ণচরিত্র প্রথম ভাগ প্রকাশের ছয় বৎসর পর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণটি সম্পূর্ণ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিম বলেন, 'আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মত পরিবর্তনের স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণবিষয়েই আমার মত পরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণ-চরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখন মত পরিবর্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞান-বিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম না।...কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি;—সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্য কোন যত্ন পাই নাই।'

বঙ্কিম আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। সীতারামও ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়।

সীতারামের ভূমিকায় বঙ্কিম বলেছেন, 'সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই

গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।'

ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার জানিয়েছেন, এই গ্রন্থ 'নীরস, এবং মধ্যে মধ্যে দুরূহ।' এবং 'প্রধানতঃ, শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।'

বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রথম ভাগ ১৮৮৭ এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকাটি আমাদের প্রয়োজন। উক্ত গ্রন্থে 'বহুবিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধটি কেন সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হল না?

বঙ্কিম ভূমিকায় লিখেছেন, 'বহুবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটি অখণ্ড পুনর্ম্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারূঢ়, তীব্র সমালোচনায় তাঁহার আর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় কর্তব্যানুরোধে তাঁহার গ্রন্থ যেরূপ তীব্রতার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম, এখন আর তাহা পারা যায় না। কেন না, এখন তাঁহার শোকে আমরা সকলেই কাতর। যাঁহার জন্য সকলেই রোদন করিতেছি, তাঁহার কোন ত্রুটির সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিতে পারা যায় না। অতএব যেটুকু তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা, এবং যাহা মল্লিখিত প্রবন্ধের তীব্রাংশ, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি।'

'বহুবিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধের শিরোদেশে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লেখকের মন্তব্য, 'স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্ম্মুদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয়বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনর্ম্মুদ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে, দোষ তাঁহার, না আমার। সুবিচারের জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনর্ম্মুদ্রিত করিলাম। ইচ্ছা ছিল যে, এ সময়ে উহা পুনর্ম্মুদ্রিত

করিব না, কিন্তু তাহা না করিলে আমার জীবদ্দশায় উহা আর পুনর্মুদ্রিত হইবে কি না সন্দেহ। উহা বিলুপ্ত করাও অবৈধ ; কেন না, ভাল হউক, মন্দ হউক, উহা আমাদের দেশে আধুনিক সমাজ সংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পড়িয়াছে—উহার দ্বারাই বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলন নির্বাপিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি।'

'বহুবিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধের বর্জিত অংশে কি আছে? বঙ্কিম-কর্তৃক পরিত্যক্ত সেই তীব্র সমালোচনা অংশ বঙ্গদর্শন পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছি আমার 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন' নামক গ্রন্থে। বঙ্কিমের এই রচনাটি প্রথম পুনর্মুদ্রিত করি 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় ১৩৭৫-এর ভাদ্র সংখ্যায় 'বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর' শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে।

এক সময়ে বাংলার ইতিহাস বিষয়ে বঙ্কিম অনেকগুলি প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে লিখেছিলেন। কেন লিখেছিলেন? তার উত্তর পাই বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায়। বঙ্কিমের উক্তি, 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশি নয়। এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশি। দর বেশি হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালিতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি।'

১৮৮৭-তে সীতারাম প্রকাশের পর বঙ্কিম আর কোন নতুন উপন্যাস লেখেন নি।

১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। একদিন সুরেশ সমাজপতি বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কি আর কোনো নতুন উপন্যাস লিখবেন না? এর উত্তরে

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'তা ঠিক বলতে পারি না। তবে অনেকদিন থেকে একটা জিনিস লিখিবার হইয়া আছে,—হইয়া উঠিতেছে না। বৈদিক যুগের ছবি দিয়া একখানা উপন্যাস লিখিব। তবে—হইয়া উঠিবে কি না, বলিতে পারি না।'

এ কথা বলার অল্প কিছুকাল পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান ঘটে; পরিকল্পিত উপন্যাসটি রচনার আর অবকাশ জোটে না।

১৪

বঙ্গদর্শন ও সমকালীন সোমপ্রকাশ

বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশকাল ১২৭৯-র বৈশাখ। এই বৈশাখ থেকেই সমকালীন বিখ্যাত পত্র 'সোমপ্রকাশ' পূর্বোক্ত পত্রিকার সমালোচনায় নিয়োজিত হয়। মূলতঃ এই সমালোচনা ছিল বিরোধিতামূলক। বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা ও পরবর্তী বিভিন্ন সংখ্যার সমালোচনা ; এবং বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে বহু চিঠিপত্র ও আলোচনা সোমপ্রকাশে মুদ্রিত হয়েছিল। এই সমালোচনা এবং আলোচনা ও চিঠিপত্রগুলি সংকলিত ও বিশ্লেষিত হলে বঙ্গদর্শন সম্পর্কে তৎকালীন একশ্রেণীর পাঠকের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় লাভ করা যায়। বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবকে সে যুগে সকলেই প্রায় সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যাঁরা এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নি, যাঁরা এর বিরোধী সমালোচনায় বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিলেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁরাও অস্বীকৃত হবার নন। শতাব্দীকাল পরে তাঁদের মতামতও সংগৃহীত হওয়া উচিত, তাঁদের বক্তব্যে সঙ্গতি অসঙ্গতি কতখানি তারও পরিমাণ নিরূপিত হওয়া আবশ্যক বলে মনে করি।

সোমপ্রকাশ বঙ্গদর্শন অপেক্ষা চৌদ্দ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিকল্পিত সাপ্তাহিক পত্র সোমপ্রকাশের আবির্ভাব ১৮৫৮-র ১৫ নভেম্বর, ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ১ অগ্রহায়ণ। সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাসাগর 'পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন।' ১৮৬৫-র ২ জানুঅরি থেকে দ্বারকানাথ কিছুকালের জন্য সম্পাদকীয় কার্যভার থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ভার নেন মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কিছু সময়ের জন্য বিদ্যাভূষণের ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রী পত্রিকা পরিচালন করেন। ১৮৭৮-এর মার্চ মাসে ভার্ণাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট জারি হয় এবং ১৮৭৯-র মার্চে 'লাহোরস্থ সংবাদদাতা'র একটি পত্র প্রকাশের জন্য সোমপ্রকাশ রাজরোষে পড়েন

এবং গভর্ণমেণ্ট এক হাজার টাকা জমানৎ ও মুচলেকা চেয়ে পাঠান। দ্বারকানাথ নিজেই প্রেস আইনের প্রতিবাদে পত্রিকা বন্ধ করে দেন। পরে আইন পরিত্যক্ত হলে সোমপ্রকাশ পুনরায় (১৮৮০ এপ্রিল) প্রকাশিত হয়, কিন্তু তার পূর্বপ্রভাব আর সেরূপ থাকে না। ১৮৮৬-র ২৩ আগষ্ট বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর পরও সোমপ্রকাশ কিছুদিন চলেছিল।

বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমের রচনা সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য ও সমালোচনা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হতে দেখি। ১২৭২-এর ১৩ বৈশাখ দুর্গেশনন্দিনী উপ-ন্যাসটির সমালোচনা প্রকাশিত হয়। নাতিদীর্ঘ সমালোচনার উপসংহারে সোমপ্রকাশ লিখেছেন, 'যদি কেহ, তুলামানে দুর্গেশনন্দিনীর গুণদোষের পরিমাণ করেন গুণভার গুরু হইবে সন্দেহ নাই।'

১২৭৩ বঙ্গাব্দের ২৬ অগ্রহায়ণ 'কপালকুণ্ডলা' শিরোনামে একটি 'পদ্য' মুদ্রিত হয় সোমপ্রকাশে—

কে তুমি যোগিনীবেশে বঙ্কিম নয়নে।
ত্রাণকর্ত্রী ভবানীরে ভাবিতেছ মনে॥
যুবতী হইয়া কর ভৈরবী সাধন।
সংসারেতে প্রীতি নাই সদা ক্ষুণ্ণ মন॥
পঙ্কজ বদনী বামা মুক্ত চারুকেশ।
পর্বত দুহিতা যেন ভাবেন মহেশ॥
প্রশস্ত ললাটদেশ সরল হৃদয়।
পেয়েছ যবন হস্তে ক্লেশ অতিশয়॥
পরে দ্বিজ কাপালিক বিজন কাননে।
পালিত তোমারে সতী অতি সযতনে॥
কপালকুণ্ডলা তুমি চিনেছি এখন।
ভুলিবে না তব নাম যত গৌড়জন॥
অক্ষিযুগে অশ্রুবিন্দু পড়ে ঘন ঘন।
স্মরিলে তোমার খেদ পূর্ণ বিবরণ॥

দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবকে সোমপ্রকাশ সহজভাবেই গ্রহণ করে-ছিলেন, শেষে বঙ্কিম (বক্র) দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস সেখানে উপস্থিত। এখন দেখা যাক বঙ্কিম-সম্পাদিত সাময়িকপত্র বঙ্গদর্শনকে সোমপ্রকাশ কিভাবে গ্রহণ করেন।

বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৭৯-র ১ বৈশাখ; ১৮৭২

এপ্রিল মাসে। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে ১২৭৮-এর 'সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্গদর্শনের আসন্ন প্রকাশের কথা বিজ্ঞাপন আকারে বিবৃত হয়। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত সম্ভাব্য অপর কয়েকজন লেখকের নামও বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত হয়েছিল—দীনবন্ধু মিত্র / হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় / জগদীশনাথ রায় / তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য / রামদাস সেন / অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

এই বিজ্ঞাপনের পরেই সাহিত্যমহলে এবং পত্রপত্রিকার দপ্তরে বঙ্গদর্শন নিয়ে রীতিমত জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে। কারণ বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসেবে যাঁর নাম প্রকাশিত হয়েছে তিনি শুধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মাত্র নন, তিনি দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলা-মৃণালিনী গ্রন্থের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সোমপ্রকাশ বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার সমালোচনায় লিখলেন—

'যে সমুদয় ব্যক্তি বঙ্গদর্শন সম্পাদন কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গসমাজে অপ্রসিদ্ধ নহেন। ইহাদিগের অনেকেই লেখনীর বলে সহৃদয়গণের নিকট বিপুল প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ঈদৃশ বিদ্যা বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে সমবেত চেষ্টা হইয়া মাতৃভাষায় সৌষ্ঠব সম্পাদনার্থ অগ্রসর হইয়াছেন, এটি নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। বঙ্গদর্শন সুলেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের রসময়ী লেখনী বিনির্গত হইবে বলিয়া অনেকেই সোৎসুক চিত্তে ইহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বৈশাখের প্রথম দিবসে সেই অভিষ্ট বঙ্গদর্শন কুতুহলপর পাঠকগণের সমক্ষে উপনীত হইল। সকলেই উৎফুল্ল নয়ন হইয়া আগ্রহ সহকারে বঙ্গদর্শন পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরাও সেই আগ্রহের বশবর্তী হইয়া বঙ্গদর্শনখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম; কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, আমাদিগের মন আশানুরূপ পরিতৃপ্ত হইল না।'

—সোমপ্রকাশ ১১ বৈশাখ ১২৭৯

দেখা যাচ্ছে বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বেই উক্ত পত্রিকা সম্বন্ধে সাহিত্যানুরাগী মহলে একটা ধারণা বা প্রত্যাশা দানা বেঁধে উঠেছিল। যাঁদের প্রত্যাশা পূর্ণ হল না তাঁরা সংখ্যায় অধিক না হলেও নগণ্য নন। সোমপ্রকাশ তাঁদের অন্যতম। সমালোচনার অন্য এক স্থলে সোমপ্রকাশের উক্তি—'লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে অনেকগুলি বঙ্গদর্শনের অনুরূপ হয় নাই।' এই উক্তির অর্থ কি? যে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা সমালোচিত হচ্ছে তার রচনাগুলি সেই পত্রিকার অনুরূপ নয় কথার তাৎপর্য কি? সোমপ্রকাশের এই উক্তির মধ্য দিয়ে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা ১২৭৯-র ১ বৈশাখ প্রকাশিত হলেও, প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশের কাল থেকেই বাঙালীর হৃদয়রাজ্যে সে আসন সংগ্রহ করেছিল। যে

পত্রিকার সম্পাদক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, সেই পত্রের প্রকৃতি ও মান কিরূপ হবে তা বাঙালী পাঠক সহজেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ বঙ্গদর্শন তার নিজের ক্ষেত্র নিজেই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। তাই তার সঙ্গে কেবল তারই তুলনা চলে অন্য কারোর নয়। এইখানেই বঙ্গদর্শনের স্বাতন্ত্র্য। বিরোধী সমালোচক সম্প্রদায় এইখানেই বঙ্গদর্শনের গৌরবের কাছে পরাজিত।

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় যে সকল রচনা প্রকাশিত হয় তা প্রদত্ত হল—

পত্রসূচনা (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, ভারত কলঙ্ক (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, কামিনী কুসুম (কবিতা)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষবৃক্ষ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র, আমরা বড়লোক (প্রবন্ধ), সঙ্গীত (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, ব্যাঘ্রচার্য বৃহল্লাঙ্গুল (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, উদ্দীপনা (প্রবন্ধ)—অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

পত্রিকায় বিষবৃক্ষ ব্যতীত অপর সকল রচনায় লেখকনাম অপ্রকাশিত ছিল।

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার প্রতিটি রচনাই সোমপ্রকাশ কর্তৃক সমালোচিত হয়। 'পত্রসূচনা'র বক্তব্য সোমপ্রকাশের অনুমোদন লাভ করেছে। 'ভারত কলঙ্ক' প্রস্তাবের বক্তব্যও সোমপ্রকাশ সমর্থন করেন। লেখকের বক্তব্য যুক্তিবহির্ভূত নয়। কিন্তু লেখক মীবারবাসী ব্যতীত অপর সমুদয় হিন্দুকেই যে স্বাধীনতায় অনাস্থা বলে নির্দেশ করেছেন, তা সোমপ্রকাশ-সমালোচক স্বীকার করেন না। কারণ তাঁদের মতে আর্যজাতির ইতিহাসে স্বাধীনতার অনেক কীর্তি বর্তমান। 'কামিনী কুসুম' সম্বন্ধে বক্তব্য 'সচরাচর বাঙ্গলা পত্রিকাতে যে সমস্ত পদ্য দৃষ্ট হয় কামিনী কুসুম তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না।' 'সঙ্গীত' শীর্ষক রচনাটি সম্পর্কেও সমালোচকের বক্তব্য একরূপ। 'আমরা বড়লোক' বঙ্গদেশীয় পরিচ্ছদবিষয়ক একটি রচনা। সোমপ্রকাশের উক্তি, 'লেখক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের একেবারে অননুমোদনীয় নহে। কিন্তু তিনি যেরূপ রসিকতা ও বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অরুচিকর হইয়াছে। রসিকতা প্রদর্শন সময়েও ধীরতা ও গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে।'

এখানে প্রশ্ন, 'আমরা বড়লোক' শীর্ষক নিবন্ধ প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশের বক্তব্য কি অযৌক্তিক? বস্তুতঃ তা নয়। 'আমরা বড়লোক' শীর্ষক রচনাটির লেখক কে, আমাদের জানা নেই; তবে এই রচনাটি যে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রেরও অপছন্দ ছিল তা জানতে পারি। ১৮৭২-এর ১৩ মে বহরমপুর থেকে 'Mookerjee's Magazine'-এর সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বঙ্কিম পত্রোত্তরে লেখেন—

'Your remarks on the getting [up] of the Banga Darsana, I have

communicated to the manager. He must improve. Poor Dinabandhu is not responsible for that feeble article on our costume. It was from another celebrity, whom I was obliged to humour.'

প্রবন্ধটি দীনবন্ধুর লেখা নয়, অন্য এক বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা, নিতান্তই মন রাখার জন্য যাঁর রচনাটি পত্রস্থ করতে হয়েছিল।

সুতরাং এই রচনা সম্পর্কে সোমপ্রকাশ যদি বলেন—'অধৈর্য বিলসিত রসিকতা অসামাজিকতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আমরা দুঃখিত হইলাম, বঙ্গদর্শন এইরূপ অসামাজিকতা দোষে দূষিত হইয়াছে।' —তবে সোমপ্রকাশের মন্তব্যকে অযৌক্তিক ও বিদ্বেষপ্রসূত বলতে পারি না। 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' ও 'উদ্দীপনা' রচনা দুটি সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি, 'প্রস্তাব দুটি মন্দ হয় নাই।' তবে ভারতবর্ষীয়গণ সম্পূর্ণ উদ্দীপনাবিরহিত, এ কথা সোমপ্রকাশ স্বীকার করেন না।

অবশিষ্ট রইল ধারাবাহিক বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রথম কিস্তির সমালোচনা। সোমপ্রকাশ থেকে সেই অংশ উদ্ধৃত হল—

'বিষবৃক্ষ একটা ধারাবাহিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এটি লিখিতেছেন। ইহার কিয়দংশ মাত্র প্রস্তাবিত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস গ্রন্থন চাতুরী সাধারণের অবিদিত নহে। তাঁহার উপন্যাস সকলেই আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিষবৃক্ষের প্রারম্ভ দেখিয়া আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইল, বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় ইহাতে কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। যে উপন্যাস পাঠে পাঠকের কৌতূহল উত্তরোত্তর প্রদীপ্ত হয়, তাহাতেই যথোচিতরূপে উপাখ্যান গ্রন্থনের চাতুর্য আছে। এটি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। উপাখ্যান যোজনার কৌশল বিকশিত না হইলে পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপনার সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বিষবৃক্ষে এই কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই সমাপ্তি ফল নির্দেশ করিয়া নিতান্ত অবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সূচনাতেই আখ্যায়িকার সমুদয় ফল খুলিয়া বলিলে পাঠকের পাঠেচ্ছা বলবতী হওয়া সম্ভাবিত নহে। আদৌ উত্তরোত্তর উদ্ভাবনীশক্তি প্রদর্শন করিয়া পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ কর্তব্য; পরিশেষে যখন প্রারম্ভ নিহীত বীজ ফলোন্মুখ হইবার সময় উপস্থিত হইবে, তখনই সেই ফল নির্দেশ করিয়া আখ্যায়িকার উপসংহার করা বিধেয়। কিন্তু বিষবৃক্ষ লেখক, এই চিরন্তন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বীজ অঙ্কুরিত না হইতেই কি তাহার ফল লক্ষ্য করিয়া আড়ম্বর করা বিধেয়? এরূপ করিলে কি

বক্তার শূন্যহৃদয়তা প্রকাশ পায় না? বিষবৃক্ষের এইরূপ গরবন্ধন প্রণালী নিরতিশয় অসহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের এ দোষ মার্জনীয় নহে।'

—সোমপ্রকাশ ১১ বৈশাখ ১২৭৯

এ ছাড়া উক্ত সমালোচনায় বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন রচনার ভাষার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সমালোচক প্রথমে বঙ্গদর্শনের ভাষার কিছু ব্যাকরণগত দোষ আবিষ্কার করেছেন। যেমন 'সাবধানা', 'একেবারে', 'কেবলমাত্র' দুষ্ট; শুদ্ধ রূপ 'সাবধান' 'একবারে', 'কেবল' অথবা 'মাত্র'। বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের একস্থানে 'পদ্ম পলাশ নয়নী' আছে; সমালোচকের মতে 'ন হ্ব্যাধিক স্বরান্না-সিকোদর বজ্জাৎ' সূত্র অনুসারে 'পদ্ম পলাশ নয়না'ই শুদ্ধ। এবং 'শ্যামাঙ্গিনা' স্থলে 'শ্যামাঙ্গী' লেখাই সঙ্গত। বঙ্কিম সমালোচকের শেষ বক্তব্যটি গ্রহণ করেছিলেন। বিষবৃক্ষ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে দেখি শ্যামাঙ্গিনী স্থলে শ্যামাঙ্গী।

এতদ্‌ব্যতীত বঙ্গদর্শন থেকে ভাষার অস্পষ্টতার উদাহরণ সংগ্রহের জন্য সমালোচক অনেক পরিশ্রম করেছেন। উপসংহারে তাঁর মন্তব্য—

'বঙ্গদর্শনের অনেক স্থলে নিতান্ত কদর্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ বাঙ্গালা প্রচার হইলে ভাষার উন্নতি হওয়া সুদূর পরাহত। বড়লোকের লিখিত বলিয়া কেহ যেন এইরূপ ভাষার অনুকরণ না করেন। বঙ্গদর্শনের লেখকগণ লব্ধপ্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহারা রচনা বিষয়ে যেরূপ চাপল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অবশ্য দোষ বলিয়া গণনা করা উচিত। রচনাগত দোষ সংশোধন করা লেখকগণের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় তাঁহারা ভবিষ্যতে সুলেখক পদবাচ্য হইতে পারিবেন না।'

—সোমপ্রকাশ ১১ বৈশাখ ১২৭৯

এ সমালোচনা অনেক পরিমাণে রামগতি ন্যায়রত্নের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের সমালোচনার সমপর্যায়ভুক্ত। 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে বঙ্কিমের রচনা সম্পর্কে গ্রন্থকারের বক্তব্য, 'মস্তকোন্নত' এরূপ এক পদ ব্যাকরণের দিক থেকে শুদ্ধ নয়, 'মস্তক উন্নত' এরূপ ব্যবহার ঠিক। সোমপ্রকাশ সমালোচকের সাহিত্যানুরাগ তথ্যানুরাগ প্রভৃতি অপেক্ষা ব্যাকরণের প্রতি আকর্ষণ অধিক। ব্যাকরণের প্রতি আগ্রহ কখনই নিন্দনীয় নয়, তবে রচনায় ব্যাকরণগত ভুলভ্রান্তি আবিষ্কার সাহিত্য সমালোচকের প্রধানতম উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রথম কিস্তি পাঠ করেই সোমপ্রকাশ যে-সকল অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাকে কেউই সঙ্গত বলে গ্রহণ করবেন না।

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা সমালোচনার পর ১২৮০-র ২১ শ্রাবণ সোমপ্রকাশে বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা অর্থাৎ ১২৮০-র শ্রাবণ সংখ্যার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সোমপ্রকাশের সমালোচনার সূচনা অংশ উদ্ধৃত হল—

'১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে যখন বঙ্গদর্শন সাহিত্য রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হয়, তখন আমরা ইহার অভিনয় দর্শন করিতে নিতান্ত কুতূহলী হইয়াছিলাম। প্রথমবারের অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা তাদৃশ তৃপ্তিসুখ অনুভব করিতে পারি নাই। সে সময়ে অনেকগুলি অন্তরায় আমাদিগের অতৃপ্তির হেতুভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, পুনর্বার যবনিকা উত্তোলন সময়ে এগুলির অন্তর্ধান হইবে। প্রতি মাসে বঙ্গদর্শনের যবনিকা উত্তোলিত হইতে লাগিল, প্রতি মাসে বহু সংখ্যক ব্যক্তি দর্শনী দিয়া অভিনয় দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু আমরা সেই ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শনের অভিনয় দেখিয়া যেরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলাম, কিছুতেই তাহা তিরোহিত হইল না। মধ্যে দুই একটি অভিনয় আমাদিগের কিছু হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, কিন্তু সাধারণ্যে বিবেচনা করিলে ইহাই বলিতে হয় যে বঙ্গদর্শনের কোনও অভিনয় বঙ্গীয় সাহিত্য রঙ্গের উৎকর্ষ সাধক হয় নাই।

সম্প্রতি শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শন আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পূর্বে যেরূপ হইয়া থাকে, এখানি পাঠ করিয়াও সুখিত হইতে পারিলাম না। এবারকার বঙ্গদর্শনে যে সমুদয় দোষ দৃষ্ট হইল, এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।'

—সোমপ্রকাশ: ২১ শ্রাবণ ১২৮০

এ সমালোচনা স্পষ্টতঃই বিরোধিতামূলক। ত্রুটি প্রদর্শনই এই সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

বঙ্গদর্শনে ১২৮০-র শ্রাবণ সংখ্যায় যে সকল রচনা প্রকাশিত হয় তা প্রদত্ত হল—

জন ষ্টুয়ার্ট মিল (প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র, হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয় (প্রবন্ধ)—রামদাস সেন, জাতিভেদ (প্রবন্ধ)—শ্রীযঃ, চন্দ্রশেখর (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র, স্বপ্ন প্রয়াণ (কাব্য)—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গর্দভ (রচনা)—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

চন্দ্রশেখর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমের দ্বিতীয় ধারাবাহিক উপন্যাস। ইতিপূর্বে বিষবৃক্ষ উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে ১২৭৯-র ফাল্গুন সংখ্যায়। অতঃপর ওই বৎসরের চৈত্রে ইন্দিরা সম্পূর্ণ এবং ১২৮০-র বৈশাখে যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাস সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। ১২৮০-র শ্রাবণ থেকে নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস চন্দ্রশেখরের সূচনা। বঙ্গদর্শনে

বঙ্কিমের উপন্যাস ছিল একটি মস্ত বড় আকর্ষণ। বিষবৃক্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি সকলেরই স্মরণ আছে, 'তখন বঙ্গদর্শন-এর ধুম লেগেছে, সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল, কী হবে, দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা। বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলায় কারও ঘুম থাকত না।'

সোমপ্রকাশের সমালোচকও অন্যান্য রচনার তুলনায় বঙ্কিমের উপন্যাস আলোচনাতেই বেশি স্থান গ্রহণ করেন দেখা যায়। এখন প্রশ্ন সোমপ্রকাশ কেন অকস্মাৎ বঙ্গদর্শনের এই শ্রাবণ সংখ্যাটি সমালোচনে প্রবৃত্ত হল? যদি বিষবৃক্ষের সমাপ্তির পর (১২৭৯ ফাল্গুন) বা ১২৭৯-র শেষ সংখ্যা (ইন্দিরা প্রকাশিত) অথবা ১২৮০-র প্রথম বৈশাখ সংখ্যার (যুগলাঙ্গুরীয় প্রকাশিত) সমালোচনা সোমপ্রকাশে মুদ্রিত হত তা হলে এ প্রশ্ন তুলতাম না। আসলে মনে হয় সমাপ্ত উপন্যাসের সমালোচনা অপেক্ষা যে উপন্যাসের সদ্য সূত্রপাত ঘটেছে তার সমালোচনায় সোমপ্রকাশের ঔৎসুক্য বেশি। বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রভাব বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গের উপর কিরূপ ক্রিয়াশীল তা সোমপ্রকাশের অজানা থাকবার কথা নয়। সুতরাং যে উপন্যাসের সবে সূচনা ঘটেছে সে লেখা সম্পর্কে যা খুসী বলার সুযোগ অনেক। সোমপ্রকাশ বুঝেছে বঙ্কিমের উপন্যাস থেকে পাঠকের মনকে সরিয়ে আনতে পারলেই তার কার্য সিদ্ধ হয়, উদ্দেশ্য সফল হয়। বঙ্গদর্শনের জনপ্রিয়তা রোধ করা সম্ভব হয়। কিন্তু সোমপ্রকাশ মূলেই ভুল করেছিলেন—কারণ বঙ্গদর্শনের পাঠক কেবল বঙ্কিমের উপন্যাস পাঠের জন্যই বঙ্গদর্শন ক্রয় করেন নি। যাই হোক দেখা গেল, চন্দ্রশেখর উপন্যাসের সূচনাপর্বে বঙ্গদর্শনের প্রতি সোমপ্রকাশের এই দ্বিতীয় আক্রমণ। চন্দ্রশেখর সমালোচনাকালে বিষবৃক্ষ উপন্যাসটিও পুনর্বার আক্রান্ত হয়। সোমপ্রকাশের সমালোচনা উদ্ধৃত হল :

'চন্দ্রশেখর ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস। সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী হইতে এটি বিনির্গত হইতেছে। প্রস্তাবিত সংখ্যক বঙ্গদর্শনে চন্দ্রশেখরের 'শৈবলিনী' 'দলনীবেগম' ও 'লরেন্স ফস্টর' নামে তিনটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত বিষবৃক্ষের প্রারম্ভেই যেরূপ মুক্তহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, চন্দ্রশেখরে সেরূপ করা হয় নাই। গ্রন্থনের সূচনায় সমুদয় কথা খুলিয়া বলিলে যে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয় না, বিষবৃক্ষ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বস্তুত বঙ্কিমবাবু সময়ে সময়ে বাঙ্গলা গ্রন্থগুলিকে যেরূপ 'অপাঠ্য' বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহার বিষবৃক্ষও সেইরূপ 'অপাঠ্য' হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক,

চন্দ্রশেখরের অতি অল্প অংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা ইহার গ্রন্থন চাতুরী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাহি না। উপাখ্যানের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার শৈবলিনীকে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। এই শৈবলিনী চরিত্র আমাদিগের একান্ত রুচিবিকার জন্মাইয়া দিয়াছে। বঙ্কিমবাবু যেরূপ জঘন্যভাবে শৈবলিনীকে চিত্রিত করিয়াছেন, এরূপ জঘন্য ভাব গৃহস্থ বাঙ্গালী কামিনীতে দৃষ্ট হয় না। এটি বঙ্কিমবাবুর অসহৃদয়তা ও উদ্ভাবনী-শক্তি ক্ষীণতার পরিচায়ক। ফলে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগ্রন্থনচাতুরী যে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে, তাহার রচিত উপন্যাসগুলিই তাহার সাক্ষীস্বরূপ।'

চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমবাবু স্বীয় ইংরাজী বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন। এতন্নিবন্ধনই লরেন্স ফর্স্টরের ইংরাজী কথার 'ছড়াছড়ি' হইয়াছে। দীনবন্ধু বাবু উড়িয়া ভাষায় অভিজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ লীলাবতীতে রঘুয়াকে প্রবেশিত করিয়া যেরূপ উপহাসিত হইয়াছেন, বঙ্কিমবাবু ফর্স্টরের ইংরাজী কথার ছড়া বান্দিয়া সেইরূপ উপহাসভাজন হইলেন সন্দেহ নাই। লরেন্স ফর্স্টর ইংরেজ। তাহার মুখ হইতে বাঙ্গলা কথা বহির্গত হইলে যদি পাত্রানৌচিত্য দোষ ঘটে, এই ভয়ে কি লেখক ইংরাজীর অবতারণা করিয়াছেন? তাঁহার অন্তঃকরণে যদি এই ভয় থাকিত, তাহা হইলে দুর্গেশনন্দিনীতে জগৎ সিংহ, ওস্‌মান খাঁ প্রভৃতির মুখ হইতে তাহাদিগের দেশীয় ভাষা বহির্গত হইল না কেন? কপালকুণ্ডলাতে দিল্লীশ্বরের মুখ হইতেই বা পারস্য ভাষা নির্গত হইল না কেন? কপালকুণ্ডলাতে এক সময়ে কাপালিকের মুখ হইতে 'কস্ত্বং' 'মামনুসর' প্রভৃতি সংস্কৃত কথা বহির্গত হইল, পরক্ষণেই আবার সমাসবহুল বাঙ্গলার অভিনয় আরম্ভ হইল, এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার কেন? এটি কি সামাজিকতার অনুমোদিত? ফলে সাধারণে এইরূপ বিশ্বাস করিবেন রাজপুত ভাষা প্রভৃতিতে বঙ্কিমবাবুর অধিকার নাই; এতন্নিবন্ধন তিনি জগৎ সিংহ প্রভৃতিকে বাঙ্গালী ভাবাপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজী ভাষা, লেখকের প্রধান উপাস্যদেবতা। ইংরাজী অনুশীলনেই ইঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। ইংরাজী ভাব, ইংরাজী ভাষা গ্রন্থকারের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছে। এই ইংরাজীর কোনরূপ অমর্যাদা করিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। এতন্নিবন্ধন লেখক লরেন্স ফর্স্টরকে রঙ্গভূমিতে আনিয়াই ইংরাজীর উপাসনা পূর্বক বলিয়াছেন 'আই কম এগেইন ফেয়ার লেডী' এইরূপ সাধারণ বিশ্বাসে কি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের গুণসমূহ অপহৃত হয় না?

—সোমপ্রকাশ ২১ শ্রাবণ ১২৮০

বঙ্কিম তৎকালে বাংলা ভাষা অবলম্বনে বাঙালীর হৃদয়রাজ্যে যে আলোড়নের জোয়ার প্রবাহিত করেছিলেন তাকে উপলব্ধি করা সোমপ্রকাশ-সমালোচকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। উপন্যাসে ইংরেজের মুখে 'আই কম এগেইন' বসালে ইংরেজির 'ছড়াছড়ি' হয় না। যে মহৎ আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে বঙ্কিমের রচনা সেদিন সঞ্চালিত হয়েছিল তা গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিষবৃক্ষ ও চন্দ্রশেখর উপন্যাস প্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকা সম্পর্কে একদিন রবীন্দ্রনাথ যা বিবৃত করেছিলেন এখানে উদ্ধৃত করি—

'যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোন নূতন তত্ত্ব, নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দসম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ-পঁচিশ বৎসরকাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত, বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী কমলমণি-রূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

—'শিক্ষা' 'শিক্ষার হেরফের'

চন্দ্রশেখর ব্যতীত বঙ্গদর্শনের অন্যান্য রচনাও সোমপ্রকাশে সমালোচিত হয়েছে। 'জন ষ্টুয়ার্ট মিল' যেন তেন প্রকারেণ সম্পন্ন, 'হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়' কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের উদ্গার মাত্র, 'স্বপ্নপ্রয়াণ' জঘন্য পদ্য, 'গর্দভ' বঙ্গদর্শনেরই অনুরূপ, 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' নিতান্ত চপলতাদোষে দুষ্ট—পরের দোষগ্রাহী মাত্র—এই হল বঙ্গদর্শন সম্পর্কে সোমপ্রকাশের সমালোচনা। 'জাতিভেদ' প্রস্তাবটা নিতান্ত মন্দ হয় নি, কিন্তু সোমপ্রকাশের মতে তাও সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয়।

'গর্দভ' শীর্ষক রচনাটি সম্পর্কে সোমপ্রকাশের মন্তব্য উদ্ধৃত করি—

'বঙ্গদর্শনের যেরূপ মাহাত্ম্য !!! গর্দভ স্তোত্রটি তাহার অনুরূপই হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। গর্দভবুদ্ধি যখন যাহার ঘাড়ে চাপে সে সময়ে তিনি যে গর্দভবৎ ব্যবহার করেন তাহা আশ্চর্যের নহে। বঙ্গদর্শন গর্দভবুদ্ধি বিশিষ্ট হওয়াতেই গর্দভের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। হিতচিকীর্ষু বন্ধুর মনোরঞ্জন না করা কৃতঘ্নের কার্য। গর্দভ বঙ্গদর্শনকে নিজের বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং তাহার মনোরঞ্জনার্থ স্তব না করিলে অকৃতজ্ঞতার দোষে দূষিত হইতে হয়। পরিহাস দূরে থাকুক, বঙ্গদর্শন যাহাদিগকে গর্দভ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিয়াছেন, স্বয়ং তাহাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। সম্বাদপত্রের সম্পাদকগণ বঙ্গদর্শনের লেখকগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত, সন্দেহ নাই। ইঁহাদিগকে এইরূপ উপহাস করা যারপরনাই অন্যায় হইয়াছে।'

—সোমপ্রকাশ ২১ শ্রাবণ ১২৮০

সম্ভবতঃ এই সমালোচনা পাঠ করেই বঙ্কিমকে পরের সংখ্যাতেই উত্তর দিতে হয়। বঙ্কিমের মন্তব্য উদ্ধার করি—

'এ দেশের সাধারণ লোকের সংস্কার আছে যে রহস্য প্রবন্ধ মাত্রেই কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি লক্ষিত হয়—কোন বিশেষ ব্যক্তিকে গালি না দেওয়া হইলে রহস্য কোথায়? এইরূপ কুসংস্কারবিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি, বঙ্গদর্শনে যে 'গর্দভ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল, ব্যক্তিবিশেষ তাহার উদ্দিষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছেন। সে সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কেহ ভদ্রলোক থাকেন তবে তাঁহাদিগের নিকট নিবেদিত হইতেছি যে ঐ প্রবন্ধের কোন অংশে ব্যক্তিবিশেষ লক্ষিত হয় নাই।'

—বঙ্গদর্শন ভাদ্র ১২৮০

সোমপ্রকাশে ১২৮০-র ২১ শ্রাবণ সংখ্যার পর 'বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে' শিরোনামে দুটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয় ৩ ভাদ্র ও ১০ ভাদ্র তারিখের সংখ্যায়। প্রথম চিঠি বঙ্গদর্শনের সমর্থনে এবং দ্বিতীয় পত্র সোমপ্রকাশের সমর্থনে লিখিত। বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে এই সকল পত্রযুদ্ধ আজ সম্পূর্ণ ইতিহাসের সামগ্রী। সোমপ্রকাশ থেকে পত্র দুটির কিছু অংশ এখানে সংগৃহীত হল। প্রথম পত্র—

'কুক্ষণে বঙ্গদর্শন 'বিদ্বেষভাবপরবশ' জনসমাকীর্ণ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমালোচনা শুনিতে শুনিতে শ্রবণবিবর কলুষিত হইল। যখনি কেহ কোন প্রস্তাব না পান বঙ্গদর্শনের খানিকটা নিন্দাবাদ করিয়া বা তৎসম্পাদককে গালি দিয়া চিত্তপ্রসাদন করেন। আমরা অনেকবার দেখিয়াছি যে, কোন কোন সম্বাদপত্র সম্পাদকও এই প্রলোভন এড়াইতে পারেন নাই। আমরা এক্ষণে

তৎসমুদয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত নহি, তবে কর্তব্যানুরোধে ও কৃতজ্ঞতার উত্তেজনায় সাধারণতঃ গুটিকত কথা বলিব। ভরসা করি মহাশয় পত্রস্থ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।···

কতকগুলি নিন্দুক সর্বদাই বলিয়া থাকেন যে বঙ্গদর্শনের লেখকগণ মিথ্যাবিদ্যা-ভিমানী, কিন্তু আমরা তাহাদিগের কথায় বড় আস্থা করি না, যেহেতু বঙ্গদর্শন নিজেই নিজ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সহস্র কথা বলিলেও নিন্দুক নিন্দুকই থাকিবে। তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না কিন্তু যাঁহারা সদাশয় ও সহৃদয় তাঁহারা আমাদিগের বাক্যের যথার্থ অনুভব করিবেন। ইতিপূর্বে বঙ্গভাষায় যে কয়খানি পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহার সমস্ত না হউক, অধিকাংশই অপাঠ্য। জনকয়েক সুপ্রসিদ্ধ লেখক প্রণীত পুস্তকাবলী ভিন্ন এমন একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিতে পারিবেন না যাহা যথার্থই পাঠ্য বা হৃদয়গ্রাহী। আমাদিগের কথায় আস্থা না জন্মে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ উল্লোড়ন করিয়া দেখুন। এ অভাব যে কতদিনে পূর্ণ হইবে, তাহা দুরনুমেয়। বোধহয় এ অভাবের নিমিত্তই বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি এবং তাহা যে আংশিকরূপে সিদ্ধ হইতেছে কে অস্বীকার করিবে? 'ভারত কলঙ্ক' 'উদ্দীপনা' 'উত্তরচরিত' 'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত' 'বঙ্গদেশের কৃষক' 'সাঙ্খ্য দর্শন' 'সাম্য' 'ধর্মনীতি' প্রভৃতির ন্যায় প্রস্তাব বাঙ্গালায় অতি বিরল, দেখাই যায় না। এই সকলের ন্যায় উন্নতভাব লিপিপ্রণালী আমাদিগের নেত্রে কখনই পড়ে নাই। পরন্তু লেখার পারিপাট্যে বঙ্গদর্শন অতুল্য ও অননুকরণীয়। বঙ্গভাষায় যে কয়েকখানি সাময়িকপত্র দৃষ্ট হয় কেহ ইহার সমকক্ষ বা নিকটস্থ হইতে পারে না। বঙ্গদর্শন যেরূপ সর্বাঙ্গীণ লোকের মনোরঞ্জন করে কোন পত্র তদ্রূপ কখনই পারে নাই। ইহাতে অনেকে আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন এবং আমাদিগকে বঙ্গদর্শনের স্তাবক মনে করিবেন করুন; কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করিতেছি যে যাঁহারা এ কথায় আস্থা না করেন তাঁহারা বঙ্গদর্শনের অন্তরেই প্রবেশ করেন নাই।···

আপনার পত্রপ্রেরক চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত নহি কারণ এখানি অসম্পূর্ণ। কেবল দুই একটি কথা বলিয়া আমরা আপাততঃ ক্ষান্ত হইব। চন্দ্রশেখরে বর্ণিত লরেন্স ফস্টর সম্বন্ধে তিনি বলেন যে বঙ্কিমবাবু লরেন্স ফস্টরকে চিত্রিত করিয়া নিজ ইংরাজি শিক্ষার পরিচয় প্রদানে ইচ্ছুক হইয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্যই বুঝিতে পারেন নাই। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য যে কয়টি ব্যক্তির অবতারণা করা যাইবে তাহাদিগের চরিত্র সম্যক চিত্রিত করা। এতদ্বিষয়ে যিনি কৃতকার্য তিনিই উৎকৃষ্ট

আখ্যায়িকা লেখক। বঙ্কিমবাবু এ বিষয়ে যেরূপ পারদর্শী তাঁহার প্রণীত উপন্যাস-গুলিই ইহার সাক্ষী। ফলতঃ চরিত্র প্রণয়ন করিতে তাঁহার সমকক্ষ লেখক বাঙ্গালায় কেহ নাই। তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার ক্ষমতা প্রভাবে ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে। লরেন্স ফস্টর ইংরাজ। তাহারা স্বভাবতই চঞ্চল বা অধৈর্য, সেই চিত্র চিত্রিত করিবার নিমিত্তই বঙ্কিমবাবুর তন্মুখনিঃসৃত ইংরাজির অবতারণা। যে সময়ের বর্ণনায় এই আখ্যায়িকা প্রবৃত্ত সে সময়ে ইংরাজেরা নূতন বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিয়াছে। তাহারা বাঙ্গালীদের প্রকৃতি বা ভাষা তখনও সম্যক অবগত নহে, কেবল তাহাদিগের বাঙ্গালী কর্মচারীর সংসর্গ যাহা কিছু শিখিয়াছিল। চন্দ্রশেখরেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। লরেন্স ফস্টর কিরূপ প্রকৃতির মনুষ্য তাহার প্রযুক্ত দুই কথাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ প্রকার চিত্র সামান্য ক্ষমতার পরিচয় নহে। 'আই কম এগেইন ফেয়ার লেডি' বলার তাৎপর্য এই—লরেন্স ফস্টর মনে করিয়াছিলেন যে শৈবলিনী কুঠীর কর্মচারীদিগের ন্যায় তাহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে; কিন্তু যখন দেখিলেন শৈবলিনী সে প্রকৃতির নহে, তখন আপনার ক্ষমতানুযায়ী বাঙ্গালা বলিলেন। ইংরাজদিগের স্বভাবই এইরূপ যাহারা তাহাদিগের সংসর্গ করিয়াছেন এ কথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। নতুবা ইংরাজি শিক্ষার পরিচয় এই সামান্য কথা দ্বারা প্রদত্ত হইতে পারে না।...

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় সম্পাদক যাহা বলেন তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। সাধারণতঃ যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে তাহার অধিকাংশ যথার্থই অপাঠ্য তাহাতে ভাষার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং অবনতি হয়। তবে যেগুলি যথার্থ ভাল সম্পাদকও তাহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

উপসংহারকালে আমরা বঙ্কিমবাবুর এই উদ্যমকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি যেরূপ বিদ্যাবান ও লিপিকুশল বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট অনেক আশা করেন। নিন্দুকে যাহা বলে বলুক তাহাতে তাঁহার উদার হৃদয় যেন একবার মাত্রও বিচলিত না হয়। তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্পাদনার্থ পূর্বের ন্যায় অভিহিত চিত্ত থাকুন। বঙ্কিমবাবু ও বঙ্গদর্শনের অন্যান্য লেখকবর্গের 'জয় জয়কার হউক'। তাঁহারা বঙ্গভাষার দুর্দশা দেখিয়া তৎসংস্কারার্থ কটিবদ্ধ হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগের মঙ্গলাচরণ করিতেছি। তাঁহাদিগের লেখনীর উপর সচন্দন পুষ্পবৃষ্টি হউক।'

—সোমপ্রকাশ ৩ ভাদ্র ১২৮০

এই চিঠির জবাবে সোমপ্রকাশের পরের সংখ্যাতেই আর একটি পত্র প্রকাশিত হয়। সেই চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি—

"পত্রপ্রেরকের মতে বঙ্গদর্শন বিশুদ্ধ বাঙ্গালার আদর্শ। যাহাদিগের রুচি বিকৃত তাহাদিগের লেখনী হইতে যে প্রকার অজ্ঞাতস্থলভ অদ্ভুত বাক্য নির্গত হইবে তাহা আশ্চর্যের নহে। বঙ্গদর্শন কিসে বিশুদ্ধ বাঙ্গালার আদর্শ হইল, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়াতে ভাষার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত অবনতি হইবার সূত্রপাত হইয়াছে! গৃহপুষ্ট ব্যাকরণ যাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন, যাঁহাদিগের রসময়ী লেখনী হইতে একেবারে কেবলমাত্র সরলতা চমৎকারা সাবধানী শ্যামাঙ্গিনী মহতী আত্মগরিমা প্রভৃতি বাক্যসমূহ অবিশ্রান্ত নির্গত হয়, পত্রপ্রেরকের ন্যায় স্থূলদর্শী হীনবুদ্ধি লোকের নিকটেই তাঁহারা ভাষার আদর্শভূত সংস্কারক !!! কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী সামাজিকগণ সমক্ষে তথাবধি ব্যক্তিগণ ভাষার অমর্যাদাকারক ব্যতিরিক্ত অন্যনামে পরিচিত হইবেন না।···

বঙ্কিমবাবু ইংরাজি বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদানার্থই লরেন্স ফস্টর চিত্রিত করিয়াছেন, পত্রপ্রেরক এরূপ বাক্য কোথায় দেখিতে পাইলেন? প্রতিবাদ স্থলে এইরূপ স্বকপোলকল্পিত বাক্য উপন্যস্ত করা কি ধীর জনোচিত কার্য? ইহাতে কি অন্তঃসার শূন্যতা ও বিবাদ-প্রিয়তা পরিস্ফুট হয় না? বঙ্কিমবাবু অবশ্যই কোন গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত চন্দ্রশেখরের ফস্টর চিত্র পাঠকগণ সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন! আমরা ইহার অপলাপ করিতেছি না। পত্রপ্রেরকগণ আমাদিগের লেখার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া অযথা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ ঔদ্ধত্য অসমীক্ষ্যকারিতা নিতান্ত ক্ষোভজনক। আমাদিগের আক্ষেপ এই, বঙ্কিমবাবু ফস্টর চিত্রে ইংরাজি কথা দিয়া নিরতিশয় অসহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, আচার ব্যবহার বর্ণন দ্বারা কি ব্যক্তিগত চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত হয় না? ইংরাজির ছড়া না বান্ধিয়া ব্যবহার কি ফস্টরের চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হইতে পারে না? পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন লরেন্স ফস্টর এদেশের ভাষা ভাল জানিতেন না বলিয়াই ইংরাজির অবতারণা করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, জগৎসিংহ ওসমান খাঁ জাহাঙ্গির কি সংস্কৃত কালেজ নর্মাল স্কুল প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া কি সমাসবহুল বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন?···

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ব্যপদেশে বঙ্গদর্শন সময়ে সময়ে নিতান্ত অধীরতার পরিচয় দিয়া থাকেন। সমালোচন স্থলে ধীরতা সহকারে দোষ প্রদর্শন করা কর্তব্য। কিন্তু জগদীশ্বর বঙ্গদর্শনের কোষ্ঠিতে এই 'ধীরতা' লিখেন নাই। পত্রপ্রেরক একস্থলে লিখিয়াছেন, সম্পাদক সমালোচন স্থলে যাহা বলেন, তাহার

এক বর্ণও মিথ্যা নয়। যিনি এরূপ মোহান্ধ পক্ষপাতী তিনি যে বঙ্গদর্শনকে বঙ্গভাষার শিরোমণি বলিয়া নির্দেশ করিবেন, তাহা আশ্চর্যের নহে।'

—সোমপ্রকাশ ১০ ভাদ্র ১২৮০

সোমপ্রকাশে বঙ্গদর্শন সম্পর্কে দুটি মাত্র চিঠি মুদ্রিত হলেও বস্তুতঃ পত্রিকার দপ্তরে এ-বিষয়ে বহুসংখ্যক চিঠিপত্র জমা পড়েছিল। স্বভাবতই পত্রিকার পক্ষে এত চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে সম্পাদকের নামে যে বহু চিঠিপত্র আসে তা সোমপ্রকাশের বিবৃতি থেকে জানতে পাই। ২৪ ভাদ্র তারিখে 'বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গসমাজের উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা?' শিরোনামে সোমপ্রকাশের মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে পত্রিকায় সমালোচনা ও চিঠিপত্র মুদ্রিত হয়েছে, এবার বঙ্গদর্শন সম্পর্কে সোমপ্রকাশ স্বীয় মতামত প্রকাশ করলেন—

'বঙ্গদর্শন বালক বলিয়া আমরা এতদিন উহার বিষয়ে কোন কথা কহি নাই, মৌনাবলম্বী হইয়া উহার রঙ্গদর্শন করিতেছিলাম। সম্প্রতি কএকজন পত্রপ্রেরক আমাদিগের সেই মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া দিলেন। কএক সপ্তাহকাল বঙ্গদর্শনের প্রশংসা ও নিন্দাপূর্ণ এত প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্তে আসিতেছে আমরা যদি উহার সমুদায়গুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত করি, সোমপ্রকাশে অন্য বিষয়ের স্থান সমাবেশ হয় না। বঙ্গদর্শনের এরূপ শত্রু ও মিত্র বৃদ্ধির কারণ কি? আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম বঙ্গদর্শন কাহাকে মানুষ জ্ঞান করেন না, সকলেরই নিন্দা করেন, উহাই তাঁহার শত্রু ও মিত্র উভয় বৃদ্ধিরই একমাত্র কারণ। আমাদিগের সমাজের অধিকাংশ লোকের রুচি আজিও সংস্কৃত হয় নাই। অনেকে অন্যের নিন্দা ভালবাসেন। যে লেখায় পরের নিন্দা থাকে, তাঁহারা আদরপূর্বক তাহা পাঠ করিয়া থাকেন। বঙ্গদর্শনের লেখকেরা বুদ্ধিমান লোক, তাঁহারা সমাজের এই গতিটি সুন্দররূপে বুঝিয়া লইয়াছেন। লোকে তুষ্ট হইবে বলিয়া তাঁহারা বঙ্গদর্শনকে বড়লোকের নিন্দা পরিহাস ও গালি বর্ষণাদি দ্বারা পরিপূরিত করিয়া থাকেন।...এই নিন্দায় বঙ্গদর্শনের লেখকদিগের গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়া স্বার্থ সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা সমাজের একটি মহৎ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। বঙ্গদর্শন পাঠে লোকের রুচির সংস্কার না হইয়া রুচির বিকার জন্মিতে চলিল। যে সকল লোকের পরনিন্দা শ্রবণে অনুরাগ ও প্রবৃত্তি আছে তাহা উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। সাময়িকপত্র সম্পাদকদিগের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত এরূপ ব্যবহার একান্ত অনুচিত। যাহাতে দেশের লোকের রুচি সংশোধন হয়, তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্তব্য। বঙ্গদর্শনের লেখকেরা বিপরীত পথগামী হইয়াছেন। তাঁহারা লোকের কুপ্রবৃত্তির

যে প্রকার উদ্দীপন করিয়া দিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের পিলোড়ি দণ্ড হওয়া উচিত। ইউরোপ খণ্ডে হইলে ঠিক পিলোড়ি দণ্ড না হউক ঐরূপ একটি দণ্ড হইত সন্দেহ নাই। যাঁহাদিগের রুচি মার্জিত হইয়াছে তাঁহারা বঙ্গদর্শনের এই দোষ দর্শন করিয়া শত্রু হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা এই দোষ প্রদর্শন করিয়া বঙ্গদর্শনকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা পাইতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা সান্নিপাতিক বিকারে বীর্যবান ঔষধের ন্যায় বিফল হইতেছে।…উপসংহারকালে পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি বক্তব্য এই তাঁহারা বঙ্গদর্শন সংক্রান্ত পত্রপ্রেরণ করিয়া আমাদিগের সময় ক্ষতি ও সোমপ্রকাশের স্থান গ্রহণ চেষ্টা না করেন।'

—সোমপ্রকাশ ২৪ ভাদ্র ১২৮০

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ থেকে ১২৮২ পর্যন্ত চার বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদন করেন। অতঃপর ১২৮৪-র বৈশাখ থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হতে থাকে। সোমপ্রকাশে ১২৮৫-র ১৪ শ্রাবণ তারিখে 'বঙ্গদর্শন এবং বাঙ্গলা গ্রন্থকার' শিরোনামে একটি পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রে বঙ্কিম ও সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের পুস্তক সমালোচনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। পত্রের সূচনা এইরূপ—

'বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশ অবধি এ পর্যন্ত কত গ্রন্থকার যে ইহার নিকট অভদ্রোচিত তিরস্কার লাভ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গদর্শনের পাঠক মাত্রেই জানেন। তথাপি কি সাহস, কি বিবেচনায় তাঁহারা বঙ্গদর্শনে সমালোচনার জন্য আপন আপন পুস্তক পাঠান, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।'

—সোমপ্রকাশ ১৪ শ্রাবণ ১২৮৫

এই পত্রের একস্থানে লেখক যা বলেছেন তা তথ্যের দিক থেকে ঠিক নয়। চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করি—

'অপাত্রের সঙ্গে সৎপাত্রকেও সময়ে সময়ে বঙ্কিমবাবু তাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন; দৃষ্টান্ত স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য। আমরা বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠে স্বপ্নপ্রয়াণের নাম দেখিয়া মনে করিলাম, বুঝি ভিতরে ইহার সমালোচনা আছে। কিন্তু বই খুলিয়া দেখি, কয়েকটি শ্লোকমাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ কি? অর্থ যিনি যাহা মনে করুন, আমরা বুঝিলাম যে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য বঙ্গদর্শনের সমালোচনার যোগ্য নহে; কেননা ইহাতে কামমুগ্ধ যুবক-যুবতীর প্রেম ঢালাঢালি নাই। তবে, দ্বিজেন্দ্রবাবু একজন বড় লোক, তাঁহার কাব্যকে একেবারে উল্লেখ না করা সহজ কথা নয়। অতএব ভালমন্দ কিছু না বলিয়া বঙ্গদর্শনে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল, পাঠকগণ ভালমন্দ বাছিয়া লউন। কেমন, এই অর্থ না?'

—সোমপ্রকাশ ১৪ শ্রাবণ ১২৮৫

১২৮৫-র শ্রাবণের পূর্বে বা পরবর্তীকালেও সমগ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার কোনো সংখ্যাতেই 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের কোনো সমালোচনা প্রকাশিত হয় নি। ১২৮৫-র শ্রাবণ মানে ইং ১৮৭৮-এর জুলাই। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে; অর্থাৎ ১২৮২ বঙ্গাব্দে। সুতরাং এর পূর্বে বঙ্গদর্শনের পুস্তক সমালোচনা বিভাগে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের আলোচনার কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। সোমপ্রকাশের পত্রলেখক বলেছেন, বঙ্গদর্শনে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের কোনো সমালোচনা না করে উক্ত কাব্য থেকে কয়েকটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। পত্রলেখক বঙ্গদর্শনের যে সংখ্যার কথা মনে করে বলেছেন সেটি ১২৮০-র শ্রাবণ (১৮৭৩ খ্রী), বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা। এই সংখ্যার বঙ্গদর্শনেই দ্বিজেন্দ্রনাথ রচিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের প্রথম সর্গটি প্রকাশিত হয়।[১] এর দু বৎসর পর সমগ্র কাব্য পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। সুতরাং ১২৮০-র শ্রাবণে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের সমালোচনার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

যাই হোক, বঙ্গদর্শনের পুস্তক সমালোচনা বিভাগটিকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যেই যে এই পত্র সোমপ্রকাশে মুদ্রিত হয়েছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম সম্পর্কে একস্থানে বলেছিলেন—

'মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা ছাড়িত না। কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নি।'

—রবীন্দ্রনাথ। 'আধুনিক সাহিত্য'

বঙ্গদর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের উক্তি—

'নিরপেক্ষ সমালোচনায় দেশ আমার শত্রু হয়ে উঠেছিল—গালাগালির ত কথাই নেই, কোন কোন গ্রন্থকার আমাকে মারবে বলে সঙ্কল্প করেছিল। I am the worst abused man next only to Sir George Cambell.'

—নবীনচন্দ্র সেন। 'আমার জীবন'

বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে বঙ্কিম ও তাঁর অমিত্রবর্গের মধ্যে যে সংগ্রাম একদা দানা বেঁধে উঠেছিল, তাতে যে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমই বিজয়ীর গৌরব অধিকার করেন তা আমাদের কারোর অজানা নয়। বিদ্রোহী সোমপ্রকাশের স্বরও ধীরে ধীরে

১ 'আমি যখন প্রথম স্বপ্নপ্রয়াণ রচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহার কোনও অংশ বঙ্কিমবাবুকে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহার বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিবার জন্য।' —দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'পুরাতন প্রসঙ্গ'

পরিবর্তিত হয়েছিল। শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ পায়। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় একজন 'যথার্থ যোগ্যপাত্র' সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত ও সম্মানিত হোন—সোমপ্রকাশ এই দাবি তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের প্রতি নিবেদন করেন। ১২৮৭-র সোমপ্রকাশ পত্রে 'বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শিরোনামে যে রচনাটি মুদ্রিত হয় তা বর্তমান অধ্যায়ের উপসংহার হিসেবে উদ্ধৃত হল। মধুরেণ সমাপয়েৎ।—

'রাজকর্মচারীগণের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হন, এটি সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হইলে যেমন ইষ্ট ও সুখের কারণ হয়, অযোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হইলে সেইরূপ অনিষ্ট ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত হইলে অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ দৃষ্টান্ত দেখিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য করিতে তৎপর হন, অযোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত হইতে দেখিলে তাঁহারা নিরুৎসাহ হইয়া স্বীয় কর্তব্যকর্মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে থাকেন। অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পৃথিবীতে অনেক উৎকৃষ্ট হীরক পাওয়া যায়। যাঁহারা রাজাজ্ঞা বা কহিনুরকে সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য মনে করেন, তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত আছেন। ভারতের প্রিয়রত্ন বঙ্গদেশের প্রিয়পুত্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সমাজের রত্নমুকুট, বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের অন্যতম ভূষণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. কাঁটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায় কুলকেশরী হুগলীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শীর্ষ লিখিত শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ই অদ্য আমাদিগের প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য। মানবগণ সুশিক্ষিত হইলে যে সকল গুণগ্রামের অধিকারী হন, বঙ্কিমবাবুতে তাহার অনেকগুলি গুণ আছে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সমাজের রত্নমুকুট। স্বাধীনচিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, তীক্ষ্ণদর্শিতা প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হওয়া যায়, বঙ্কিমবাবুর সে সমস্ত গুণই আছে আবার যে বিচারপতি আত্মীয় বন্ধুবান্ধব বা অনুগত ব্যক্তিগণের স্বার্থপরতামূলক চীৎকারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অথবা উপরি পদস্থ কর্তৃপক্ষগণের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত না হইয়া পক্ষপাতশূন্য হইয়া নির্ভয়চিত্তে অকম্পিত হস্তে বিচারের তুলাদণ্ড ধারণ করিতে পারেন; তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচারকতা ও তেজস্বিতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমরা বঙ্কিমবাবুর এই গুণটি দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হই। ইঁহার সকল কার্যেই বহুদর্শিতা আছে। ফৌজদারী মোকদ্দমায়, কি কালেক্টরী কার্যে, কি ট্রেজরীর কার্যে, কি আবগারীর কার্যে. কি মিউনিসিপাল কার্যে বঙ্কিমবাবুকে যে

কার্যেই নিয়োজিত করা হউক, ইনি সকল কার্যেই দক্ষ ও পটু। আমরা স্বজাতি পক্ষপাত দোষে দূষিত হইয়া কহিতেছি না। সত্য কথা বলিতে কি, অনেক ইংরেজ ফুল ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষাও বঙ্কিমবাবু যোগ্য ও বহুদর্শী একজিকিউটিভ অফিসার। বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের কথা দূরে থাকুক, আমরা জানি অনেক জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও অফিসিয়েটিং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য বিশেষে গোলযোগ হইলে বঙ্কিমবাবুর মতামত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য বিষয়ে অবসর উপস্থিত। 'গুণী ব্যক্তি' আমাদিগের মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সার এসলি ইডেন মহোদয় গুণগ্রাহী লোক। বিশেষতঃ ইনি বাঙ্গালীদিগের পিতৃস্থানীয়। ইডেন সাহেব গুণ দেখিয়া অন্যান্য বিভাগে অনেক বাঙ্গালীকে উচ্চপদে নিয়োজিত করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। তবে তাঁহার পক্ষপাতশূন্য সুশাসনের সময়ে বঙ্কিমবাবুর সদৃশ ব্যক্তিগণ পুরস্কৃত বা সম্মানিত হন না কেন? এটি নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে।

উপসংহার কালে আমরা মহামান্য ইডেন মহোদয়ের নিকটে নির্বন্ধতাশয় সহকারে নিবেদন করিতেছি, তিনি বঙ্কিমবাবুকে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা তৎসদৃশ একটি একজিকিউটিভ কর্মে নিয়োজিত করিয়া তাঁহার সুবিচার প্রদর্শন করিয়া বঙ্গে অনন্ত কীর্তি রাখিয়া যাউন।'

—সোমপ্রকাশ ১৯ শ্রাবণ ১২৮৭

আমরা এখানে বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ পত্রিকার কথা আলোচনা করেছি। সোমপ্রকাশ ব্যতীত তৎকালীন অন্যান্য পত্রপত্রিকাতেও বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর বঙ্গদর্শন সম্পর্কে নানা চিঠিপত্র সমালোচনা মন্তব্য ও আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি একত্রে সংকলিত ও বিশ্লেষিত হলে লেখক সমালোচক ও সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সমকালীন সাহিত্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর একটি সামগ্রিক পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে মনে করি।

১৫

বন্দেমাতরম্

বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের মধ্যে। আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮২খ্রী)। কিন্তু এর পূর্বে উপন্যাসটি প্রথমে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রে। উপন্যাসের প্রথম কিস্তিতেই গানটি মুদ্রিত হয়েছিল—পত্রিকার ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়, ৫৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায়। এর বছর পাঁচেক পূর্বে ১২৮১-৮২ বঙ্গাব্দে, ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি স্বতন্ত্রভাবে রচিত হয়েছিল। বঙ্কিম যখন বন্দেমাতরম্ গানটি লেখেন সে-সময় তিনি ছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক। ১২৮২ চৈত্র পর্যন্ত বঙ্কিম বঙ্গদর্শন সম্পাদন করেন, অর্থাৎ এই গান ১২৮২ চৈত্রের মধ্যেই রচিত হয়েছিল।

কাঁঠালপাড়া-নিবাসী পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'সে-সময় বঙ্গদর্শনের কার্যাধ্যক্ষ অথবা প্রুফ রিডার অথবা এমনই একটা কাজ লইয়া বঙ্গদর্শনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।' তিনি প্রেসের জন্য বঙ্গদর্শনের কাপি চাইতে সম্পাদক-বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আসেন। বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বলেন 'কাপি লেখা নেই।' রামচন্দ্র তখন বলেন কাপির অভাবে প্রেসের কাজ বন্ধ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন নাকি দ্রুত বন্দেমাতরম্ গানটি লিখে দেন।

এই ঘটনার উল্লেখ করে বঙ্কিম জীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন, 'আমার বিশ্বাস, এ গান ঝটিতি লিখিবার নয়। আত্মস্থ না হইলে—তন্ময় না হইলে—অনুপ্রাণিত না হইলে এ গান লেখা যায় না। তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ লেখকদিগের ন্যায় যা-কিছু একটা লিখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ছাপাইতে দিতেন না।'

এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য মেলে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা থেকে। পূর্ণচন্দ্রের গুরুত্ব শুধু যে বঙ্কিমের ছোট ভাই বলে তা নয়, তিনি বঙ্কিম-

সম্পাদন পর্বে বঙ্গদর্শন পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ; যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে-সময় পূর্ণচন্দ্রই ছিলেন বঙ্গদর্শনের কার্যাধ্যক্ষ, আর এই ১২৮২ বঙ্গাব্দেই পূর্ণচন্দ্রের ধারাবাহিক উপন্যাস শৈশব সহচরী, এবং ১২৮০ জ্যৈষ্ঠে মধুমতী শীর্ষক ছোটগল্প বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল।[১]

এবার পূর্ণচন্দ্রের লেখা থেকে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত রচনার প্রসঙ্গটি উদ্ধৃত করি।

'বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে দুই এক পাত matter কম পড়িলে পণ্ডিতমশায় আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা ঐ দিনেই লিখিয়া দিতেন। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে দুই একটি লোকরহস্যে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশিত হয় নাই। বন্দেমাতরম্ গীতটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিতমহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় এক পাতা matter কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, আচ্ছা আজই পাবে। একখানা কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল, পণ্ডিতমশায়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল বোধ হয় উহা পাঠও করিয়াছিলেন,--কাগজখানিতে বন্দেমাতরম্ গীতটি লেখা ছিল। পণ্ডিত-মহাশয় বলিলেন, বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখা আছে—উহা মন্দ নয় ত—ঐটা দিন না কেন। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।'[২]

বন্দেমাতরম্ ঠিক কোন সালের কোন মাসে রচিত হয় তা সুনিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে অনেকটা অনুমান করা যায়।

বঙ্গদর্শনে ১২৮১ কার্তিক সংখ্যায় কমলাকান্তের দপ্তরের অন্তর্গত আমার দুর্গোৎসব শীর্ষক নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই গদ্য-নিবন্ধে মাতৃমূর্তিকে যে-ভাবে বন্দনা করা হয়েছে তারই কি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ নয় বন্দেমাতরম্ মন্ত্রখানি? মনে হয় আমার দুর্গোৎসব রচনার স্বল্পকালের মধ্যেই বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত রচিত হয়েছিল।

নিম্নে আমার দুর্গোৎসব নিবন্ধটি থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি।

'এই কি মা! হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত

১ বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণকালে বঙ্কিম ১২৮২ চৈত্র সংখ্যায় পূর্ণচন্দ্রের নিকট 'অপারশোধনীয় ঋণ স্বীকার' করেন।

২ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা'।

-দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু নিষ্পীড়নে নিযুক্ত!...এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর জোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব।...এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব, এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব, এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?...এসো আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি।'[৩]

এই রচনাটির মধ্যে কি বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পূর্বাভাস পাওয়া যায় না? উভয় রচনার মধ্যে বিষয়গত প্রভেদ মুখ্যতঃ এই যে গদ্যে যেখানে ছিল 'ছয় কোটি কণ্ঠ' ও 'দ্বাদশ কোটি ভুজ', সেখানে সঙ্গীতে হয়েছে 'সপ্তকোটী কণ্ঠ' ও 'দ্বিসপ্তকোটীভুজ।' এই প্রভেদ থেকে এ কথাও স্বীকার করা যায় যে গদ্য-নিবন্ধটি রচনার পরবর্তী কোনো সময়েই বন্দেমাতরম্ রচিত। অর্থাৎ ১২৮১ কার্তিক ও ১২৮২ চৈত্রের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

শ্রীঅরবিন্দের একটি লেখা থেকেও প্রমাণিত হয় বন্দেমাতরম্ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। 'It was thirty two years ago that Bankim wrote his great song and few listened; but in a sudden moment of awakening from long delusions the people of Bengal looked round for the truth and in a fated moment somebody sang Bandemataram.'[৪]

লেখাটি ১৯০৭-এর। এর থেকে ৩২ বছর বাদ দিলে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

পূর্বেই বলেছি, আনন্দমঠ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৯ বঙ্গাব্দে। ১২৯২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ঠাকুরবাড়ির 'বালক' পত্রিকায় বন্দেমাতরম্ গানের কিয়দংশ ও তার স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকর্ত্রী প্রতিভাসুন্দরী দেবী। বন্দেমাতরম্ গানের ভাব অবলম্বনে 'বালকে'র এই সংখ্যায় পূর্ণ পৃষ্ঠার একটি ছবিও মুদ্রিত হয়। ছবির নীচে লেখা 'বন্দে মাতরং'। স্বরলিপির ভূমিকায় লেখা, 'বঙ্কিমবাবুর রচিত বন্দেমাতরং নামক বিখ্যাত গানটির সমস্তটা দেওয়া গেল না, কারণ উক্ত গানের সুর অত্যন্ত কঠিন, সমস্তটা দিলে পাঠকের সহজে আয়ত্ত হইবে না।'

৩ বঙ্গদর্শন ১২৮১ কার্তিক, পৃষ্ঠা ৩২৬-২৭।
৪ Sri Aurobindo Birth Centenary Edition, Vol. 17, 'Rishi Bankimchandra.'

বালক পত্রিকা বন্দেমাতরম্‌কে বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'বিখ্যাত গান' বলে উল্লেখ করেছেন। আমাদের কৌতূহল-প্রশ্ন, আনন্দমঠ গ্রন্থটি প্রকাশের মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে বন্দেমাতরম্ গানটি এতখানি বিখ্যাত হল কেমন করে, যার ফলে ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত এমন একটি কাগজে সেই গান সচিত্র মুদ্রিত হল স্বরলিপি সহ। এমন কি হতে পারে, বঙ্কিমের এই গান আনন্দমঠে প্রকাশিত হবার আগেই গীত বা প্রচারিত হয়েছিল, এবং ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে দেশবাসীর নিকট এই গান অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছিল। নতুবা প্রায় সদ্য প্রকাশিত নতুন একখানি উপন্যাসের অন্তর্গত একটি সঙ্গীত এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এরূপ বিখ্যাত হয়ে যায় কেমন করে।

বঙ্গদর্শনে বন্দেমাতরম্ গানের সুরের উল্লেখ আছে এই ভাবে—

মল্লার—	কাওয়ালী	তাল
•	১	× ১

যথা—বন্দে মাত র ং ইত্যাদি।

বালক পত্রের নির্দেশ—রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালী।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছেন, 'তাঁর বন্দেমাতরম্ গানে আমিই প্রথমে সুর দিয়ে তাঁকে শোনাই। সবটা আমি গান করি নি। যতটা আমি সুর দিয়েছিলাম ততটা তাঁকে শুনিয়েছি। তিনি তাতে খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন।'[৫]

সরলা দেবীর শতগান গ্রন্থে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের স্বরলিপি আছে। সেই স্বরলিপির সুর রবীন্দ্রনাথ-কৃত—গ্রন্থেই এ নির্দেশ আছে।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন সংগ্রহশালায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ গানটি একটি দুর্লভ সংগ্রহ হিসাবে সযত্নে ধরে রাখা আছে। রবীন্দ্রসদনে বসে সেই গানটি বেশ কয়েকবার শোনবার সুযোগ আমি পেয়েছি। সুমধুরভাষী রবীন্দ্রনাথের সেই ভুবনমনোমোহন কণ্ঠে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি শ্রবণ করা, শুধু বাঙালী নয়—যে-কোন ভারতবাসীর পক্ষেই একটি দুর্লভতম আনন্দময় পবিত্র অভিজ্ঞতা। গানটি শুনতে শুনতে বার বার মনে হচ্ছিল—কবি তাঁর নিজকৃত সুরে উদাত্ত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ গাইছেন, আর স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র গায়কেরই সম্মুখে কোনো একটি উচ্চ আসনে উপবিষ্ট—বিমুগ্ধ—স্তব্ধ—দৃষ্টি যেন কোনো এক দূর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত।

কবির গাওয়া এই গানটি রেকর্ড করা হয়েছিল ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে—এইচ বোসের

৫ বঙ্কিম জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, দ্রষ্টব্য আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪ শ্রাবণ ১৩৪৫।

'টকিং মেসিন'এ। গ্রামোফোন যন্ত্রে গৃহীত এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম কণ্ঠস্বর। রেকর্ডের সময় ২ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ড।

বন্দেমাতরম্ গানটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কবি নবীনচন্দ্র সেনের কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এ সম্পর্কে তাঁর লেখায় জানিয়েছেন, নবীন সেন একবার কথায় কথায় আনন্দমঠের বিখ্যাত বন্দেমাতরম্ গানের একাংশ আবৃত্তি করে বঙ্কিমকে বলেছিলেন—এমন ভাল জিনিসকে আধ সংস্কৃত আধ বাংলা লিখে মাটি করা হয়েছে, এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত। লোকের ভাল লাগে না। এর উত্তরে বঙ্কিম ঈষৎ কুপিত স্বরে বলেছিলেন, 'আচ্ছা ভাই ভাল না লাগে পড়ো না। আমার ভাল লাগে তাই ও রকম লিখেছি। লোকের ভাল লাগবে কিনা ভেবে আমি লিখব!'

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনাতেও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে।

এই ঘটনাটি প্রসঙ্গে স্বয়ং নবীন সেন কি বলেন দেখা যেতে পারে।

'একদিন প্রাতে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তিনি তখন বউবাজারে একটি দ্বিতল গৃহে ছিলেন।...তাঁহার আনন্দমঠ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। আনন্দমঠ তখন বাহির হইয়াছে। আমি বলিলাম—তাঁহার বন্দেমাতরম্ গীত ভারতবর্ষের 'মারসেলেজ গীত' হইবে। তিনি বলিলেন, বটে! উহা তোমার এত ভাল লাগিয়াছে? আমি তখন উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলিলাম যে, উহার মাঝে মাঝে বাংলা লাইনগুলি বসাইয়া তিনি গীতটি মাটি করিয়াছেন। ঐ লাইনগুলি গীতটির প্রাণ ও গাম্ভীর্য নষ্ট করিয়াছে। উহা আমার মোটেই ভাল লাগে না। কেমন খাপছাড়া খাপছাড়া বোধ হয়। আগাগোড়া সরল সংস্কৃত হইলে ভাল হইত। তিনি বলিলেন, বাংলা লাইনগুলি তোমার ভাল না লাগে, উহাদের তুমি বাদ দিয়া পড়িও। আমি বলিলাম, আপনার ঐ দেমাকেই আমরা মারা গেলাম। তখন তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তুমি গানটি গাইতে শুনিয়াছ কি? আমি বলিলাম, না। তিনি, গাইতে শুনিলে তুমি এরূপ বলিবে না।'

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় যে কংগ্রেস অধিবেশন হয় তাতে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গীত হয়েছিল। এই সংবাদটি পাওয়া যায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাখিবন্ধন শীর্ষক কবিতা থেকে। কবিতার শিরোনামের পর তৃতীয় বন্ধনীতে লেখা, 'রচনা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ কংগ্রেস উপলক্ষে'। এই কবিতায় আছে—

প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে

গাহিল—'বন্দে মাতরং ;
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরং...
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরং ।'
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত-জগৎ মাতিল ।

১৮৯৬-এ কলকাতায় পুনরায় যে কংগ্রেস অধিবেশন হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম্ গেয়েছিলেন ।[৬] সেটা বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দু-বছর পরের ঘটনা ।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'আনন্দমঠের মূলমন্ত্র' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । বন্দেমাতরম্‌ই আনন্দমঠের মূল মন্ত্র । বঙ্কিম কালীপ্রসন্নকে একটি পত্রে লেখেন, 'আমি বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব আর আপনি বা তাহার মূল মন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন ? এ ঈর্ষাপরবশ আত্মোদর-পরায়ণ জাতির উন্নতি নাই । বলো বন্দে উদরং ।'

কিন্তু বঙ্কিম সর্বোপরি আশাবাদী ছিলেন । তিনি মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে মন্দিরে মন্দিরে দেশমাতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বঙ্কিম বলেছিলেন 'একদিন দেখিবে—বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এই গান লইয়া বাংলা উন্মত্ত হইয়াছে—বাঙালী মাতিয়াছে ।'

১৯০৮-এর ২৯ জানুঅরি একটি ভাষণে বন্দেমাতরম্ ও তার স্রষ্টা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন,

'He [Bankim] predicted that there would come a time when the whole of India would resound with the singing of the song [Bande Mataram], and the word of the prophet was miraculously fulfilled.'[৭]

---

৬ রবীন্দ্রনাথ ও বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য প্রফুল্লকুমার সরকারের 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ' এবং বর্তমান লেখকের 'অন্যোন্যদর্শন : বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ ।

৭ Sri Aurobindo Birth Centenary Edition. Vol. 1.

বঙ্গদর্শনে সমালোচিত পুস্তক ও সাময়িকপত্র

বঙ্গদর্শন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় তৎকালীন বহু গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার বিবরণ প্রকাশিত-সমালোচনার ক্রম অনুসারে সংকলিত হল।

কা র্তি ক ১২৭৯

ধ্রুবচরিত্র—নিমাইচাঁদ শীল, নটনন্দিনী—হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ—তারকনাথ চক্রবর্তী, মেঘদূতম্—প্রাণনাথ পণ্ডিত, প্রথম শিক্ষা বীজগণিত—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ইউরোপে তিন বৎসর (লেখকের নামোল্লেখ নেই), মুখুর্যার মাগেজিন, বেঙ্গাল মাগেজিন, সঙ্গীতলহরী—মহেন্দ্রলাল খাঁন।

অ গ্র হা য় ণ ১২৭৯

কাব্যমালা (লেখকের নামোল্লেখ নেই)।

পৌ ষ ১২৭৯

স্বাস্থ্য কৌমুদী—ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিত কবিতাবলী—'কাব্যমালার রচয়িতৃ প্রণীত', কাব্যমঞ্জরী—বলদেব পালিত, আর্য প্রবর (মাসিক পত্র), অবলা বিলাপ—অন্নদাসুন্দরী দাসী, পরিত্যক্ত পল্লী—অম্বিকাচরণ গুপ্ত, প্রবন্ধ কুসুমাবলী—ঈশানচন্দ্র দত্ত, ভর্তৃহরি কাব্য—বলদেব পালিত, জ্ঞানাঙ্কুর (মাসিক পত্র), বীরাঙ্গনা উপাখ্যান—চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত রত্নাকর—নবীনচন্দ্র দত্ত, হরিবংশ—কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন।

মা ঘ ১২৭৯

পদ্যময়—কালীময় ঘটক, পদ্যমালা—উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, কবিতা কুসুম—তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, সদ্ভাবকুসুম—শ্রীনাথচন্দ্র, প্রথম চরিতাষ্টক—কালীময় ঘটক।

ফাল্গুন ১২৭৯

ঐতিহাসিক নবন্যাস—গজপতি রায়, জ্ঞানকুসুম—তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়, শিশুপাঠ বাঙ্গালার ইতিহাস—ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌদামিনী উপাখ্যান—উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, গান্ধারী বিলাপ কাব্য—ভুবনমোহন ঘোষ, প্রমীলা বিলাস—মহিমাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নলদময়ন্তী কাব্য—কিশোরীলাল রায়।

চৈত্র ১২৭৯

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা—রাজনারায়ণ বসু, কিঞ্চিৎ জলযোগ (লেখকের নামোল্লেখ নেই)।

বৈশাখ ১২৮০

মানসরঞ্জন—কৈলাসচন্দ্র দে, কাব্য কদম্ব—গঙ্গানারায়ণ প্রধান, Annals and Antiquities of Rajasthan—James Tod, কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা, উৎকল দর্শন (মাসিক পত্র), হিন্দু আচার ব্যবহার—মনোমোহন বসু।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮০

ঋতু বিহার—ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য, ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতি—অম্বিকাচরণ গুপ্ত, হিন্দুধর্মনীতি—ঈশানচন্দ্র বসু, বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কনের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, হিন্দু জাতি, হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা—ঈশ্বরচন্দ্র বসু, কবিতাহার—'জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত', সর্বার্থ সংগ্রহ (মাসিক পুস্তক)।

আষাঢ় ১২৮০

সেতার শিক্ষা—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বক্তৃতামালা—মনোমোহন বসু, বিরহ বিলাপ (লেখকের নামোল্লেখ নেই), বিক্টোরিয়া পত্রিকা, কবিতাবলী ২য় খণ্ড—রাধানাথ রায়, বিশ্বদর্শন (পাক্ষিক পত্র), সাহিত্য সংগ্রহ (সংগ্রহ), স্বীয় মনের প্রতি উপদেশ—'কোন বঙ্গমহিলা প্রণীত', বঙ্গ মিহির (মাসিক পত্র)।

শ্রাবণ ১২৮০

নন্দবংশোচ্ছেদ—লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, বঙ্গ শ্রুতবোধ (লেখকের নামোল্লেখ নেই), The Fifteenth Anniversary of Family Club, Burrabazar & c. The legal Companion. Serampore, কৃষ্ণভক্তি সার—উমানাথ রায়।

ভাদ্র ১২৮০

সরোজিনী নাটক—রাধানাথ বর্ধন, জমীদার দর্পণ নাটক—মীর মশারবক হোসেন, গ্রেট বারবারস্ ড্রামা (লেখকের নামোল্লেখ নেই), জমিদার ও প্রজা—নীলকমল মুখোপাধ্যায়, ভূতত্ত্ব বিচার—দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ২য় ভাগ—রামগতি ন্যায়রত্ন।

কার্তিক ১২৮০

কুলকালিমা (লেখকের নামোল্লেখ নেই), কাব্যানুবাদ—'কতিপয় বন্ধু' কর্তৃক অনূদিত, জয়দেব চরিত—রজনীকান্ত গুপ্ত, বিজ্ঞানসার—বীরেশ্বর পাঁড়ে, 'বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি' (লেখকের নামোল্লেখ নেই)।

অগ্রহায়ণ ১২৮০

তমোলুক পত্রিকা।

পৌষ ১২৮০

মাসিক প্রকাশিকা (মাসিক পত্র), Plays and Poems of William Shakespeare, Vol, II. Comedie Republished with a life of Malone—Bany Madhub Ghosh, গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু—মীর মসাঃরফ হুসেন, হিন্দু ধর্ম মর্ম—লোকনাথ বসু, পূর্ণশশী (মাসিক পত্র), লক্ষ্মণ বিবাসন—শ্যামাচরণ মজুমদার, ভারতমাতা—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাঘ ১২৮০

হেমলতা নাটক—হরলাল রায়, অবকাশ-তোষিণী (মাসিক পত্র), অমরনাথ নাটক—কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

ফাল্গুন ১২৮০

চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী—দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার ইতিহাস—মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চৈত্র ১২৮০

ব্যায়াম শিক্ষা—হরিশচন্দ্র শর্মা, হরবোলা ভাঁড় (মাসিক পত্র), ইয়ুরোপে তিন বৎসর (লেখকের নামোল্লেখ নেই), তীর্থ মহিমা—নিমাইচাঁদ শীল, বঙ্গভূষণ—রাজকৃষ্ণ রায়, সাহিত্য মঞ্জরী—নবীনচন্দ্র দত্ত, শিক্ষামঞ্জরী—নগেন্দ্রনাথ দত্ত।

বৈশাখ ১২৮১

নিদান—উদয়চাঁদ দত্ত, প্রমোদিনী (সাময়িক পত্র)।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮১

রস কাদম্বিনী (লেখকের নামোল্লেখ নেই), কবিতা কুসুমমালিকা—বিহারীলাল সাহা, নবরসাঙ্কুর—রসিকচন্দ্র রায়, পল্লীগ্রামদর্পণ—প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেমলতা (পাক্ষিকপত্র), উদাসিনী (লেখকের নামোল্লেখ নেই), মৃদঙ্গমঞ্জরী—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, চিত্র-কানন—কানাইলাল মিত্র, কাব্য পেটিকা—মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার—নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক রহস্য—রামদাস সেন।

আষাঢ় ১২৮১

রিপুবিহার—মহিমাচন্দ্র চক্রবর্তী, বেহুলা লখিন্দর নাম চম্পূকাব্যম্—ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ।

শ্রাবণ ১২৮১

আর্যদর্শন (মাসিক পত্র), বান্ধব (মাসিক পত্র), কাব্য কৌমুদী—শ্রীনাথ চন্দ, ললিতা সুন্দরী—অধরলাল সেন, স্বর্ণলতা নাটক—দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তত্ত্বকুসুম—দ্বারকানাথ ঘোষ, মহাগুরু নিপাতের পর অশৌচাবস্থায় কর্তব্যাকর্তব্যের বিচার, ঋতুবিলাস—মহিমাচন্দ্র চক্রবর্তী, বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য—রামকুমার নন্দী, বৈদেহী বৈধব্য কাব্য—অনাথবন্ধু রায়, সুশ্রুত—অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামোদ্বাহ নাটক—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাদ্র ১২৮১

পুরুবিক্রম নাটক (লেখকের নামোল্লেখ নেই), কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী—লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী।

আশ্বিন ১২৮১

শিক্ষানবিশের পদ্য—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, দুঃখমালা—'কোন হিন্দু মহিলা প্রণীত', তারাবাই—গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

কার্ত্তিক ১২৮১

গৌড়েশ্বর নাটক—রমেশচন্দ্র লাহিড়ী, বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত—ঈশানচন্দ্র বসু, প্রমোদকামিনী কাব্য—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হিতাবলী—প্রসন্নচন্দ্র গুহ,

The Music and Musical Notation of Various countries—Loke Nath Ghose, জীবন মরীচিকা—গৌরনারায়ণ রায়, গীতহার—গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়, পদ্মফুল—রামলাল চক্রবর্তী, নব মালিকা—দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিলাপতরঙ্গ—মহিমাচন্দ্র বসু, শ্রীশুক্লযজুর্বেদঃ—'সত্যব্রত সামশ্রমিণা সংটিপ্য'।

অ গ্র হা য় ণ ১২৮১

চিত্তবিনোদ কাব্য—ঈশানচন্দ্র বসু।

পৌ ষ ১২৮১

ভারতে যবন—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বালা-বোধিনী—মধুসূদন সেন, ভূগোলসার—নরেন্দ্রনাথ কোঙর, পদ্য পাঠাবলী—লোকনাথ গুহ।

বৈ শা খ ১২৮৪

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত গ্রন্থাবলী।

জ্যৈ ষ্ঠ ১২৮৪

মাধবিকা (লেখকের নামোল্লেখ নেই), বাঙ্গালা শিক্ষা—সিদ্ধেশ্বর রায়, সভ্যতার ইতিহাস—শ্রীকৃষ্ণ দাস, সুধীরঞ্জন—দ্বারকানাথ অধিকারী।

পৌ ষ ১২৮৪

চিকিৎসাতত্ত্ব ও চিকিৎসাপ্রকরণ—গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উপন্যাস মালা—শশিচন্দ্র দত্ত, ভারত-উদ্ধার অথবা চারি আনা মাত্র—রামদাস শর্মা।

বৈ শা খ ১২৮৫

হেলেনা কাব্য—আনন্দচন্দ্র মিত্র, বীণা (মাসিক পত্র)।

জ্যৈ ষ্ঠ ১২৮৫

সুশিক্ষিত চরিত—মধুসূদন সরকার, নলিনী—অধরলাল সেন, টক্‌সিকোলজিকাল চার্ট—হরিশচন্দ্র শর্মা।

আ ষা ঢ় ১২৮৫

নিশীথ-চিন্তা—রাজকৃষ্ণ রায়, মানস-কুসুম—কেশবচন্দ্র ঘোষ, পরিচারিকা (মাসিক পত্র), হঠাৎ বাবু (লেখকের নামোল্লেখ নেই), প্রাইমারি গ্রামার—মথুরানাথ বর্মা, কবিতা—যাদবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শূরবালা সুরবালা—স্বর্ণলতা, কুসুমকলিকা

—প্রসন্নকুমার ঘোষ, কুমারী কার্পেন্টারের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম্—যোগেশচন্দ্র দত্ত।

শ্রা ব ণ ১২৮৫

সার সংগ্রহ—আবদুল হামিদ খাঁ, ভগিনীবিনাশ—মহেন্দ্রনাথ দাঁ, তত্ত্বদর্শন—পূর্ণচন্দ্র মিত্র।

অ গ্র হা য় ণ ১২৮৫

শরীর পালন—যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, জাতীয় উদ্দীপনা (লেখকের নামোল্লেখ নেই), প্রকৃতিতত্ত্ব—শ্রীরাম পালিত, দুঃখিনী—হরিশ্চন্দ্র সরকার, ভুবনমোহিনী প্রতিভা (লেখকের নামোল্লেখ নেই), কবিতানিকর—বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, কুসুম বিকাশ (লেখকের নামোল্লেখ নেই)।

ফা ল্গু ন ১২৮৫

বাল্য উদরাময়—গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, মানব সংস্কার—সেখ আবদুল লতিফ।

জ্যৈ ষ্ঠ ১২৮৭

হিন্দী ব্যাকরণ—হৃষীকেশ শাস্ত্রী।

শ্রা ব ণ ১২৮৭

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব—রজনীকান্ত গুপ্ত, চিকিৎসক—শ্রীশচন্দ্র রায়।

চৈ ত্র ১২৮৭

শম্ভুবংশ-চরিত—বনওয়ারিচন্দ্র চৌধুরী, ভারতমহিলা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কৃষি-শিক্ষা—কালীময় ঘটক, কুসুমারিন্দম্—ইন্দ্রনারায়ণ পাল, সদানন্দ।

বৈ শা খ ১২৮৯

সামুয়েল হানিমানের জীবনী—মহেন্দ্রনাথ রায়, প্রায়শ্চিত্ত—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যৈ ষ্ঠ ১২৮৯

সভার কার্যনির্বাহবিষয়ক বিধি…, বন-প্রসূন—মোক্ষদায়িণী মুখোপাধ্যায়, দুই শিকারী (লেখকের নামোল্লেখ নেই)।

আষাঢ় ১২৮৯

মেঘেতে বিজলী বা হরিশচন্দ্র—রাধানাথ মিত্র, প্রবাহ (মাসিক সন্দর্ভ), রাজ উদাসীন—শাক্যসিংহ ও রামমোহন রায়, যাবনিক পরাক্রম—নীলরতন রায় চৌধুরী।

অগ্রহায়ণ ১২৮৯

উষা হরণ বা অপূর্ব মিলন—রাধানাথ মিত্র, মায়াবতী—রাধানাথ মিত্র, সতী-বাসনা—ঈশানচন্দ্র সেন, বসন্তোপহার (সংগ্রহ)।

মাঘ ১২৮৯

শরীর রক্ষণ—অন্নদাচরণ খাস্তগির, কুসুম-কানন—অধরলাল সেন, হৃদয়-প্রতিধ্বনি—পুলিনবিহারী দত্ত, তৃণপুঞ্জ—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, পদ্য-ব্যাকরণ (লেখকের নামোল্লেখ নেই), কবিতা-কল্প-লতিকা—রাজকৃষ্ণ দত্ত, ফুলের সাজি—কুঞ্জবিহারী বসু।

ফাল্গুন ১২৮৯

বিনোদমালা (লেখকের নামোল্লেখ নেই), বনফুল (লেখকের নামোল্লেখ নেই), যাদবনন্দিনী কাব্য (লেখকের নামোল্লেখ নেই), সুখধাম বিনাশ—মহিমচন্দ্র গুপ্ত, পদ্য-কুসুমাবলী (লেখকের নামোল্লেখ নেই), দুঃখ-সঙ্গিনী (লেখকের নামোল্লেখ নেই)।

চৈত্র ১২৮৯

রাজস্থান—যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাবলী গদ্য ও পদ্য—রাজকৃষ্ণ রায়।

বঙ্গদর্শনে পুস্তক সমালোচনা বিভাগে আলোচিত সাময়িকপত্র ও গ্রন্থাবলীর তালিকা এখানে সংকলিত। এ ছাড়াও বঙ্গদর্শনে আরও কিছু গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। অবকাশরঞ্জিনী, দানবদলন কাব্য, মানস বিকাশ, বৃত্রসংহার, পলাশির যুদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনা বঙ্গদর্শনে আছে। এই শ্রেণীর সমালোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত। বঙ্গদর্শনের সমগ্র রচনার কালানুক্রমিক তালিকার জন্য বর্তমান লেখকের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৭

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাপঞ্জী

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
পদ্য	সংবাদ প্রভাকর	১৮৫২ ফেব্রুআরি ২৫ (১২৮৫ ফাল্গুন)	রচনাবলী, বিবিধ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণ
বিরলে বাস	সমাচার দর্পণ	,, ফেব্রুআরি ২৮	,,
ছাত্র হইতে প্রাপ্ত	সংবাদ প্রভাকর	,, এপ্রিল ২৩	,,
জীবন ও সৌন্দর্য অনিত্য	,,	,, মে ২৮	,,
বর্ষাঋতু	,,	,, জুলাই ১০	,,
হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন	,,	১৮৫৩ জানুআরি ১০ (১২৫৯ পৌষ)	,,
শিশির বর্ণনাছলে স্ত্রী-পতির কথোপকথন	,,	,, ফেব্রুআরি ৫	,,
দূরদেশ গমনের বিদায়	,,	,, ফেব্রুআরি ১৭	,,
কামিনীর প্রতি উক্তি	,,	,, মার্চ ১৮	,,
চন্দ্রদূত	,,	,, মার্চ ৩০	,,
বসন্তের নিকট বিদায়	,,	,, এপ্রিল ২৮	,,
বিচিত্র নাটক	,,	,, মে ২৭	,,
বর্ষা বর্ণনাছলে দম্পতির রসালাপ	,,	,, সেপ্টেম্বর ১৭	,,
বিষম 'বিচিত্র নাটক'	,,	,, সেপ্টেম্বর ২৭	,,
Rajmohan's Wife	Indian Field	১৮৬৪	রচনাবলী, পরিষদ্ সং

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
On The Origin of Hindu Festivals	Transactions of the Bengal Social Science Association	১৮৬৯ (১২৭৫-৭৬)	রচনাবলী পরিষদ্ সং
A popular Literature of Bengal	,,	১৮৭০ (১২৭৬-৭৭)	,,
Bengali Literature	Calcutta Review	১৮৭১ (১২৭৭-৭৮)	,,
Buddhism and the Sankhya Philosophy	,,	,,	,,
পত্র সূচনা	বঙ্গদর্শন	১২৭৯ বৈশাখ	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
ভারত কলঙ্ক	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
বিষবৃক্ষ ১-৫ পরিচ্ছেদ	,,	,,	বিষবৃক্ষ
সঙ্গীত	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল	,,	,,	লোকরহস্য
বিষবৃক্ষ* ৬-৮	,,	১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ	বিষবৃক্ষ
বিজ্ঞান কৌতুক : ১। সর্ উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা, ২। আশ্চর্য সৌরোৎপাত	,,	,,	বিজ্ঞানরহস্য
আকাঙ্ক্ষা	,,	,,	গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক
উত্তরচরিত	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
বিষবৃক্ষ* ৯-১১	,,	১২৭৯ আষাঢ়	বিষবৃক্ষ
উত্তরচরিত	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল*	,,	১২৭৯ শ্রাবণ	লোকরহস্য
উত্তরচরিত*	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
বিষবৃক্ষ* ১২-১৬	,,	,,	বিষবৃক্ষ

* রচনার পূর্বানুবৃত্তি বোঝাতে [*] তারকাচিহ্ন ব্যবহৃত।

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
উত্তরচরিত*	বঙ্গদর্শন	১২৭৯ ভাদ্র	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
বিষবৃক্ষ* ১৭-১৮	,,	,,	বিষবৃক্ষ
বঙ্গদেশের কৃষক / দেশের শ্রীবৃদ্ধি	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা	,,	,,	
বিষবৃক্ষ* ১৯-২১	,,	১২৭৯ আশ্বিন	বিষবৃক্ষ
উত্তরচরিত*	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
বিষবৃক্ষ* ২২-২৪	,,	১২৭৯ কার্তিক	বিষবৃক্ষ
বঙ্গদেশের কৃষক* / জমিদার	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
বায়ু†	,,	,,	গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক
নূতন গ্রন্থের সমালোচনা	,,	,,	বিবিধ, পরিষদ সং
আকাশে কত তারা আছে	,,	১২৭৯ অগ্রহায়ণ	বিজ্ঞান রহস্য
বিষবৃক্ষ* ২৫-২৮	,,	,,	বিষবৃক্ষ
ইংরাজ স্তোত্র / মহাভারত হইতে অনুবাদিত	,,	,,	লোকরহস্য
সাবিত্রী	,,	,,	গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক
The confessions of a Young Bengal	Mookherjee's Magazine	১৮৭২ ডিসেম্বর	রচনাবলী, পরিষদ্ সং
বিষবৃক্ষ* ২৯-৩২	বঙ্গদর্শন	১২৭৯ পৌষ	বিষবৃক্ষ
বঙ্গদেশের কৃষক* / আইন	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
সাংখ্যদর্শন	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
রামায়ণের সমালোচন	,,	,,	লোকরহস্য
বিষবৃক্ষ* ৩৩-৪৬	,,	১২৭৯ মাঘ	বিষবৃক্ষ
সাংখ্যদর্শন*	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
বিষবৃক্ষ* ৪৭-৫০ ॥ শেষ	,,	১২৭৯ ফাল্গুন	বিষবৃক্ষ
বঙ্গদেশের কৃষক* / প্রাকৃতিক নিয়ম	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
ধূলা	,,	,,	বিজ্ঞানরহস্য
Three years in Europe	,,	,,	বিবিধ, পরিষদ্ সং

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
সাংখ্যদর্শন*	বঙ্গদর্শন	১২৭৯ ফাল্গুন	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
বাবু	,,	,,	লোকরহস্য
বিরহিণীর দশ দশা	,,	,,	
ইন্দিরা ১-৮ ॥ সম্পূর্ণ	,,	১২৭৯ চৈত্র	ইন্দিরা
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন	,,	,,	বিবিধ, পরিষদ্ সং
অবকাশরঞ্জিনী [গীতিকাব্য]	,,	১২৮০ বৈশাখ	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
সাংখ্যদর্শন*	,,	,,	,,
বসন্ত এবং বিরহ	,,	,,	লোকরহস্য
যুগলাঙ্গুরীয় ১-১০ ॥ সম্পূর্ণ	,,	,,	যুগলাঙ্গুরীয়
আদর	,,	,,	গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক
The study of Hindu Philosophy	Mookherjee's Magazine	১৮৭৩ মে	রচনাবলী, পরিষদ্ সং
দুর্গা	বঙ্গদর্শন	১২৮০ জ্যৈষ্ঠ	
সাম্য	,,	,,	সাম্য
দানবদলন কাব্য [প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত]	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
বহুবিবাহ	,,	১২৮০ আষাঢ়	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
সাংখ্যদর্শন*	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
সাম্য	,,	,,	
দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন	,,	,,	লোকরহস্য
জন ষ্টুয়ার্ট মিল	,,	১২৮০ শ্রাবণ	বিবিধ, পরিষদ্ সং
চন্দ্রশেখর ১-৩	,,	,,	চন্দ্রশেখর
গর্দভ	,,	,,	লোকরহস্য
চঞ্চল জগৎ	,,	১২৮০ ভাদ্র	বিজ্ঞানরহস্য
চন্দ্রশেখর* ৪-৫	,,	,,	চন্দ্রশেখর
কমলাকান্তের দপ্তর [একা]	,,	,,	কমলাকান্ত
মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত	,,	,,	বিবিধ, পরিষদ্ সং

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ / স্বাধীনতা [ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা]	বঙ্গদর্শন	১২৮০ ভাদ্র	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
মেঘ	,,	,,	গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক
প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ / রাজনীতি [প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি / নারদবাক্য]	,,	১২৮০ আশ্বিন	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
কমলাকান্তের দপ্তর* / মনুষ্য ফল	,,	,,	কমলাকান্ত
চন্দ্রশেখর* ৬-৯	,,	,,	চন্দ্রশেখর
কমলাকান্তের দপ্তর* / ইউটিলিটি বা দর্শনদ্বয় ১. হিতবাদ দর্শন ২. উদর দর্শন	,,	১২৮০ কার্তিক	কমলাকান্ত
জৈবনিক	,,	,,	বিজ্ঞানরহস্য
চন্দ্রশেখর* ১০-১৪	,,	,,	চন্দ্রশেখর
মন এবং সুখ	,,	,,	গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক
জাতিবৈর	সাধারণী	,,	বিবিধ, পরিষদ্ সং
চন্দ্রশেখর* ১৫-১৮	বঙ্গদর্শন	১২৮০ অগ্রহায়ণ	চন্দ্রশেখর
কমলাকান্তের দপ্তর* / পতঙ্গ	,,	,,	কমলাকান্ত
গগন পর্যটন	,,	১২৮০ পৌষ	বিজ্ঞানরহস্য
মানস বিকাশ [বিদ্যাপতি ও জয়দেব]	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
চন্দ্রশেখর* ১৯-২২	,,	,,	চন্দ্রশেখর
চন্দ্রশেখর* ২৩-২৬	,,	১২৮০ মাঘ	চন্দ্রশেখর
কমলকান্তের দপ্তর* / আমার মন	,,	,,	কমলাকান্ত
কতকাল মনুষ্য	,,	১২৮০ ফাল্গুন	বিজ্ঞানরহস্য
চন্দ্রশেখর* ২৭-২৮	,,	,,	চন্দ্রশেখর
চন্দ্রশেখর* ২৯-৩১	,,	১২৮০ চৈত্র	,,
সুবর্ণগোলক	,,	,,	লোকরহস্য

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
কমলকান্তের দপ্তর* / বসন্তের কোকিল	বঙ্গদর্শন	১২৮০ চৈত্র	কমলাকান্ত
পরিমাণ রহস্য	,,	,,	বিজ্ঞানরহস্য
চন্দ্রশেখর* ৩২-৩৪	,,	১২৮১ বৈশাখ	চন্দ্রশেখর
প্রাচীনা এবং নবীনা	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
জলে ফুলে	ভ্রমর	,,	গদ্য পদ্য বা কবিতা-পুস্তক
চন্দ্রশেখর* ৩৫-৩৬	বঙ্গদর্শন	১২৮১ জ্যৈষ্ঠ	চন্দ্রশেখর
সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল [বাঙ্গালা শাসনের কল]	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
কমলাকান্তের দপ্তর* / বিবাহ	,,	১২৮১ আষাঢ়	কমলাকান্ত
চন্দ্রশেখর* ৩৭-৩৯	,,	,,	চন্দ্রশেখর
তিন রকম	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
পরিমাণ রহস্য*	,,	,,	বিজ্ঞানরহস্য
বৃষ্টি	ভ্রমর	,,	গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক
বাঙ্গালির বাহুবল	বঙ্গদর্শন	১২৮১ শ্রাবণ	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
চন্দ্রশেখর* ৪০-৪২	,,	,,	চন্দ্রশেখর
চন্দ্রশেখর* ৪৩-৪৪ + পরিশিষ্ট ॥ শেষ	,,	১২৮১ ভাদ্র	,,
আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
রজনী ১-২	,,	১২৮১ আশ্বিন	রজনী
কমলাকান্তের দপ্তর* / বড়বাজার	,,	,,	কমলাকান্ত
রজনী* ৩-৬	,,	১২৮১ কার্তিক	রজনী
কমলাকান্তের দপ্তর* / আমার দুর্গোৎসব	,,	,,	কমলাকান্ত
রজনী* ৭-৮, ২য় খণ্ড ১-২	,,	১২৮১ অগ্রহায়ণ	রজনী
ভালবাসার অত্যাচার	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
অধঃপতনসঙ্গীত	,,	,,	গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
বঙ্গে দেবপূজা	ভ্রমর	১২৮১ অগ্রহায়ণ	বিবিধ, পরিষদ্ সং
সেকাল আর একাল [অনুকরণ]	বঙ্গদর্শন	১২৮১ পৌষ	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
কল্পতরু	,,	,,	বিবিধ, পরিষদ্ সং
রজনী* ২য় খণ্ড ৩-৪	,,	,,	রজনী
বাঙ্গালার ইতিহাস	,,	১২৮১ মাঘ	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
রজনী* ২য় খণ্ড ৫-৬	,,	,,	রজনী
বৃত্রসংহার	,,	,,	বঙ্কিমচন্দ্র কৃত সাহিত্য-সমালোচনা : দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ
কমলাকান্তের দপ্তর* / একটি গীত	,,	১২৮১ ফাল্গুন	কমলাকান্ত
জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত	,,	,,	বিবিধ, পরিষদ সং
বৃত্রসংহার*	,,	,,	
রজনী* ২য় খণ্ড ৭	,,	,,	রজনী
রজনী* ৩য় খণ্ড ১-২	,,	১২৮১ চৈত্র	,,
কৃষ্ণচরিত্র	,,	,,	
ভাই ভাই	,,	,,	গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক
কমলাকান্তের দপ্তর* / বিড়াল	,,	,,	কমলাকান্ত
শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা	,,	১২৮২ বৈশাখ	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
রজনী* ৩য়খণ্ড ৩-৬	,,	,,	রজনী
ঋতুবর্ণন	,,	,,	বিবিধ, পরিষদ্ সং
মিল ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম [ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্র কি বলে]	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
রজনী* ৪র্থ খণ্ড ১-৭	,,	১২৮২ ভাদ্র	রজনী
দ্রৌপদী	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম
রজনী* ৫ম খণ্ড ১	,,	১২৮২ আশ্বিন	রজনী
রজনী* ৫ম খণ্ড ২-৪	,,	১২৮২ কার্তিক	,,
সাম্য* / স্ত্রীজাতি	,,	,,	সাম্য
কোন 'স্পেশিয়ালের' পত্র	,,	,,	লোকরহস্য

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
পলাশির যুদ্ধ	বঙ্গদর্শন	১২৮২ কার্তিক	বঙ্কিমচন্দ্র কৃত সাহিত্য সমালোচনা : দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ
রাধারাণী ১-৪	,,	,,	রাধারাণী
রাধারাণী* ৫-৬ ॥ শেষ	,,	১২৮২ অগ্রহায়ণ	,,
বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
রজনী* ৬ষ্ঠ ১-৩ ॥ শেষ	,,	,,	রজনী
বর্ষ সমালোচন	,,	,,	লোকরহস্য
কৃষ্ণকান্তের উইল ১-৫	,,	১২৮২ পৌষ	কৃষ্ণকান্তের উইল
কৃষ্ণকান্তের উইল* ৬-৮	,,	১২৮২ মাঘ	,,
কৃষ্ণকান্তের উইল* ৯	,,	১২৮২ ফাল্গুন	,,
বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ	,,	১২৮২ চৈত্র	বিবিধ, পরিষদ্ সং
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী		১২৮৩	রায় দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা
বঙ্গদর্শন	,,	১২৮৪ বৈশাখ	বিবিধ, পরিষদ্ সং
কৃষ্ণকান্তের উইল* ১০-১২	,,	,,	কৃষ্ণকান্তের উইল
বুড়া বয়সের কথা	,,	,,	কমলাকান্ত
কৃষ্ণকান্তের উইল* ১৩-১৬	,,	১২৮৪ জ্যৈষ্ঠ	কৃষ্ণকান্তের উইল
বাহুবল ও বাক্যবল	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
খদ্যোত	,,	,,	গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক
কৃষ্ণকান্তের উইল* ১৭-২০	,,	১২৮৪ আষাঢ়	কৃষ্ণকান্তের উইল
কৃষ্ণকান্তের উইল* ২১-২৩	,,	,,	,,
কৃষ্ণকান্তের উইল* ২৪-২৮	,,	১২৮৪ ভাদ্র	,,
কৃষ্ণকান্তের উইল* ২৯-৩২	,,	১২৮৪ আশ্বিন	,,
জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা [মনুষ্যত্ব কি ?]	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
কৃষ্ণকান্তের উইল* ৩৩-৩৬	,,	১২৮৪ কার্তিক	কৃষ্ণকান্তের উইল

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
কৃষ্ণকান্তের উইল* ৩৭-৪০	বঙ্গদর্শন	১২৮৪ অগ্রহায়ণ	কৃষ্ণকান্তের উইল
কমলাকান্তের পত্র	,,	১২৮৪ পৌষ	কমলাকান্ত
জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা*	,,	,,	বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সাহিত্য-সমালোচনা : দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ
কৃষ্ণকান্তের উইল* ৪১-৪৫	,,	,,	কৃষ্ণকান্তের উইল
কৃষ্ণকান্তের উইল* ৪৬+ পরিশিষ্ট ॥ শেষ	,,	১২৮৪ মাঘ	,,
কমলাকান্তের পত্র*/ পলিটিক্স	,,	১২৮৪ ফাল্গুন	কমলাকান্ত
সংযুক্তা	,,	১২৮৪ চৈত্র	গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক
রাজসিংহ ১ম খণ্ড ১-৪	,,	,,	রাজসিংহ
রাজসিংহ* ১ম খণ্ড ৫-৮	,,	১২৮৫ বৈশাখ	,,
আকবর সাহের খোষরোজ	,,	,,	গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক
রাজসিংহ* ১ম খণ্ড ৯-১১	,,	১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ	রাজসিংহ
বাঙ্গালা ভাষা	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
রাজসিংহ* ১ম খণ্ড ১২-১৪	,,	১২৮৫ আষাঢ়	রাজসিংহ
রাজসিংহ* ১ম খণ্ড ১৫-১৬	,,	১২৮৫ শ্রাবণ	,,
কমলাকান্তের পত্র*/ বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব	,,	,,	কমলাকান্ত
দুর্গোৎসব	,,	১২৮৫ ভাদ্র	গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক
রাজসিংহ* ১ম খণ্ড ১৭-১৯	,,	,,	রাজসিংহ
লোকশিক্ষা	,,	১২৮৫ অগ্রহায়ণ	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত	,,	১২৮৭ আশ্বিন	মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত
বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	,,	১২৮৭ অগ্রহায়ণ	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
বাঙ্গালীর উৎপত্তি	বঙ্গদর্শন	১২৮৭ পৌষ	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
বাঙ্গালীর উৎপত্তি*	,,	১২৮৭ মাঘ	,,
বাঙ্গালীর উৎপত্তি*	,,	১২৮৭ ফাল্গুন	,,
বাঙ্গালীর উৎপত্তি*	,,	১২৮৭ চৈত্র	,,
আনন্দমঠ / উপক্রমণিকা + ১ম খণ্ড ১-১০	,,	,,	আনন্দমঠ
আনন্দমঠ* ১ম খণ্ড ১১-১২	,,	১২৮৮ বৈশাখ	,,
বাঙ্গালীর উৎপত্তি*	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
আনন্দমঠ* ১ম খণ্ড ১৩-১৮	,,	১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ	আনন্দমঠ
বাঙ্গালীর উৎপত্তি*	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
আনন্দমঠ* ১ম খণ্ড ১৯-২৫	,,	১২৮৮ আষাঢ়	আনন্দমঠ
আনন্দমঠ* ২য় খণ্ড ১-৬	,,	১২৮৮ শ্রাবণ	,,
আনন্দমঠ* ২য় খণ্ড ৭-৯	,,	১২৮৮ ভাদ্র	,,
আহার Versus বিবাহ [রামধন পোদ]	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
কমলাকান্তের জবানবন্দী	,,	,,	কমলাকান্ত
আনন্দমঠ* ২য় খণ্ড ১০-১১	,,	১২৮৮ আশ্বিন	আনন্দমঠ
আনন্দমঠ* ২য় খণ্ড ১২-১৫	,,	১২৮৯ বৈশাখ	,,
ঢেঁকি	,,	,,	কমলাকান্ত
আনন্দমঠ* ২য় খণ্ড ১৬-২০ ॥ শেষ	,,	১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ	আনন্দমঠ
বাঙ্গালা ইতিহাসের ভগ্নাংশ	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়	,,	১২৮৯ আশ্বিন	বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সাহিত্য সমালোচনা : দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ
The Modern St. Paul	The Statesman	১৮৮২ অক্টোবর ৬	রচনাবলী, পরিষদ্ সং
European Versions of Hindoo Doctrines	,,	১৮৮২ অক্টোবর ১৬	,,

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
কাকাতুয়া	বঙ্গদর্শন	১২৮৯ কার্ত্তিক	কমলাকান্ত, পরিশিষ্ট, পরিষদ্ সং
The Intellectual Superiority of Europe	The Statesman	১৮৮২ অক্টোবর ২৮	রচনাবলী, পরিষদ্ সং
The Recent Controversy	,,	১৮৮২ নভেম্বর ২২ (১২৮৯ অগ্রহায়ণ)	,,
দেবী চৌধুরাণী ১ম খণ্ড ১-৩	বঙ্গদর্শন	১২৮৯ পৌষ	দেবী চৌধুরাণী
দেবী চৌধুরাণী* ১ম খণ্ড ৪-৬	,,	১২৮৯ মাঘ	,,
হনূমদ্বাবু সংবাদ	,,	,,	লোকরহস্য
দেবী চৌধুরাণী* ১ম খণ্ড ৭-৯	,,	১২৮৯ ফাল্গুন	দেবী চৌধুরাণী
Bransonism	,,	,,	লোকরহস্য
দেবী চৌধুরাণী* ১ম খণ্ড ১০-১৩	,,	১২৮৯ চৈত্র	দেবী চৌধুরাণী
দেবী চৌধুরাণী* ১ম খণ্ড ১৪-১৭	,,	১২৯০ কার্ত্তিক	,,
দেবী চৌধুরাণী* ২য় খণ্ড ১-৪	,,	১২৯০ অগ্রহায়ণ	,,
দেবী চৌধুরাণী* ২য় খণ্ড ৫-৮	,,	১২৯০ পৌষ	,,
দেবী চৌধুরাণী* ২য় খণ্ড ৯-১২	,,	১২৯০ মাঘ	,,
সূচনা	প্রচার	১২৯১ শ্রাবণ	বিবিধ, পরিষদ্ সং
বাঙ্গালার কলঙ্ক	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
হিন্দুধর্ম্ম	,,	,,	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম
সীতারাম ১ম খণ্ড ১-২	,,	,,	সীতারাম
ধর্ম্মজিজ্ঞাসা	নবজীবন	,,	ধর্ম্মতত্ত্ব
বেদ	প্রচার	১২৯১ ভাদ্র	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম
সীতারাম* ১ম খণ্ড ৩-৫	,,	,,	সীতারাম
গ্রাম্য কথা	,,	,,	লোকরহস্য
মনুষ্যত্ব	নবজীবন	,,	ধর্ম্মতত্ত্ব
কৃষ্ণচরিত্র	প্রচার	১২৯১ আশ্বিন	কৃষ্ণচরিত্র
সীতারাম* ১ম খণ্ড ৫	,,	,,	সীতারাম
বেদ	,,	,,	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম
অনুশীলন	নবজীবন	,,	ধর্ম্মতত্ত্ব

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
বেদের দেবতা	প্রচার	১২৯১ কার্তিক	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম
কৃষ্ণচরিত্র*	,,	,,	কৃষ্ণচরিত্র
সীতারাম* ১ম খণ্ড ৬-৮	,,	,,	সীতারাম
সুখ	নবজীবন	,,	ধর্মতত্ত্ব
ইন্দ্র	প্রচার	১২৯১ অগ্রহায়ণ	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম
আদি ব্রাহ্মসমাজ ও 'নব হিন্দু সম্প্রদায়'	,,	,,	বিবিধ, পরিষদ্ সং
ধর্ম এবং সাহিত্য	,,	১২৯১ পৌষ	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
গ্রাম্য কথা*	,,	,,	লোকরহস্য
সীতারাম* ১ম খণ্ড ৯	,,	,,	সীতারাম
কোন্ পথে যাইতেছি	,,	,,	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম
বরুণাদি	,,	,,	,,
গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
লর্ড রিপণের উৎসবের জমাখরচ	,,	,,	
সবিতা ও গায়ত্রী	,,	১২৯১ মাঘ	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম
সীতারাম* ১ম খণ্ড ১০	,,	,,	সীতারাম
কৃষ্ণচরিত্র*	,,	,,	কৃষ্ণচরিত্র
বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
ভক্তি	নবজীবন	,,	ধর্মতত্ত্ব
চিত্তশুদ্ধি	প্রচার	১২৯১ ফাল্গুন	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
বৈদিক দেবতা	,,	,,	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম
কৃষ্ণচরিত্র*	,,	,,	কৃষ্ণচরিত্র
সম্পাদকীয় উক্তি	,,	,,	
দেবতত্ত্ব	,,	১২৯১ চৈত্র	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম
কৃষ্ণচরিত্র*	,,	,,	কৃষ্ণচরিত্র
বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর	,,	,,	লোকরহস্য
কৃষ্ণচরিত্র*	,,	১২৯২ বৈশাখ	কৃষ্ণচরিত্র
গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
রাজার উপর রাজা	প্রচার	১২৯২ বৈশাখ	গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক
ভক্তি*	নবজীবন	,,	ধর্মতত্ত্ব
আগামী বৎসরে প্রচার যেরূপ হইবে	প্রচার	১২৯২ জ্যৈষ্ঠ	বিবিধ, পরিষদ্ সং
দ্যাবা পৃথিবী	,,	,,	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম
কৃষ্ণচরিত্র*	,,	,,	কৃষ্ণচরিত্র
চৈতন্যবাদ	,,	,,	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম
উপাসনা	,,	১২৯২ আষাঢ়	,,
কৃষ্ণচরিত্র*	,,	,,	কৃষ্ণচরিত্র
গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি *	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ২য়
কাম	,,	,,	,,
হিন্দু কি জড়োপাসক	,,	,,	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম
ভক্তি	,,	,,	ধর্মতত্ত্ব
সীতারাম* ১ম খণ্ড ১১-১৩	প্রচার	১২৯২ শ্রাবণ	সীতারাম
কৃষ্ণচরিত্র*	,,	,,	কৃষ্ণচরিত্র
পুষ্পনাটক	,,	,,	গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক
ভক্তি*	নবজীবন	,,	ধর্মজিজ্ঞাসা
কৃষ্ণচরিত্র*	প্রচার	১২৯২ ভাদ্র	কৃষ্ণচরিত্র
সীতারাম* ১ম খণ্ড ১৪-১৫	,,	,,	সীতারাম
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা	,,	,,	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম
ভক্তি*	নবজীবন	,,	ধর্মতত্ত্ব
কৃষ্ণচরিত্র*	প্রচার	১২৯২ আশ্বিন	কৃষ্ণচরিত্র
সীতারাম* ১ম খণ্ড ১৬-১৮	,,	,,	সীতারাম
ভক্তি*	নবজীবন	,,	ধর্মতত্ত্ব
কৃষ্ণচরিত্র*	প্রচার	১২৯২ কার্তিক	কৃষ্ণচরিত্র
সীতারাম* ১ম খণ্ড ১৯-২০	,,	,,	সীতারাম
বেদের ঈশ্বরবাদ	,,	,,	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
প্রীতি	নবজীবন	১২৯২ অগ্রহায়ণ	ধর্মতত্ত্ব
সীতারাম* ২য় খণ্ড ১-৪	প্রচার	১২৯২ অগ্রহায়ণ -পৌষ	সীতারাম
কৃষ্ণচরিত্র*	,,	,,	কৃষ্ণচরিত্র
New year's day	,,	,,	লোকরহস্য
সীতারাম* ২য় খণ্ড ৫-৭	প্রচার	১২৯২ মাঘ	সীতারাম
কৃষ্ণচরিত্র*	,,	,,	কৃষ্ণচরিত্র
হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই	,,	,,	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম
সীতারাম* ২য় খণ্ড ৮-১১	,,	১২৯২ ফা-চৈত্র	সীতারাম
কৃষ্ণচরিত্র*	,,	,,	কৃষ্ণচরিত্র
মহাভারতের ঐতিহাসিকতা [কৃষ্ণচরিত্র]*	,,	,,	,,
দয়া	নবজীবন	১২৯২ চৈত্র	ধর্মতত্ত্ব
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব		১২৯২	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহ
সীতারাম* ২য় খণ্ড ১২-১৬	প্রচার	১২৯৩ বৈশাখ	সীতারাম
কৃষ্ণচরিত্র*	,,	,,	কৃষ্ণচরিত্র
সীতারাম* ২য় খণ্ড ১৭-১৮	,,	১২৯৩ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	সীতারাম
কৃষ্ণচরিত্র*	,,	,,	কৃষ্ণচরিত্র
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	,,	১২৯৩ শ্রাবণ	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
সীতারাম* ৩য় খণ্ড ১-৪	,,	,,	সীতারাম
সীতারাম* ৩য় খণ্ড ৫-৭	,,	১২৯৩ ভাদ্র	,,
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*	,,	,,	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*	,,	১২৯৩ আশ্বিন -কার্তিক	,,
সীতারাম* ৩য় খণ্ড ৮-১৩	,,	,,	সীতারাম
জ্ঞান (বঙ্গদর্শন থেকে পুনর্মুদ্রিত)	,,	,,	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম

রচনার নাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
সীতারাম* ৩য় খণ্ড ১৪-১৯	প্রচার	১২৯৩ অগ্রহায়ণ-পৌষ	সীতারাম
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*	,,	,,	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
কৃষ্ণচরিত্র / দ্বিতীয় ভাগ*	,,	,,	কৃষ্ণচরিত্র
সীতারাম*৩য় খণ্ড ২০-২৫ +পরিশিষ্ট ॥ শেষ	,,	১২৯৩ মাঘ	সীতারাম
দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব	,,	১২৯৩	দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী' ১২৯৩ সংস্করণ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*	,,	১২৯৫ বৈশাখ	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
,,	,,	১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ	,,
,,	,,	১২৯৫ আষাঢ়	,,
,,	,,	১২৯৫ শ্রাবণ	,,
মাসিক সংবাদ	,,	,,	বিবিধ, পরিষদ্ সং
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*	,,	১২৯৫ ভাদ্র-আশ্বিন	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
,,	,,	১২৯৫ কার্তিক অগ্রহায়ণ	,,
,,	,,	১২৯৫ পৌষ-মাঘ	,,
,,	,,	১২৯৫ ফাল্গুন-চৈত্র	,,
বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান	,,	১৮৯২ (১২৯৯)	লুপ্তরত্নোদ্ধার
৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী		১৮৯৩ (১৩০০)	সঞ্জীবনী সুধা

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জী

বিভিন্ন সংস্করণ ও সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশের উল্লেখসহ

প্রকাশকাল	সাময়িকপত্র	গ্রন্থ	সংস্করণ
১৮৫৬ খ্রী		ললিতা পুরাকালিক গল্প তথা মানস	১
১৮৬৪	ইণ্ডিয়ান ফিল্ড	Rajmohan's Wife	
১৮৬৫		দুর্গেশনন্দিনী	১
১৮৬৬		কপালকুণ্ডলা	১
১৮৬৯		দুর্গেশনন্দিনী	৩
১৮৬৯		কপালকুণ্ডলা	২
১৮৬৯		মৃণালিনী	১
১৮৭১		দুর্গেশনন্দিনী	৪
১৮৭১		মৃণালিনী	২
১৮৭২, ১২৭৯ বৈশাখ—	বঙ্গদর্শন	বিষবৃক্ষ	
১৮৭২, ১২৭৯ বৈশাখ—	বঙ্গদর্শন	বিবিধ প্রবন্ধ	
১৮৭২, ১২৭৯ বৈশাখ—	বঙ্গদর্শন	লোকরহস্য	
১৮৭২, ১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ—	বঙ্গদর্শন	বিজ্ঞানরহস্য	
১৮৭৩		বিষবৃক্ষ	১
১৮৭৩, ১২৭৯ চৈত্র	বঙ্গদর্শন	ইন্দিরা	
১৮৭৩		ইন্দিরা	১
১৮৭৩, ১২৮০ বৈশাখ	বঙ্গদর্শন	যুগলাঙ্গুরীয়	
১৮৭৩, ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ—	বঙ্গদর্শন	সাম্য	

প্রকাশকাল	সাময়িকপত্র	গ্রন্থ	সংস্করণ
১৮৭৩, ১২৮০ শ্রাবণ—	বঙ্গদর্শন	চন্দ্রশেখর	
১৮৭৩, ১২৮০ ভাদ্র—	বঙ্গদর্শন	কমলাকান্তের দপ্তর	
১৮৭৪		দুর্গেশনন্দিনী	৫
১৮৭৪		কপালকুণ্ডলা	৩
১৮৭৪		মৃণালিনী	৩
১৮৭৪		যুগলাঙ্গুরীয়	১
১৮৭৪		লোকরহস্য	১
১৮৭৪, ১২৮১ আশ্বিন—	বঙ্গদর্শন	রজনী	
১৮৭৫		দুর্গেশনন্দিনী	৬
১৮৭৫		বিষবৃক্ষ	২
১৮৭৫		চন্দ্রশেখর	১
১৮৭৫, ১২৮১ চৈত্র[1]	বঙ্গদর্শন	কৃষ্ণচরিত্র	
১৮৭৫, ১২৮২ কার্তিক—	বঙ্গদর্শন	রাধারাণী	
১৮৭৫		রাধারাণী	১
১৮৭৫, ১২৮২ পৌষ—	বঙ্গদর্শন	কৃষ্ণকান্তের উইল	
১৮৭৫		কমলাকান্তের দপ্তর	১
১৮৭৫		বিজ্ঞানরহস্য	১
১৮৭৬		বিবিধ সমালোচন	১
১৮৭৬		রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী : 'দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী'	
১৮৭৭		রজনী	১
১৮৭৭		রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী	১
১৮৭৮		কপালকুণ্ডলা	৪
১৮৭৮		মৃণালিনী	৪
১৮৭৮		কৃষ্ণকান্তের উইল	১
১৮৭৮		কবিতাপুস্তক	১
১৮৭৮, ১২৮৪ চৈত্র—	বঙ্গদর্শন	রাজসিংহ	

১ পরে ১৮৮৪, ১২৯১ আশ্বিন থেকে প্রচারে প্রকাশিত

প্রকাশকাল	সাময়িকপত্র	গ্রন্থ	সংস্করণ
১৮৭৯		দুর্গেশনন্দিনী	৭
১৮৭৯		প্রবন্ধ পুস্তক	১
১৮৭৯		সাম্য	১
১৮৮০		মৃণালিনী	৫
১৮৮০		বিষবৃক্ষ	৩
১৮৮০, ১২৮৭ আশ্বিন—	বঙ্গদর্শন	মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত	
১৮৮১		কপালকুণ্ডলা	৫
১৮৮১		মৃণালিনী	৬
১৮৮১		বিষবৃক্ষ	৪
১৮৮১		রজনী	২
১৮৮১, ১২৮৭ চৈত্র—	বঙ্গদর্শন	আনন্দমঠ	
১৮৮২		কৃষ্ণকান্তের উইল	২
১৮৮২		রাজসিংহ	১
১৮৮২		আনন্দমঠ	১
১৮৮২, ১২৮৯ পৌষ—	বঙ্গদর্শন	দেবী চৌধুরাণী	
১৮৮৩		দুর্গেশনন্দিনী	৯
১৮৮৩		মৃণালিনী	৭
১৮৮৩		চন্দ্রশেখর	২
১৮৮৩		আনন্দমঠ	২
১৮৮৪		দুর্গেশনন্দিনী	১০
১৮৮৪		কপালকুণ্ডলা	৬
১৮৮৪		দেবী চৌধুরাণী	১
১৮৮৪		দেবী চৌধুরাণী	২
১৮৮৪		বিজ্ঞানরহস্য	২
১৮৮৪		মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত	১
১৮৮৪, ১২৯১ শ্রাবণ—	প্রচার	সীতারাম	
১৮৮৪, ১২৯১ শ্রাবণ—	প্রচার	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম[২]	

২ দেবতত্ত্ব-বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রচারের কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত। বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণে 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' নামে সংকলিত।

প্রকাশকাল	সাময়িকপত্র	গ্রন্থ	সংস্করণ
১৮৮৪, ১২৯১ শ্রাবণ—	নবজীবন	ধর্মতত্ত্ব	
১৮৮৪, ১২৯১ আশ্বিন—	প্রচার	কৃষ্ণচরিত্র	
১৮৮৫		রাজসিংহ	২
১৮৮৫		কমলাকান্ত[৩]	১
১৮৮৫		ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব : 'কবিতা-সংগ্রহ'	
১৮৮৫		বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান : 'লুপ্তরত্নোদ্ধার'	
১৮৮৬		মৃণালিনী	৮
১৮৮৬		ইন্দিরা	৪
১৮৮৬		যুগলাঙ্গুরীয়	৪
১৮৮৬		রাধারাণী	৪
১৮৮৬		আনন্দমঠ	৩
১৮৮৬		আনন্দমঠ	৪
১৮৮৬		কৃষ্ণচরিত্র। প্রথমভাগ	১
১৮৮৬		দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব : দীনবন্ধুর বাংলা রচনা সংবলিত গ্রন্থাবলী	
১৮৮৬, ১২৯৩ শ্রাবণ—	প্রচার	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা[৪]	
১৮৮৭		বিষবৃক্ষ	৬
১৮৮৭		রজনী	৩
১৮৮৭		দেবী চৌধুরাণী	৩
১৮৮৭		দেবী চৌধুরাণী	৪
১৮৮৭		সীতারাম	১
১৮৮৭		বিবিধ প্রবন্ধ	১
১৮৮৮		দুর্গেশনন্দিনী	১১
১৮৮৮		কপালকুণ্ডলা	৭
১৮৮৮		লোকরহস্য	২
১৮৮৮		দেবী চৌধুরাণী	৫

কমলাকান্তের দপ্তর পত্র জোবানবন্দী একত্রে

৪ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

প্রকাশকাল	সাময়িকপত্র	গ্রন্থ	সংস্করণ
১৮৮৮		সীতারাম	২
১৮৮৮		ধর্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ অনুশীলন	১
১৮৮৯		চন্দ্রশেখর	৩
১৮৯০		মৃণালিনী	৯
১৮৯০		বিষবৃক্ষ	৭
১৮৯১		গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক[৫]	২
১৮৯১		কমলাকান্ত	২
১৮৯১		দেবী চৌধুরাণী	৬
১৮৯২		কপালকুণ্ডলা	৮
১৮৯২		বিষবৃক্ষ	৮
১৮৯২		কৃষ্ণকান্তের উইল	৪
১৮৯২		আনন্দমঠ	৫
১৮৯২		বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ	১
১৮৯২		কৃষ্ণচরিত্র । সম্পূর্ণ	২
১৮৯২		Preface : Bengali Selections	
১৮৯৩		দুর্গেশনন্দিনী	১৩
১৮৯৩		মৃণালিনী	১০
১৮৯৩		ইন্দিরা	৫
১৮৯৩		যুগলাঙ্গুরীয়	৫
১৮৯৩		রাধারাণী	৪
১৮৯৩		রাজসিংহ	৪
১৮৯৩		৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী :'সঞ্জীবনী সুধা'	
১৮৯৪		সীতারাম[৬]	৩
১৮৯৪		সহজ রচনাশিক্ষা [৭]	২

৫ কবিতাপুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের নাম।

৬ বঙ্কিমের মৃত্যুর (৮ এপ্রিল ১৮৯৪) পরের মাসে (মে ১৮৯৪) প্রকাশিত।

৭ প্রথম সংস্করণটি এখনও পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয় সংস্করণ মৃত্যুর আট মাস পর প্রকাশিত।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত 'রজনী'র প্রথম পাঠ

প্রসঙ্গ কথা

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত রজনী উপন্যাস প্রথমে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল (১২৮১-৮২)। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে (১২৮৪) উপন্যাসের নাম এবং চরিত্রের নামগুলি অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু কাহিনীর প্রায় সমগ্র অংশই পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে বঙ্গদর্শনে রজনী নামে যে-কাহিনী মুদ্রিত হয়েছিল এবং পরে রজনী নামে গ্রন্থাকারে যে-উপাখ্যান ছাপা হয়—সে দুই উপন্যাস বস্তুত এক নয়। বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত রজনী এক উপন্যাস, আর পুস্তকাকারে প্রকাশিত রজনী আর এক।

বঙ্কিম নিজেই রজনী গ্রন্থখানির ভূমিকায় বলেছেন, 'রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে এই গ্রন্থে এত পরিবর্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে।'

অর্থাৎ বঙ্কিমেরও নিজস্ব অভিমত হল বঙ্গদর্শনের রজনী এবং গ্রন্থভুক্ত রজনী এক গ্রন্থ নয়।

বঙ্কিমের কালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত রজনীই ছিল 'নূতন গ্রন্থ' ; অপর দিকে বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত যে-রজনী সম্পূর্ণ লুপ্তপ্রায়, যার কাহিনী অদ্যাবধি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত, শতবর্ষেরও অধিক কাল পরে সেই রজনীই এখন আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অপরিচিত উপাখ্যান—কিংবা বলা চলে 'নূতন গ্রন্থ'।

বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত এবং অদ্যাবধি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত আর-এক রজনীর সংক্ষেপিত কাহিনী বঙ্কিমের রচনা অবিকৃত রেখে একালের পাঠকের নিকট এই প্রথম উপস্থাপিত করা গেল। সংক্ষেপণের প্রয়োজনে কাহিনীর মধ্যে যে কয়েকটি স্থলে সংকলকের মন্তব্য আছে, তা তৃতীয় বন্ধনীভুক্ত।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা অক্ষুণ্ণ রেখে রজনী উপন্যাসের যে নূতন কাহিনী উপস্থাপিত হল, তার মধ্যে এমন একটি ছত্রও নেই যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত রজনী উপন্যাসের অন্তর্গত।

বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত রজনী উপন্যাস ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ, অপরদিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রজনী পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। এতগুলি খণ্ডের মধ্যে কেবল প্রথম খণ্ডের কাহিনী উভয়ত্র একরূপ।

রজনী উপন্যাসের প্রথম পাঠ

প্রথম খণ্ড : রজনী বক্তা

[প্রথম খণ্ডে অন্ধ রজনীর কথা। সে প্রত্যহ রামসদয় মিত্রের বাড়িতে ফুল বেচিতে যায়। লবঙ্গলতার উদ্যোগে শচীন্দ্র চাঁপার বর গোপালের সহিত রজনীর বিবাহের ব্যবস্থা করে। এদিকে রজনীর মনের মধ্যে শচীন্দ্র বিরাজিত। রজনী তাই বিবাহে অনিচ্ছুক। চাঁপার ব্যবস্থাপনায় রজনী চাঁপার ভাই হীরালালের সাহায্যে ঘর ছাড়িয়া পালায়। পথে হীরালাল রজনীকে বিবাহ করিতে চায়। রজনী তাহাতে অসম্মত হইলে হীরালাল তাহাকে নৌকা হইতে নদীর চরে নামাইয়া চলিয়া যায়।]

দ্বিতীয় খণ্ড : শচীন্দ্র বক্তা

[রাত্রে শচীন্দ্র স্বপ্ন দেখিল। পরদিন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিল—কাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছিলে ? শচীন্দ্র বলে—কাণা ফুলওয়ালী।]

সেই দিবসেই আমার নিকট রজনীর পিতা রাজচন্দ্র, একটি ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া আসিল। আমি রাজচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি রাজচন্দ্র সংবাদ কি ? তোমার কন্যার কোন সংবাদ পাইয়াছ কি ?'

রাজচন্দ্র বলিল, 'মহাশয়, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি ইঁহার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা কহুন ; আমি সেইজন্যই ইঁহাকে লইয়া আসিয়াছি। আপনি আমাদিগের মুরুব্বি ; আপনার পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ করিব না। বিশেষ আমি মূর্খ লোক।'

এই বলিয়া রাজচন্দ্র সঙ্গীকে দেখাইয়া দিল। তাঁহাকে ভদ্রলোক দেখিয়া বসিতে বলিলাম। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। রাজচন্দ্র বাহিরে গিয়া বসিল।

কথোপকথন আরম্ভার্থ জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রাজচন্দ্রের সঙ্গে পূর্বে কি আপনার আলাপ ছিল?' তিনি বলিলেন, 'না। আমি যে জন্য রাজচন্দ্রের কাছে আসিয়াছি তাহা আপনার নিকট জানাইবার জন্য রাজচন্দ্র আমাকে লইয়া আসিয়াছে।'

[শান্তিপুর নিবাসী অমরনাথ শচীন্দ্রকে বলে—রাজচন্দ্রের একটি কন্যা আছে? শচীন্দ্র বলে—আছে বোধ হয়।]

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'বোধ হয়, কেন না সে নিরুদ্দেশ, আছে কিনা সংশয়? যাই হোক তাহাকে পাওয়া গেলে যাইতেও পারে। আপনি তাহার সঙ্গে গোপালের সম্বন্ধ করিয়াছেন। যদি তাহাকে পাওয়া যায় তবে গোপালকেই দেওয়া কি এখনও আপনার মত?'

ইহার অভিসন্ধি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, 'কি জানি। তাহাকে কি অবস্থায় পাওয়া যাইবে, তাহাতে গোপাল আর তাহাকে গ্রহণ করিবে কি না তাহা ত বলিতে পারি না।'

অমর। যদি গোপাল সম্মতই থাকে?

আমি বলিলাম, 'যদি তাহাকে পাওয়া যায়, বিবাহের কোন বিঘ্ন না থাকে, গোপালও অসম্মত না হয়—তবে গোপালকেই--'

আমার সেই স্বপ্নটি মনে পড়িল। আমি কি বলিয়া কথা শেষ করিতাম তাহা বলিতে পারি না। আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অমরনাথ বলিল, 'যদি আপনাদিগের মত হয়, তবে আমি রজনীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক। আমার এই কথা বলিতে আসা। রাজচন্দ্র আপনার অনভিমতে কিছু করিবেন না বলিয়া আপনার নিকট আনিয়াছে।'

অন্ধ ফুলওয়ালীর এরূপ বর, আমরা কেহ কখন স্বপ্নেও ভরসা করি নাই। যদি ঘটে, তবে রজনীর বড় সৌভাগ্য বটে। তাহার প্রতিবন্ধকতা করা আমার অকর্তব্য। কিন্তু গুটি দুই তিন কথা মনে পড়িল। প্রথমতঃ, গোপালকে কথা দেওয়া হইয়াছে। ধনাদির লোভে কি বাক্যলঙ্ঘনে পরামর্শ দিব? দ্বিতীয়তঃ, এ ব্যক্তি অপরিচিত; তৃতীয়তঃ,—দূর হোক, তৃতীয়টি ছাড়িয়া দাও। আমার বোধ হইল যখন রাজচন্দ্র আমার উপর ভার দিয়াছে, তখন কিছু বিবেচনা করিয়া কার্য করা উচিত। আমি বলিলাম, 'এখন রজনীর কোন সন্ধানই নাই। যতদিন না তাহাকে পাওয়া যায় ততদিন এসকল কথার আন্দোলন বৃথা। এখন এসকল কথা থাক। তাহাকে পাওয়া গেলে, এ বিষয়ে মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হইবে।'

অমরনাথ বলিলেন, 'আমার সঙ্গে কথাবার্তা হইলেই তাহাকে পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা।'

আমার ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল—বলিলাম, 'তবে কি আপনি তাহার কোন সন্ধান জানেন?'

অমর। না। কিন্তু সন্ধান করিতে পারি।

আমি। তাহা আমরাও করিতেছি। কই আমরা ত কোন উদ্দেশ পাইতেছি না?

অমর। আপনারা পাইবেন না—কিন্তু আমি পল্লীগ্রামে নানাস্থানে যাই। আমি অবশ্য সন্ধান পাইব।

কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল যে, এ ব্যক্তি নিশ্চিত রজনীর সন্ধান জানে, কিন্তু বলিতেছে না। আমি তখন স্থির করিলাম যে ইহার দ্বারা রজনীর পুনরুদ্দেশ করিব। তাহাকে বলিলাম, 'ভালই। আপনার ন্যায় সুপাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার সন্ধান করুন। যদি সন্ধান পান, তবে আমাদিগকে সংবাদ দিবেন। তাহাকে পাওয়া গেলে, আপনার সঙ্গে পুনর্বার এ বিষয়ে কথাবার্তা হইবে।'

অমরনাথ অতি চতুর। বলিলেন, 'তবে বুঝিতেছি যে, তাহাকে পাওয়া গেলে পরে আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হওয়ার প্রতি আপনার আপত্তি নাই?'

আমি বলিলাম, 'রজনী বয়স্থা—বোধ হয়, তাহাকেও আমাদিগের একবার জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইবে। তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কি প্রকারে আপনাকে কথা দিব?'

অমরনাথ হাসিয়া বলিল, 'যখন গোপালের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, তখন কি রজনীর মত লইয়াছিলেন?'

এই প্রশ্নে আমার অপ্রতিভ হইবার কথা, কিন্তু সে ভাব আমার মনে আসিল না—আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তবে কি রজনীর সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছে? নহিলে রজনীর অনভিমতে যে গোপালের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছিলাম, এ কথা জানিল কি প্রকারে? এই কি রজনীর জার? আবার মনে হইল, পাপিষ্ঠ হীরালালের কাছে এ এ-কথা জানিয়া থাকিবে, অথবা ইহার পিতার কাছে কথা বাহির করিয়া লইয়া থাকিবে, অথবা অনুভবে বুঝিয়া থাকিবে। যাহা হউক সবিশেষ জানিতে হইল। বলিলাম, 'মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, মার্জনা করিবেন ত?'

অমর। কি ? আজ্ঞা করুন।

আমি। আপনি কি এই প্রথম সংসার করিবেন, না আর বিবাহ আছে ?

অমর। এই প্রথম বিবাহ করিব।

আমি। আপনি দেখিতেছি ভদ্রসন্তান, বিদ্বান, সুপুরুষ, সর্বপ্রকারে সুজন, আপনার ন্যায় জামাতা. সকলেই আদর করিয়া গ্রহণ করে। আপনি মনে করিলে এই বঙ্গদেশের অতিপ্রধান ঘরে অতি সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। আপনি দরিদ্র-কন্যা অন্ধ রজনীকে বিবাহ করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?

অমর। দেখুন, আমি বালক নহি। যেখানে বিবাহ করিব, বালিকা বিবাহ করিতে হইবে। রজনীর ন্যায় বয়স্থা কন্যা কোথায় পাইব ?

আমি। আপনি কি রজনীকে দেখিয়াছেন ?

অমর। দেখিয়াছি।

আমি। কিছু মনে করিবেন না—দায়ে পড়িয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে। কোথায় দেখিলেন ?

অমর। কলিকাতাতেই দেখিয়াছি, সে ফুল বেচে, অনেক দিন হইতে দেখি।

এইবার অমরনাথ ঠকিল। রজনী কোথাও ফুল বেচিত না, কেবল আমাদের বাড়ি ফুল লইয়া আসিত। অতএব অমরনাথ একটি মিথ্যা কথা বলিল। আমি নিশ্চিত বুঝিলাম যে, সে রজনীর পলায়নের পর তাহাকে দেখিয়াছে। সে কথা কিছু বলিলাম না। কেবল বলিলাম, 'রজনী বয়স্থা বটে, কিন্তু তাহার দুইটি গুরুতর দোষ আছে। আপনি ভদ্রলোক, হঠাৎ তাহাকে বিবাহ করিবেন অতএব আমার সেগুলি দেখাইয়া দেওয়া উচিত। এক সে অতি সামান্য ইতর লোকের কন্যা—অতি দরিদ্র।'

অমর। ইতর ব্যবসায়ী বটে, কিন্তু আমাদের স্বজাতীয়—তাহাতে দোষ নাই। আর দারিদ্র্যের জন্য আসিয়া যায় না। রজনীর ধন না থাকে, আমার আছে, তাহাতে আমাদের সংসারযাত্রা নির্বিঘ্নে নির্বাহ হইতে পারিবে।

আমি। সে জন্মান্ধ। অন্ধপত্নী লইয়া কি প্রকারে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবেন ?

অমর। যে খেলে সে কাণা কড়িতেও খেলে। যে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে জানে, সে কাণা স্ত্রী লইয়াও সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে।

আমি। আপনার সন্তানাদি অন্ধ হইবার সম্ভাবনা।

অমর। কে বলিয়াছে? আমার দৌহিত্র পৌত্রাদির মধ্যে কেহ কেহ অন্ধ হইতে পারে বটে; না হইতেও পারে। আমি অত ভাবিয়া কাজ করিতে চাহি না। যাহা অনিশ্চিত, ঘটিলেও বহুকালে ঘটিবে, তাহার জন্য উপস্থিত কালে বিড়ম্বনা ভোগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

আমি। আপনার যেমন ইচ্ছা তেমনি করিতে পারেন। তবে আমি যদি সাহায্য করিয়া আপনার কোন উপকার করিতে পারি, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্মের প্রসাদে কলিকাতায় অনেক বয়স্থা কন্যা পাওয়া যায়। বলেন ত আপনাকে তাঁহাদিগের রক্ষকদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিতে পারি।

অমরনাথ তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'যদি অত পীড়াপীড়ি করিলেন, তবে আমাকে অগত্যা সকল কথা বলিতে হইল। বাস্তবিক, সে কথা আমার আগেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু যে কথা ভদ্রলোকে মুখে আনিতে লজ্জা করে, তাহা যে এতক্ষণ বলিতে পারি নাই, সেজন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না। যাহা বলিতেছি, ইহা কেবল আপনিই জানিলেন, আর কন্যাকর্তাকে জানাইবেন, আর কাহাকেও বলিবার আবশ্যকতা হইবে না। কোন ভদ্র ঘরে, আমাকে কন্যা দিবে না। আমাদিগের বংশে একটি গুরুতর কলঙ্ক আছে। আমার খুল্লতাতের একটি কন্যা গৃহত্যাগ করিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এজন্য ভদ্রপরিবারে, আমাকে কন্যা দিবেও না, আমিও সেরূপ সম্বন্ধ লজ্জাবশতঃ খুঁজি নাই। এ বয়স পর্যন্ত আমার বিবাহ না হইবার কারণই এই। একথা আমার প্রথমেই বলা উচিত ছিল—কিন্তু আপনার কুলকলঙ্ক কে আপন মুখে সহসা ব্যক্ত করিতে পারে? বিশেষ আপনাদিগের সঙ্গে এই প্রথম আলাপ। ইহার পরে বলিব, ইচ্ছা ছিল। সে অপরাধ লইবেন না। বোধ করেন কি যে ইহাতে রজনীর পিতা কি কোন আপত্তি করিবেন?'

আমি সুতরাং নিরস্ত হইলাম। অমরনাথ সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিলেন। কেবল একটি কথা এখনও গোপন রহিল। রজনী কোথায়, অমরনাথ তাহা জানেন, কিন্তু কিছুতেই প্রকাশ করিলেন না। তিনি যেরূপ সুচতুর, কথা তাঁহার কাছে বাহির করিয়াও লওয়া যায় না। এদিকে গোপালকে বাক্যদত্ত আছি—অমরনাথকে কথা দিতে পারিতেছি না—না দিলে রজনীকে পাওয়া যায় না। বিষম সংকটে পড়িয়া গোপালকে ডাকাইলাম।

গোপাল আসিল। অমরনাথের সাক্ষাতে গোপালকে বলিলাম, 'রজনীকে ত পাওয়া গেল না—এখন কি কর্তব্য?'

গোপাল বিরক্তভাবে বলিল, 'কর্তব্য আর কি ?'

আমি বলিলাম, 'যদি কেহ রীতিমত তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়, তবে তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে।'

গোপাল। কে যাইবে ?

আমি। তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে, তোমারই যাওয়া কর্তব্য।

গোপাল পূর্ববৎ বিরক্তির সহিত বলিল, 'আমি যাইতে পারিব না।'

আমি। আমরা স্থির করিয়াছি যে, যে রজনীকে সন্ধান করিয়া লইয়া আসিবে, সে অপাত্র না হইলে তাহার সঙ্গেই রজনীর বিবাহ দিব।

গোপাল। সেই ভাল। আর কাহাকে বলুন। আমি রজনীকে খুঁজিয়া আনিতে পারিব না—তাহাকে বিবাহ করিতেও চাহি না। আমার পরিবার আছে।

এই বলিয়া গোপাল উঠিয়া গেল। অমরনাথ বলিলেন, 'এখন আপনি সত্য-চ্যুতির দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন ?'

আমি। অতএব আপনি রজনীর সন্ধান করিয়া লইয়া আসুন।

অমর। তাহার পর আপনারা এ বিবাহে আর কোন আপত্তি করিবেন না ?

সাত পাঁচ ভাবিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, পরবর্ত্তের সম্পত্তি দুই চারিবার স্মরণ করিয়া বলিলাম, 'আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন।'

অমরনাথ, সন্দিহান হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল। মনে করিল বুঝি যে আমার অঙ্গীকার ব্যর্থ। যাহা হউক, আর কিছু বলিতে পারিল না। রজনীকে সন্ধান করিয়া লইয়া আসিব, নচেৎ আর আসিব না। এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

অমরনাথ বাহির হইবামাত্র আমি 'বাদল'কে ডাকিলাম। বাদল একটি ভদ্রসন্তান—বাদলের দিনে জন্ম বলিয়া সকলে তাহাকে বাদল বলে—কোন কর্ম কাজ করে না—আমাদিগের বাড়িতে থাকে—বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র এবং আমার নিতান্ত প্রিয়। বাদল আসিল। আমি বাদলকে বলিলাম, 'যে বাবুটি এই বাহির হইয়া যাইতেছেন উঁহাকে দেখিয়াছ ?'

বাদল। দেখিয়াছি।

আমি। উহার পিছু পিছু যাও। ও যদি গাড়িতে আসিয়া থাকে, তবে আমার বগি এতক্ষণ তৈয়ার আছে, তাহা লইয়া তুমি উহার পশ্চাদ্বর্তী হও। আর যদি দেখ যে হাঁটিয়াই যাইতেছে, তুমিও সেইরূপে উহার পিছু পিছু যাইবে। কিন্তু দেখিও, ও যেন কিছুতেই না জানিতে পারে যে, তুমি উহার পিছু লইয়াছ।

বাদল। তারপর?

আমি। লোকটা কে, কোথায় থাকে, জানিয়া আসিবে।

বাদল তখনই ছুটিল।

ইহার পর রাজচন্দ্রকে বিদায় দিলাম। বলিয়া দিলাম, 'এক্ষণে এ বিবাহে সম্মত হইও না। রজনীকে পাওয়া গেলে যাহা হয় হইবে।' রাজচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।

তাহার পর আমাদিগের একজন সরকার, নাম মার্কণ্ডদেব গাঙ্গুলি, তাহাকে সেই দিনের ট্রেনেই শান্তিপুর পাঠাইলাম। বলিয়া দিলাম যে, 'শান্তিপুরে অমরনাথ ঘোষ কেহ আছে কি না, যদি থাকে, তবে সে কে, কিরূপ বিষয়াপন্ন, কি চরিত্রের লোক, এবং এ পর্যন্ত কেন তাহার বিবাহ হয় নাই, তাহা সবিশেষ জানিয়া আসিবে। অতি সত্বরেই আসিবে।'

রাত্র নয়টার সময়ে বাদল ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম যে 'সংবাদ কি?'

বাদল বলিল। বাবু গাড়ি করিয়া গেলেন। আমি তাঁহার গাড়ির উপর দৃষ্টি রাখিয়া দুইশত হাত তফাৎ পিছু পিছু গেলাম। চোরবাগানের মোড়ে তিনি ভাড়াটিয়া গাড়ি বিদায় দিলেন। আমিও সেইখানে বগি হইতে নামিলাম। তিনি চোরবাগানের ভিতরে অতি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে, একটি উত্তম বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। আমি সেই দ্বারের নিকট বসিলাম। দ্বার আর কেহ খুলিল না। এতরাত্র অবধি সেইজন্য বসিয়াছিলাম। কেহ দ্বারও খুলিল না—বাড়িতে কাহারও সাড়া শব্দ পাইলাম না। প্রতিবাসী-দিগকে ছলক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম। কেহ কিছু বলিতে পারিল না। সকলেই বলে, 'কে এক বাবু বাড়িতে থাকে বটে, আমরা বিশেষ জানি না। আসে যায় দেখিতে পাই।' অগত্যা ফিরিয়া আসিয়াছি।

আমি বলিলাম, 'কালি অতি ভোরে আবার যাইও।'

বাদল পরদিন অতি প্রত্যূষে আবার গেল। তখনই আবার ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'মহাশয়, পাখী পলাইয়াছে।'

'সে কি হে?'

'খাঁচা খালি।'

'সে কি?'

'আজ গিয়া দেখিলাম, বাড়ির দ্বার খোলা—বাড়িতে কোথায় কেহ নাই। প্রতিবাসীরা কেহ কিছু বলিতে পারিল না।'

দুই তিন দিনে মার্কণ্ড শান্তিপুর হইতে ফিরিল। সে বলিল, 'অমরনাথ ঘোষের বাড়িতে গিয়াছিলাম। তিনি বাড়ি নাই। তিনি অতি ধনাঢ্য, বড় ভদ্রলোক। তাঁহার একটি খুড়াত ভগিনী বাহির হইয়া যাওয়ায়, যোগ্য ঘরে তাঁহার বিবাহের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তিনি আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহাদিগের কুলে সেই কলঙ্ক হওয়া অবধি তিনি বড় আর দেশে থাকেন না—প্রায় বিদেশে বিদেশেই ফিরেন।'

তাহারই দুই এক দিন পরে ডাকে এক পত্র পাইলাম। পত্র এই—

'সবিনয় নিবেদন।

আমার পশ্চাতে লোক লাগাইয়াছেন কেন? আপনি ভদ্রলোক— আমিও তাই। ভদ্রোচিত ব্যবহারেরই প্রত্যাশা করি।

শ্রীঅমরনাথ ঘোষ।'

ডাকের মোহর—কলিকাতার।

আমি মনে মনে নিতান্ত লজ্জিত হইলাম।

[শচীন্দ্র বর্তমানে ঘোরতর বিপদাপন্ন। এতকাল তাহারা মনোহর দাসের উত্তরাধিকারীহীন সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিয়াছিল। এখন বিষ্ণুরাম সরকার খবর দিয়াছে যে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারী রজনী উপস্থিত হইয়াছে—বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে। কাগজপত্র দেখিয়া শচীন্দ্রও মনে মনে বিশ্বাস করিয়াছে—বিষয় রজনীর।]

আমি বিষ্ণুরামকে রজনীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন যে, বলিতে তাঁহার প্রতি নিষেধ আছে। প্রথমে মনে করিলাম যে বিষ্ণুরামবাবু আমাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, তিনি আপন কর্তব্যই সাধন করিতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, যে অধিকারিণী সে নিরুদ্দেশ; সে জীবিতা আছে কিনা, নিশ্চিত না বুঝিলে কাহাকেও বিষয় ছাড়িয়া দিব না।

ইহার উত্তর বিষ্ণুরামবাবুর নিকট পাইলাম না। উত্তর উকীল গ্রাণ্ডলি এণ্ড ব্রডসক সাহেবদিগের নিকট পাইলাম। তাঁহারা লিখিলেন যে, রজনী আদালতে হাজির হইতে প্রস্তুত; আমাকে কেন দেখা দিবে?

আমি বুঝিলাম যে, রজনীর প্রদত্ত এ উত্তর নহে। আমি তখন রজনীর পিতা রাজচন্দ্র দাসকে ডাকিতে পাঠাইলাম। পিতাকে রজনী কি বলিয়া দেখা না দিবে?

যে লোক রাজচন্দ্রকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিল। বলিল, রাজচন্দ্র তাহার পূর্ব গৃহে নাই। বাড়ি বেচিয়া সপরিবারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে।

মহা গোলযোগ বোধ হইতে লাগিল। আমার সকল সন্দেহ সেই মধুরভাষী বিদ্যাবিশারদ অমরনাথ ঘোষের উপর গিয়া বর্তিল। রজনীকে বিবাহ করিবার জন্য তাহার ব্যগ্রতার এই কি কারণ? সেই কি রাজচন্দ্র দাসকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে? এতদিনে তাহাকে সম্মত করিয়া রজনীকে বিবাহ করে নাই ত?

রজনীকে অমরনাথ বিবাহ করিয়াছে কি না, এই সন্দেহভঞ্জনার্থ বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলাম না। তখন নিরুপায় হইয়া, উকীলদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই পরামর্শ স্থির করিলাম।

একজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন যে, তুমি এ সকল বিষয়ে উকীলের সাহায্য না লইয়া কোন প্রসঙ্গ করিও না। যাইতে হয় ত একজন উকীল সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। আমার একজন আত্মীয়, রাজকৃষ্ণ গুপ্ত, এটর্নি ছিলেন। রাজকৃষ্ণ সোজা লোক নহে, কিন্তু আমার নিকট বড় বিশ্বাসী। আমি তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলাম।

গ্রাওলি ব্লডসকদিগের কর্মকর্তা ব্লডসক সাহেব। তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল। রাজকৃষ্ণ তাঁহাকে আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, তিনি আমার পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন। পরে বলিলেন যে, এ মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইবে কি না এক্ষণে বলা যায় না। রজনী দাসীর সঙ্গে আমাদের একবার সাক্ষাৎ হইলে, বোধ হয় অনেক কথা পরিষ্কার হইতে পারে।

ব্লডসক বলিলেন, 'কেন, আপনারা কি রফা করিতে ইচ্ছুক?'

রাজকৃষ্ণ বলিলেন, 'আমরা রজনীকে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করি না। এবং রজনী জীবিতা কি না তাহাও জানি না। তবে রজনী যদি জীবিত থাকে, তবে গোল মিটিতে পারে।'

ব্লডসক। আমি তাঁহার উকীল; গোল মিটাইবার কথা আমার সাক্ষাতে বলিতে পারেন।

রাজকৃষ্ণ। আপনি উকীল, ঘটক নহেন; আপনাকে বলিয়া কি হইবে? আপনার মোয়াক্কেল কুমারী, আমার মোয়াক্কেলের গৃহশূন্য; আমার মোয়াক্কেল আপনার মোয়াক্কেলকে বিবাহ করিয়া গোল মিটাইতে চাহেন।

ব্রডসক হাসিয়া উঠিল; আমি অপ্রতিভ হইলাম। আমার সেই স্বপ্নও মনে পড়িল।

ব্রডসক বলিলেন, 'আপনাদের হিন্দুর মেয়ের কয়টা স্বামী হইতে পারে?'

রাজ। কেন?

ব্রডসক। আমার মোয়াক্কেলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

রাজ। কার সঙ্গে, অমরনাথ ঘোষের সঙ্গে? সে কথা মিথ্যা।

ব্রডসক হাসিল, বলিল, 'এ মোকদ্দমায় সে তর্ক উঠিবে না; সুতরাং সে বিবাহ মিথ্যা সত্যের বিচারে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, অমরনাথ জীবিত থাকিতে, আপনার মোয়াক্কেলের বিবাহের দ্বারা মোকদ্দমা মিটাইবার সম্ভাবনা নাই। অমরনাথ মরিলে বাবু বিধবা বিবাহ করিতে পারেন।'

আমার সহ্য হইল না। আমি উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।

কার্য সিদ্ধ হইল বটে কিন্তু রাজকৃষ্ণের প্রতি বড় রাগ করিলাম।

গৃহে আসিয়া পুনর্বার বাদলচন্দ্রকে স্মরণ করিলাম। অনুমানে বুঝিয়াছিলাম, রজনীর মোকদ্দমার কাণ্ডটা অমরনাথ সকলই করিতেছে। বিষ্ণুরামবাবু যে প্রমাণাদির কথা বলিয়াছিলেন. সে প্রমাণ উত্তম বটে কিন্তু অমরনাথের জন্য আমার সর্বত্র সংশয় হইতেছিল। অমরনাথের নিগূঢ় সন্ধান লওয়া আমার কর্তব্য বোধ হইতে লাগিল। অমরনাথও সেই একবার দেখা দিয়া কেবল লুকাইয়া বেড়াইতেছে।

আমি তখন বাদলকে বলিলাম যে, 'যে অমরনাথ ঘোষের সন্ধানে তুমি চোর-বাগানে গিয়াছিলে সেই অমরনাথের সন্ধানে তোমাকে আবার যাইতে হইবে। সে বোধ হয় গ্রাণ্ডলি ব্রডসকের আপিসে মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে। সেইখানে সন্ধান করিতে হইবে।'

বাদল, ছাতি ঘাড়ে করিয়া, গ্রাণ্ডলি ব্রডসকের বাড়িতে কেরানিগিরির উমেদারিতে যাতায়াত আরম্ভ করিল। চাকরি সহজে হয় না; সুতরাং বাদলও আর তাঁহাদের আপিস ছাড়া নহে। প্রথম প্রথম অমরনাথের দেখা পাইল না; শেষ একদিন দেখিল, সেই বাবু উঁহাদিগের আপিসে প্রবেশ করিলেন।

বাদল তাঁহাকে কিছু বলিল না। তাঁহার গাড়িয়ানের সঙ্গে ছলে কথোপকথন আরম্ভ করিয়া বাসার ঠিকানা জানিয়া লইল। গাড়িয়ান বাসা জানে না। তবে সে ইহাই বলিল যে আহিরীটোলার মোড়ে তাহাকে নামাইয়া দিতে হইবে, ইহাই চুক্তি আছে।

বাদল অগ্রসর পদব্রজে গিয়া ঐ মোড়ের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। দুই ঘণ্টা পরে বাবু আসিয়া সেখানে নামিলেন। বাদল, অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাতে গিয়া তাঁহার বাসা দেখিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতে আমি বাদলকে সঙ্গে করিয়া সেই ভবনে গেলাম। প্রথমে রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে দেখা হইল। সে নমস্কার করিল। আমি তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম, 'এখানে কোথা হইতে?'

রাজ। আজ্ঞা এ আমার জামাতার বাড়ি।

আমি। তোমার জামাই কে? রজনীর স্বামী না কি?

রাজ। আজ্ঞা।

আমি। তবে রজনীকে পাওয়া গিয়াছে?

রাজ। আজ্ঞা।

আমি। কোথায় পাওয়া গেল?

রাজ। আমি এইখানে আসিয়াই দেখিলাম।

আমি। রজনী পলাইয়াছিল কেন, কিছু শুনিয়াছ?

রাজ। আজ্ঞা, মেয়েমানুষ, সতীনের ঘর করিতে চাহে না।

আমি। এখন বিবাহ দিয়াছ কাহার সঙ্গে।

রাজ। আজ্ঞা, সেই অমরনাথবাবুর সঙ্গে।

আমি। যদি সেই পাত্রে তোমার কন্যা দেওয়া অভিপ্রায় ছিল, তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলে কেন?

'ভদ্রতার জন্য।'

এ উত্তর রাজচন্দ্র দিল না; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, অমরনাথ।

অমরনাথ আমার হস্তধারণপূর্বক সাদরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। কিন্তু বোধ হয় উভয়েই জানিতে পারিলাম যে, দুইজনে পরস্পরের পরম শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছি।

অমরনাথ মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন—যেন আমি তাঁহার পরম সুহৃদ—যেন কাহারও মনে কোন মালিন্য নাই—কোন দিকে কোন গোলোযোগের কথা উপস্থিত হয় নাই। আমিও সেই রূপ করিতে লাগিলাম। আপনারা কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, আমি অমরনাথের সঙ্গে বিবাদ-বচসা করিতে বা তাহাকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে আসিয়াছি, তবে আপনারা মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিবাদ বচসা করিলে কোন্ উপকার হইবে? আর অনুরোধেই বা কে ঐশ্বর্য্য

পরিত্যাগ করিয়া থাকে? আমার সে সকল অভিপ্রায় ছিল না। যে অভিপ্রায়ে এত সন্ধান করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা গোপন করিয়া, আমিও মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। অতি ধূর্তের সঙ্গে কার্য, ইহা স্মরণ রাখিলাম। কিন্তু সে অভিপ্রায় আমার সিদ্ধ হইল না।

কথোপকথন মধ্যে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া আমি বলিলাম, 'আপনার সঙ্গে কথোপকথনে বড়ই প্রীতি পাই। এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে চলিল—ভরসা করি, তাহাতে সম্প্রীতির স্থানে বৈরিতা উপস্থিত হইবে না।'

আমার বোধ ছিল, অমরনাথ মিষ্টভাষী শঠের মত মধুমাখা মিথ্যা কথায় উত্তর দিবেন। কিন্তু অমরনাথ তাহা না করিয়া স্পষ্ট কথাই বলিলেন—যাহা বলিলেন, তাহা সত্যবাদী, বুদ্ধিমান, উদারচরিত্তের কথা। বলিলেন, 'কি প্রকারে সম্প্রীতি থাকিবার সম্ভাবনা? আপনাদিগের অবশ্য এরূপ ধারণা আছে যে আমি একটা মিথ্যা কাণ্ড উপস্থিত করিয়া আপনাদিগের সম্পত্তি অপহরণ করিতেছি; এ ধারণা না থাকিলে মোকদ্দমার প্রয়োজন হইবে কেন? যদি আপনার এরূপ বিশ্বাস থাকে, তবে আপনি আমাকে ভালবাসিবেন কি প্রকারে? আর আমি যদি বিবেচনা করি যে, আপনারা আমার যথার্থ প্রাপ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়া অনর্থক আদালতে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তবে আমিই বা আপনাদিগের প্রতি ভক্তিমান হইব কি প্রকারে?'

আমি বলিলাম, 'যে দিন আমার মনে বিশ্বাস হইবে যে রজনীর সম্পত্তি আমরা ভোগ করিতেছি সেই দিন আমি সে সম্পত্তি পরিত্যাগ করিব।'

অমর। তবে আপনার সে বিশ্বাস এখনও হয় নাই?

আমি। কিসে হইবে?

অমর। আমাদিগের যে প্রমাণাদি আছে, তাহা বিষ্ণুরামবাবুর কাছে দেখিয়া থাকিবেন।

আমি। প্রমাণের একটা ইয়াদদাস্ত দেখিয়াছি; দলিলগুলি দেখি নাই।

অমর। দলিলগুলি আমার কাছে আছে। যদি আপনার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেই মোকদ্দমার দায় হইতে উদ্ধার পাই, তবে যত্ন করিয়া আপনাকে দলিলগুলি দেখাইতে হইতেছে। এখন দেখিবেন কি?

এরূপ সরল ব্যবহার আমি অমরনাথের নিকট প্রত্যাশা করি নাই। বলিলাম, 'অবশ্য দেখিব।'

অমরনাথ একটি বাক্স আনিয়া, তাহা হইতে দলিলের তাড়া বাহির করিলেন। তাড়া খুলিতে খুলিতে বলিলেন, 'বোধ হয় যে, হরেকৃষ্ণ দাসের যদি কন্যা বর্তমান থাকে, তবে সে যে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারিণী, তদ্বিষয়ে আপনার সংশয় নাই ?'

আমি বলিলাম, 'আইন অনুসারে সে উত্তরাধিকারিণী কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না, কেননা আমি আইনজ্ঞ নহি। কিন্তু আইন অনুসারে হউক বা না হউক, আমার নিকট ধর্মতঃ সে আমার পিতামহের বিষয় পাইতে পারে বটে।'

[অমরনাথ একটি জোবানবন্দীর জাবেতা নকল শচীন্দ্রের হাতে দিল। শচীন্দ্র তাহা পাঠ করিয়া বলিল—মোকদ্দমা করা বৃথা। আপনি নালিশ করিবেন না। রজনীর বিষয় রজনীকে ছাড়িয়া দিব। কেবল এই সম্পত্তির তুল্য-অধিকারী অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রইল মাত্র।]

অমরনাথকে বলিলাম, 'আর একটি ভিক্ষা আছে।'

অমরনাথ বলিলেন, 'আজ্ঞা করুন।' আমি বলিলাম, 'আমাদিগের হিন্দু সমাজের এমত রীতি নহে যে ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তবে রজনীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সেরূপ নহে। রজনীকে আমাদিগের পরিবারস্থা বলিলেও হয়। অতএব আমি যদি তাহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহি, তবে আপনি বিস্মিত হইবেন না।'

'কিছুমাত্র না—বরং এখনই সাক্ষাৎ করুন'—এই বলিয়া অমরনাথ আমাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। এবং রজনীকে আমার কাছে ডাকিয়া দিয়া বিশ্বাস ও ভদ্রতা দেখাইবার জন্য স্বয়ং কর্মান্তরে গেলেন।

আমি রজনীর কাছে বিষয় ভিক্ষা লইতে আসি নাই—তাহার অপেক্ষা দারিদ্র্য বা অনশনে মৃত্যুও ভাল। কিন্তু রজনী কি বলে, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল ছিল। রজনী আমার বিমাতার কাছে অনেক বিষয়ে উপকৃতা। ইতর লোকে অসময়ের উপকার সময়ে মনে রাখে না। কিন্তু আমার স্থির বিবেচনা ছিল, রজনীর স্বভাব সেরূপ ইতর নহে। তজ্জন্য রজনী যদি বিষয় লইতে কুণ্ঠিত হয়, তবে তাহাকে বুঝাইয়া দিব যে কুণ্ঠিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। আরও ইচ্ছা ছিল, কেনই বা সে পলাইয়াছিল, অমরনাথের সঙ্গে কি প্রকারেই বা বিবাহ ঘটিল, যদি জানিতে পারি, তাহাও জানিব। কিন্তু ইহাও বিস্মৃত হই নাই যে এ-সকল কথা এ-সময়ে এ-স্থানে জিজ্ঞাসা করা অকর্তব্য। শেষ কথা, আর একটি পরীক্ষা—কিন্তু সেটি মনে স্থান দিতে পারিলাম না—কেননা এখন রজনীর বিবাহ হইয়াছে। যাহা

হউক, নিতান্ত কৌতূহলপরায়ণ হইয়াই আমি রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলাম।

রজনী আসিয়া কিছু বলিল না,—নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'আমি শচীন্দ্র। একটা কথার জন্য আসিয়াছি।'

রজনী মৃদুস্বরে বলিল. 'আজ্ঞা করুন।'

আমি বলিলাম. 'তুমি নাকি আমাদিগকে নিঃস্ব করিয়া বিষয় কাড়িয়া লইতেছ?'

রজনী বলিল, 'বিষয় আমার।'

হরি বোল!

বিষয় রজনীর হউক, কিন্তু রজনী যে আমার মুখের উপর একথা বলিবে, এমত কখন আমি মনে করি নাই। পুনরপি বলিলাম, 'বিষয় আমার পিতামহের—তুমি আমার পিতামহের কে?'

রজনী বলিল, 'কেহ নই। তবে আইন মতে আমি পাই।'

রজনীকে বিষয় ছাড়িয়া দিব, ইহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম, তবে এখন রজনীর কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'আইনমতে পাইলেই কি লইবে?'

রজনী বলিল, 'আমি বিষয় লইব।'

আমি রাগ করিয়া বলিলাম, 'তুমি এমন রাক্ষসী তাহা জানিতাম না।'

এই বলিয়া আমি বাহিরে যাইব বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিলাম। তখন রজনী ছিন্ন কদলীতরুবৎ ভূমিতে পড়িয়া গেল—তাহার কণ্ঠনির্গত চিৎকার আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল—এরূপ কাতর, এরূপ সকরুণ চিৎকার আমি কখন শুনি নাই। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম রজনী মূর্চ্ছিতা।

নিকটস্থ পাত্রে জল ছিল তাহা রজনীর মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম, এবং বস্ত্রের দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলাম। কাহাকেও ডাকিলাম না। দেখিতে লাগিলাম, বাত্যাপতিত বৃষ্টিজলসিক্ত প্রস্তর-পুত্তলীর ন্যায় রজনী পড়িয়া রহিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া রজনী অতিকষ্টে, রুদ্ধস্বরে বলিল, 'আপনি এখান হইতে যান। কোন কালে যদি আপনাকে ডাকিয়া পাঠাই, তবে আসিবেন, দুই একটা কথা বলিবার আছে। এখন কেন আসিয়াছেন?'

আমি ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলাম।

তৃতীয় খণ্ড : অমরনাথ বক্তা

এতদিনে যত্ন সফল হইল—মিত্রদিগের অতুল সম্পত্তির আমি অধীশ্বর হইলাম। শচীন্দ্র এবং তাহার অগ্রজ অনর্থক মোকদ্দমা করিল না—বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে। শুনিয়াছি, শচীন্দ্র ডাক্তারি করিয়া দুই এক টাকা উপার্জন করিতে চেষ্টা করিতেছে—তাহার ভাই কেরানিগিরির উমেদারিতে ফিরিতেছে। দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই—কিন্তু আমি কি করিব? ন্যায্য সম্পত্তি কি সেই অনুরোধে ছাড়িয়া দিব? টাকায় যদি পৃথিবীতে প্রয়োজন না থাকিত, ক্ষতি ছিল কি? কিন্তু তথাপি আমি শচীন্দ্রকে কিছু দিতে চাহিয়াছিলাম—সে লইল না। কোন্ ভদ্রলোকে লইত?

সম্পত্তি হস্তগত হইলে, রজনী জিজ্ঞাসা করিল, 'এ সম্পত্তি আমার স্থিরতর হইয়াছে বটে?'

আমি বলিলাম, 'তাহাতে সন্দেহ নাই।'

রজনী জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি এখন ইহা দান বিক্রয় করিতে পারি?'

আমার মুখ শুকাইল—বলিলাম, 'কেন, কাহাকে দান বিক্রয় করিবে?'

আমার কণ্ঠস্বরে ভয় বুঝিতে পারিয়া রজনী হাসিল, বলিল, 'ভয় নাই, আর কাহাকেও নহে। আপনাকেই দান করিব, ইহা আপনার পরিশ্রমে পাইয়াছি, আমার নামে না থাকিয়া, আপনার নামে থাকে, ইহা আমার সাধ।'

মনে মনে আমারও সেই ইচ্ছা ছিল। রজনীর সম্মতি পাইয়া আমি উকীলের বাড়ি গেলাম—লেখাপড়া করাইলাম। রজনী তাহা রেজিস্টরি করিয়া দিল। এ কথা এক্ষণে গোপন রাখিলাম।

সম্পত্তির উপর বজ্রের মত আঁটিয়া বসিয়া বড়মানুষি করিব একবার ইচ্ছা হইল। বড়মানুষির সুখ যাহা তাহা বিলক্ষণ জানিতাম, তবে এ শুঁড়ি সোনার বেনের সাধ আমার মনে উদয় হইল কেন? ইহার কারণ কলিকাতা শুঁড়ি সোনার বেনের সমাজ; এখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থের চরিত্রেও একটু একটু বেনেগিরি আছে—এখানে একটু বড়মানুষি না করিলে কেহ গ্রাহ্য করে না। এখানে গণ্য হইতে গেলে, হয় হুজুগ তুলিতে হইবে, নহে রাজপ্রসাদ পাইতে হইবে, নহে গলাবাজি করিতে হইবে, নয় বড়মানুষি করিতে হইবে। হুজুগ আমার এসে না—রাজপ্রসাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই; গলাবাজি ভাল লাগে না; সুতরাং বড়মানুষিই অবলম্বন করিলাম, আর বোধ হইল রজনী চিরদরিদ্রা;—বড়মানুষি তাহার ভাল লাগিতে পারে—অতএব রজনীর জন্য সে ইচ্ছা হইল। বড় দেখিয়া বাড়ি কিনিলাম। গৃহসজ্জায়

দাসদাসীতে তাহা পরিপূর্ণ করিলাম—স্বর্ণ রৌপ্য যেখানে যাহা প্রয়োজন, মুক্তহস্তে ছড়াইলাম। বাছিয়া বাছিয়া গাড়ি আনিলাম—বাছিয়া বাছিয়া ঘোড়া তাহাতে যুড়িলাম—শেষ সাধ,—রজনীকে রত্নালঙ্কারে সাজাইব।

হায়—কাহাকে সাজাইব? সে ত কিছু দেখিতে পাইবে না। কাহার জন্য এ গৃহ সাজাইলাম—সে ত কিছু দেখিতে পাইল না!

রজনীকে অলঙ্কারের কথা বলিলাম। রজনী হাসিল। বলিল, 'কালি বলিব।'

'কেন, আজ?'

রজনী বলিল, 'আজ একবার লবঙ্গলতা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইব।'

আমি বিস্মিত হইলাম—রুষ্টও হইলাম। আগে রাগের কথা বলিলাম, 'আজিও সে তোমার ঠাকুরাণী কিসে?'

রজনী। আমি তাঁহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছি, সম্ভ্রমটুকু না কাড়িলেও চলে।

আমি। তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে কেন?

রজনী। প্রয়োজন আছে। পশ্চাৎ বলিব।

আমি। আমি আগে শুনিব।

রজনী। জেদ করিবেন না।

সুতরাং জেদ করিলাম না। বলিলাম, 'তুমি তাহার কাছে না গিয়া, সে তোমার কাছে আসিলে হয় না?'

রজনী। সে আসিবে কেন?

আমি জানিতাম—লবঙ্গলতা আসিলেও আসিতে পারে। ভিতরে কিছু গুপ্ত কথা ছিল। রজনী তাহা জানিত না। বলিলাম, 'ডাকিলে আসিতে পারে।'

রজনী। আমি তাঁহার বিষয় কাড়িয়া লইয়া এমন কি বড়লোক হইয়াছি যে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইব?

আমি বলিলাম, 'সে কথা নহে। আচ্ছা, তুমি দেখ, আমি নিজে তাহাকে ডাকিতে যাই। না আসে তখন তুমি যাইও।'

আমি স্বয়ং রামসদয় মিত্রের বাড়ি গেলাম। রামসদয় আমাকে দেখিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন না। শচীন্দ্র চক্ষুলজ্জা-বশতঃ আমার নিকটে আসিয়া বসিল। তাহাকে বলিলাম, 'আমার পরিবার কোন বিশেষ কথা আপনার বিমাতার নিকট বলিতে চাহেন। আপনার বিমাতাকে

জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য আমার পরিবার এখানে আসিবেন, না আপনার বিমাতা আমাদিগের বাড়িতে পায়ের ধূলা দিবেন।'

শচীন্দ্র বলিলেন, 'জিজ্ঞাসা করা বৃথা। রজনীর এ পরিচিত স্থান—তিনি অনায়াসেই এখানে আসিতে পারেন।'

আমি বলিলাম, 'সত্য। তথাপি আপনার একবার জিজ্ঞাসা করায় ক্ষতি হইবে না।'

'অনর্থক কষ্ট দিলেন।' বলিয়া শচীন্দ্র অনুরোধ রক্ষার্থ একবার অন্তঃপুরে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'আমার পিতা সম্মত হইলে, বিমাতাই যাইবেন।'

রামসদয় যে আপত্তি করিবেন তাহা আমি একবার ভ্রমেও মনে স্থান দিলাম না। বৃদ্ধ স্বামী কোন্ কালে যুবতী ভার্যার ইচ্ছায় অসম্মত হইয়াছে? আমি নিঃশঙ্কচিত্তে গিয়া রজনীকে বলিলাম যে 'লবঙ্গলতা আসিবে।' রজনী একটু বিস্মিতা হইল।

পরদিন প্রাতে লবঙ্গলতা আসিল।

[অমরনাথ ললিতলবঙ্গলতাকে বলিল—একটি ভিক্ষা। যাহা জান, তাহা যদি অন্যের কাছে না বলিয়া থাক, তবে রজনীর কাছেও বলিয়ো না। লবঙ্গ বলিল—স্বামীর নামে স্ত্রীর কাছে ঠকাম করিবার জন্য সে তাহাদের বাড়িতে আসে নাই।]

লবঙ্গলতা বলিল, 'তবে ইহা বলিতে পারি, যদি তুমি রজনীকে বিবাহ করিবার অগ্রে আমি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিতাম যে তুমি রজনীকে বিবাহ করিবে, তাহা হইলে আমি কখন এ বিবাহ হইতে দিতাম না। এখন বিবাহ হইয়াছে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি ঘর ভাঙ্গিয়া রজনীকে কাতর করিব না।'

হঠাৎ এক সন্দেহ—এক আহ্লাদ মনে উদয় হইল—যাহা আগে ভাবিয়াছিলাম, তাই বা? নহিলে লবঙ্গলতা আসিল কেন? বলিলাম, 'যদি আমার সে সন্দেহ থাকিবে, তবে যত্ন করিয়া তোমাকে লইয়া আসিব কেন?'

লবঙ্গ আমার অপেক্ষাও ধূর্ত, বলিল, 'তুমি সেজন্য আমাকে আন নাই। তুমি কেবল ইহাই জানিতে চাও, আমি তোমার সর্বনাশ করিব কি না?'

আমি বলিলাম, 'যদি তাই মনে করিয়া আনিয়া থাকি, তাতেই বা ক্ষতি কি?'

ললি। কি বুঝিলে?

আমি বলিলাম, 'তুমি ভাঙ্গিয়া না বলিলে আমি বুঝি আমার সাধ্য কি?'

ললি। কেননা শচীন্দ্রের মত কাঁচা ছেলে পাও নাই। (আমি মনে মনে একটু হাসিলাম, কেননা, শচীন্দ্র বিমাতার অপেক্ষা বয়সে বড়) লবঙ্গ বলিতে

লাগিল, 'আমি ভাঙ্গিয়াই বলিব। তুমি আমাদের কোন অন্যায় অনিষ্ট কর নাই—ন্যায় মতেই আমরা বিষয় হারাইয়াছি—এজন্য তোমাকে কিছু বলি নাই। রজনীকে বিবাহ করিয়াছ, তাহাতেও কিছু বলিব না। —কেননা, বিবাহ কিছুতেই ফিরিবে না। কিন্তু দেখিও— আর কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে যদি তোমাকে প্রবৃত্ত দেখিব— তবে আমার যাহা কর্তব্য তাহা করিব। এ-কথাই বলিতে আমি আসিয়াছি। এখন রজনীর কাছে চলিলাম। ইচ্ছা হয় সঙ্গে এসো।'

রজনী [কিছু পরে লবঙ্গকে অমরনাথের সম্মুখেই] সকাতরে বলিল, 'আমি যদি কখন আপনার দ্বারে গিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করি, তবে আমাকে আশ্রয় দিবেন কিনা? না অপরাধিনী বলিয়া তাড়াইয়া দিবেন?'

লবঙ্গলতা বলিল, 'তোমার যেদিন ইচ্ছা সেইদিন আসিও। আমার গৃহ, তোমার গৃহ। আমার যতদিন অন্ন জুটিবে, তোমারও ততদিন জুটিবে।'

এই বলিয়া, আমার মুখপানে চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া, ললিতলবঙ্গলতা, সোপান অবতরণ পূর্বক শিবিকারোহণ করিল।

ললিতলবঙ্গলতা চলিয়া গেলে পর, আমি রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'লবঙ্গ তোমাকে কি বলিয়াছে?'

রজনী। যাহা আপনি শুনিলেন, তাহাই।

আমি বলিলাম, 'আমার কথা কিছু?'

রজনী। কিছু না।

আমি। তুমি তাহাকে কি বলিয়াছ?

রজনী। আপনি যাহা শুনিলেন, তাই।

আমি। আমার কথা কিছু?

রজনী। কিছু না।

আমি। আমি যাহা শুনিলাম, তাহাই কেন বলিতেছিলে? কিজন্য তুমি তাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাহিতেছিলে? এইজন্য কি তুমি লবঙ্গের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছিলে?

রজনী। এইজন্যই। যে বিষয়বিভব আপনার উদ্দেশ্য তাহা আমি আপনাকে লিখিয়া দিয়াছি। এক্ষণে আমাতে আপনার আর প্রয়োজন নাই। আমাকে ত্যাগ করুন!

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। 'সে কি রজনি? এ-কথা কেন বলিতেছ? তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে।'

রজনী। যেখানে আশ্রয় পাইব।

আমি বলিলাম, 'আমি কি অপরাধ করিয়াছি? কিসে আমার উপর রাগ করিলে?'

রজনী। আপনার উপর রাগ কিছুই নহে—এবং এ শরীর ধারণে কখন আপনার উপর রাগ করিতে পারিব না। তবে আপনার অনুরোধে, অত্যন্ত গর্হিত কার্য করিয়াছি। যাহারা বাল্যাবধি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছে, তাহাদিগের সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছি। যাহারা রাজা ছিল, আমার চক্রে তাহারা পথের কাঙ্গাল হইয়াছে। আপনার ঋণ পরিশোধের জন্য এ সকলও আমার কর্তব্য হইয়াছিল—আপনার কথায় তাহা করিয়াছি। আপনি সে ধনের অধিকারী হইবেন বলিয়া এ দুষ্কর্ম করিয়াছি, কিন্তু স্বয়ং সে ঐশ্বর্য ভোগ করিতে পারিব না। যাহাদিগের বিষয় কাড়িয়া লইয়াছি, তাহাদিগের দাসীত্ব করিয়া কালযাপন করিব।

বুঝিলাম। বলিলাম, 'এ সম্পত্তি কাহার? তোমার নহে?'

রজনী। আমার হইলেও আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই।

আমি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলাম—নিতান্ত ভীত হইলাম। যদি রজনী এখন আমার গৃহত্যাগ করিয়া মিত্র গোষ্ঠীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে লোকে মনে করিবে রজনীর ইচ্ছা ছিল না, আমিই অর্থের লোভে রজনীকে হস্তগত করিয়া কুচক্রে মিত্রদিগকে এই বিপদগ্রস্ত করিয়াছি। লোকে অন্যায় মনে করিবে না, কিন্তু লোকের এরূপ মনে করা আমার পক্ষে ভাল নহে। আমার বিষয় কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না বটে, কিন্তু কুলোক বলিয়া সমাজে পরিচিত হওয়া মঙ্গলের কথা নহে। কুলোক বলিয়া যে পরিচিত তাহার কোন ইষ্ট সিদ্ধ হয় না—সমাজে তাহার সকলেই শত্রুতা করে। রজনী বিষয় আমাকে দিয়া স্বয়ং ভিখারিণী হইয়া পরাশ্রয়ে গেলে আমি সমাজে অর্থলুব্ধ কুচক্রী হইয়া দাঁড়াইব। আমার সম্ভ্রম যাইবে। আমার সম্ভ্রম সর্বস্ব। অতএব রজনীকে যাইতে দেওয়া হইবে না।

আমি বলিলাম, 'তুমি যদি আমাকে প্রবঞ্চনা করিবে জানিতাম, তাহা হইলে তোমার বিষয় উদ্ধারের জন্য এত করিতাম না। এখন কি তাহার এই প্রতিফল?'

রজনী। ঐ কথাটি বলিবেন না। আপনি আমার জন্য বিষয়ের উদ্ধার করেন নাই। নিজের জন্য করিয়াছেন। আমি আপনাকে অনেকবার নিষেধ করিয়াছি। আপনি শুনেন নাই। আপনার ইহাতে নিতান্ত সুখ বুঝিয়া আমি সুতরাং আপনার প্রতিকূলতাচরণ করি নাই—কেন না, আপনার কাছে আমি বড় ঋণে বাঁধা আছি। এখন আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছি, এখন আমাকে ছাড়িয়া দিউন।

আমি। কেমন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে? লোকে কি বলিবে? আমি যে তোমার স্বামী!

রজনী। কার্যোদ্ধার হইয়াছে—বিষয় আপনার হইয়াছে—এখন আর লোককে প্রবঞ্চনা করিব কেন? আপনি আমার স্বামী নহেন, পৃথক হইবার বিচিত্রতা কি?

মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এ কথাও রজনী প্রকাশ করিবে! রজনীকে বুঝাইয়া বলিলাম—'দেখ রজনি, কয় মাস স্ত্রী-পুরুষ পরিচয়ে একত্রে বাস করিতেছি। এখন তুমি যদি বল তুমি আমার স্ত্রী নহ, কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে?'

রজনী বলিল, 'যখন আমি বলিব যে, মিত্রদিগের বিষয় নিজ হস্তগত করিবার জন্য অমরনাথবাবু আমার স্বামী সাজিয়াছিলেন, তখন সকলেই আমার কথায় বিশ্বাস করিবে। কেন না মন্দ কথাটা লোকে সহজেই বিশ্বাস করে—বুঝাইতে হয় না।'

আমি বলিলাম, 'যদি তাহা বুঝ, তবে আর একটা কথা ভাবিয়া দেখ। তুমি আমার অন্তঃপুরে আমার স্ত্রী পরিচয়ে এতদিন বাস করিয়াছ, তবে এখন যদি বল যে, তোমার বিবাহ হয় নাই, তবে লোকে মনে করিবে, তুমি কুলটার মতই আমার ঘরে ছিলে।'

লজ্জায়, দুঃখে, ক্রোধে রজনীর মুখ নীলবর্ণ হইল। রজনী কাঁদিতে লাগিল, পরিশেষে কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, 'যাহার অন্য উপায় নাই, তাহার এক উপায় আছে। সে মরিতে পারে। যে অন্ধ, সে যদি মরিবার অন্য কোন উপায় না পায়, তবে অনাহারেও মরিতে হইবে। আমি স্ত্রীজাতি, সহজে আত্মহত্যা করিতে পারি।'

তখন আমিও সকাতরে বলিলাম, 'রজনি তোমার চক্ষু নাই, আমার আঘাত চিহ্নগুলি তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। নহিলে সেগুলি দেখাইয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিতাম, যাহার জন্য এই সকল আঘাত শরীরে ধরিয়াছি তাহার কাছে আমার কি এই পুরস্কার হইল।'

রজনী আরও কঠিন হইল। বলিল, 'তাহার পুরস্কার, মিত্রদিগের জমিদারী। আপনি আমার জন্য শরীরদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—সে উপকারের প্রতিশোধ কিছুতেই হইতে পারে না বটে, কিন্তু আমার যাহা সাধ্য তাহা করিয়াছি। আপনাকে আমার বিষয় দিয়াছি। আপনি পুরুষ, আপনি মহৎ কার্য করিতে পারেন; আমি স্ত্রীজাতি, সামান্য কার্যই পারি; তাই, আপনার মহৎ কাজে আমার সামান্য কাজে শোধ হইল মনে করুন। এইরূপে আপনার ঋণ

পরিশোধ করিব বলিয়াই এতদিন আপনার বশবর্তিনী হইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাই করিয়াছি। শচীন্দ্রবাবুকেও রূঢ় কথা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি।'

'শচীন্দ্রবাবুকেও রূঢ় কথা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি।' কথাটি বলিবার সময় রজনীর কথা একটু বিকৃত হইল—কথাটিতে অপ্রতিভের চিহ্ন ছিল—তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না—আমার ভাল লাগিল না—মর্ম বুঝিবার জন্য বলিলাম, 'কেন, যে এতদিন বঞ্চনা করিয়া তোমার ধনে বড়মানুষি করিয়াছে, তাহাকে রূঢ় কথা বলিতে ক্ষতি কি ?'

রজনী। জানিয়া কেহ আমায় বঞ্চনা করে নাই—বরং তাঁহারা আমার উপকার করিতেন। কিন্তু সে কথায় এখন কাজ কি ? আপনি আমাকে বিদায় দিন।

আমি বুঝিলাম যে, রজনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরসংকল্প। যে একবার গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, সে আর একবার পারে। মিথ্যা বাগজাল ত্যাগ করিয়া বলিলাম, 'যদি আমার সংসর্গ ত্যাগ করাই তোমার স্থির হইয়াছে, তবে মিত্রদিগের আশ্রয়েই যাইতে হইবে কেন ? আর কি স্থান নাই ?'

সকাতরে রজনী বলিল, 'কোথায় স্থান ?'

আমি। কেন তোমার পিতার সঙ্গে যাও না ?

রজনী। তিনিও আপনার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ—আপনার বখরাদার। তিনি সুখ-সম্পদ্ ছাড়িয়া যাইবেন না।

আমি। আমি তোমাকে স্বতন্ত্র বাড়ি কিনিয়া দিতেছি।

রজনী। আপনার টাকার ভাগ লইয়া আমি সুখ কিনিব না।

আমি। আমার সকল টাকা মিত্রদিগের বিষয়ের উপস্বত্ব নহে। আমার নিজের বিষয় আছে। তাহার উপস্বত্বও যথেষ্ট। তাহা হইতে তোমার উপায় করিব।

রজনী। তাহা হইতেও আমি কিছু লইব না। সে কেবল ডান-হাত বাঁ-হাত মাত্র।

আমি। আমি তোমাকে বিষয়ের ভাগ দিতে চাহিতেছি না। শান্তিপুরে আমার পৈতৃক বাড়িতে তোমাকে পাঠাইতেছি। সেখানে আমার পৈতৃক সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে অনেক অনাথা গ্রাসাচ্ছাদন পাইতেছে। তুমি সেইখানে তাহাদিগের মত থাকিবে। তুমি কে, কি বৃত্তান্ত কেহ জানিবে না।

রজনী সম্মতা হইল।

কিন্তু সেই সময়ে লবঙ্গলতার শাসন বাক্য মনে পড়িল। মনে মনে আপনাকে

জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি কি রজনীর কোন ক্ষতি করিতেছি? না সে যাহা চায় তাহাই করিতেছি?

[অন্ধ রজনীকে হীরালাল নদীর চরে নামাইয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। গ্রামে কুটুম্ব বাড়িতে নিমন্ত্রণে যাওয়ার পথে অমরনাথ নিঃসঙ্গ এবং বিপদাপন্ন রজনীকে কিভাবে দস্যুর হাত হইতে উদ্ধার করে, সেই ঘটনা অতঃপর বিবৃত হইয়াছে। রজনীর নিকট অমরনাথ সেখানে জানিতে পারে যে রজনীর পিতার নাম রাজচন্দ্র দাস।]

রজনীর নিকট হইতে ঠিকানা জানিয়া লইলাম। ঠিকানা বলিতে রজনী নিতান্ত অনিচ্ছুক, কিন্তু আমাকে অদেয় তাহার কিছুই ছিল না, কেন না আমি প্রায় আপনার প্রাণ দিয়া তাহার ধর্ম রক্ষা করিয়াছিলাম।

রজনী আপাততঃ সেইখানেই [গ্রামে, অমরনাথের কুটুম্ব গৃহে] রহিল। আমি রাজচন্দ্র দাসের অনুসন্ধানে কলিকাতায় গেলাম। তাহার সঙ্গে কথোপকথনে জানিলাম যে রজনী হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বটে।

তখন আমি রজনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম। এক নিভৃত গৃহে তাহাকে স্থাপিত করিলাম। সে আমার কাছে স্বীকৃতা হইল যে, সে গৃহ হইতে বাহির হইবে না। বা কাহাকেও দেখা দিবে না। তৎপরে আমি প্রমাণ সংগ্রহে যাত্রা করিলাম। পুনরপি গোবিন্দকান্তবাবুর কাছে গেলাম। বালার মোকদ্দমার সন্ধান তাঁহারই কাছে প্রাপ্ত হই। সে মোকদ্দমা বর্ধমানে হয়। তাহার সাহায্যে অন্যান্য প্রমাণও সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম। বিস্তারে প্রয়োজন নাই।

এখন মোকদ্দমা করিলে রজনী যে বিষয় পাইবে তাহা নিশ্চিত বুঝিলাম। আমার অভিপ্রায়, রজনীকে বিবাহ করি। কিন্তু আশ্চর্য! রজনী, আমার জন্য প্রাণদানেও সম্মতা, তথাপি বিবাহ করিতে সম্মতা হইল না। ভাবগতিকে বুঝিলাম যে আমি যদি পীড়াপীড়ি করি, তবে আত্মহত্যা করিবে।

কিন্তু যদি আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ না হইল, তবে তাহার বিষয়োদ্ধারে আমার ইষ্ট কি? আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, বিষয়োদ্ধারেও রজনী নিতান্ত অসম্মতা। পরিশেষে, আমার অনুরোধে তাহাতে সম্মত হইল—তাহার উদ্ধারার্থে আমি যে আহত হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া, আমার অনুরোধে সম্মত হইল। বিষয়োদ্ধারের পর বিবাহ করিবে, এমত ভরসাও পাইলাম। এবং ইহাও স্বীকার করিল যে, যতদিন না বিবাহ হয়, ততদিন সে আমার গৃহে, আমার পত্নীপরিচয়ে থাকিবে। বহু কষ্টে এ সকল কথা তাহাকে

স্বীকার করাইলাম। আমাকেও স্বীকার করিতে হইল যে, যত দিন না বিবাহ হয়, ততদিন আমি তাহাকে পরস্ত্রী বিবেচনা করিব।

কেবল আমার ঋণ পরিশোধার্থ রজনী এতদূর স্বীকার করিয়াছিল। তাহার পরে সে কি প্রকারে যে ফাঁকি দিল, তাহা বলিয়াছি।

রজনীর শান্তিপুরে যাইবার কথা রাজচন্দ্র দাসকে কাজে কাজেই বলিতে হইল। শুনিয়া রাজচন্দ্র বলিল যে, তবে আমি আর কি সম্বন্ধে এখানে থাকি? আমাকেও বিদায় দিন।

অগত্যা তাহাও স্বীকার করিতে হইল। রাজচন্দ্রকে একটি বাড়ি কিনিয়া দিলাম। কিছু কিছু মাসিক দিতে স্বীকৃত হইলাম। রাজচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া নূতন বাড়িতে গিয়া বাস করিতে লাগিল। রজনীকেও সেইখানে লইয়া যাইবার জন্য সে অনেক যত্ন করিল. কিন্তু কিছুতেই রজনী সম্মতা হইল না। সে শান্তিপুরে গেল।

আমি তখন একা— একা কি করিলাম? এই কণ্টকময় জীবনারণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আপাততঃ কলিকাতাতেই রহিলাম। দেখিব, লোকালয়ে কি সুখ। লোকের সঙ্গে মিশিতে লাগিলাম। লোকও আমার সঙ্গে মিশিতে লাগিল। অনেক লোক আমার বশীভূত হইতে লাগিল। কাহাকে কথায় বশ করিলাম, শুধু মিষ্ট কথায়, কাহাকে আলাপে; কাহাকে অর্থের দ্বারা বশ করিলাম, অর্থাৎ কাহাকে অল্প অল্প নগদ দিলাম, কাহাকে ঋণের আশায় রাখিলাম। কাহাকেও ঋণ দিলাম না—কর্জ লইলেই শত্রু হয়। কাহাকে কেবল পরামর্শ দিয়া বাধ্য করিলাম—কাহারেও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া আরও বাধিত করিলাম। কাহারও পীড়ার সময়ে আত্মীয়তা করিয়া আত্মীয় করিয়া তুলিলাম,—কাহারও সুখের দিনে সুখ বাড়াইয়া দিয়া অনুগত করিয়া লইলাম। কাহারও বক্তৃতা লিখিয়া দিলাম—লোকের কাছে প্রকাশ করিলাম না;—কাহারও সুখ্যাতি সংবাদপত্রে লিখিয়া তাহাকে ক্রীতদাস করিলাম—কাহারও শত্রু-নিন্দা লিখিয়া আরও আপ্যায়িত করিলাম। কাহারও কাছে মিষ্ট গল্প করিয়া বন্ধু করিয়া লইলাম—কাহারও অমিষ্ট গল্প নীরবে কান পাতিয়া শুনিয়া তাহাকে প্রেমডোরে বাঁধিলাম। কাহাকে হাস্য পরিহাসে প্রীত করিলাম; কাহারও রসশূন্য পরিহাসে হাসিয়া কিনিয়া রাখিলাম। কেহ আমাকে ধার্মিক ভাবিয়া ভালবাসিল—কেহ আমাকে তাহার আপনার মত অধার্মিক বলিয়া ভালবাসিল। কেহ কোন জ্ঞাতি বা অন্য শত্রুর নিন্দা করিতে ভালবাসিত, আমি বিনা আপত্তিতে তৎকৃত জ্ঞাতিনিন্দা শুনিতাম;—কেহ আপনার

কুচরিত্রা পত্নীর বা কুপুত্রের বা ততোধিক নিন্দার্হ কোন প্রেমাস্পদীভূত বা প্রেমাস্পদীভূতার সুখ্যাতি করিতে ভালবাসিত, তাহাও কান পাতিয়া শুনিতাম; উভয়েরই প্রিয় হইলাম। পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খের কাছে কতকগুলা গ্রন্থের নাম করিয়া পূজ্য হইলাম—যথার্থ পণ্ডিতদিগের সারগর্ভ বাক্যের মর্মগ্রহণে যত্ন করিয়া তাঁহাদিগেরও শ্রদ্ধা লাভ করিলাম। অনেকেই শুধু আমার গাড়ি জুড়ি বাড়ি দেখিয়া গোলাম হইল। কেহ বা সে সকলের নিন্দা করিয়া আপনার ঐশ্বর্য ইঙ্গিতে জানাইতেন, আমি সে নিন্দা প্রকারতঃ স্বীকার করিতাম—সুতরাং তাঁহাদিগেরও আমি প্রিয় হইলাম। কেহ কেবল আমার গাড়ি ঘোড়াতে চড়িয়াই বাধ্য। অল্প দিন মধ্যেই শুনিতে পাইলাম যে, অমরনাথ ঘোষ কলিকাতায় একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক—সকলেরই প্রিয়! অল্পকাল মধ্যে দেখিলাম আত্মীয় লোকের জ্বালায় আমার স্নানাহারেরও অবকাশ নাই।

কাহারও কিছু কাড়িয়া লইব, কাহাকেও বঞ্চনা করিব, পাকচক্রে বড়লোক হইব—এরূপ কোন অভিসন্ধিতে আমি এ জাল পাতিলাম না। আমি যাহা হই—আমাকে যদি ক্ষুদ্র প্রবঞ্চক মনে করিয়া থাক, তবে ভুলিয়াছ। রজনীর সম্পত্তি আমি বঞ্চনা করিয়া লই নাই—সে ইচ্ছাপূর্বক আমাকে দিয়াছে—যে দিন চাহিবে সেই দিন প্রত্যর্পণ করিতে রাজি আছি। শচীন্দ্রের সম্পত্তি ন্যায়ানুসারে রজনীর—তাহাতেও কাহাকে প্রবঞ্চনা করি নাই। এখনও কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা জনসমাজকে প্রবঞ্চনা করিব, সে অভিপ্রায় রাখিতাম না।

তবে কেন এ জালবিস্তার? কেবল লোকালয়ে কি সুখ তাহা দেখিব, এই কামনায়। তাহা দেখিলাম; ইহা অপেক্ষা অরণ্য ভাল। এখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এ বিষয় সংগ্রহ করিলাম? রজনী ইহা পুনর্গ্রহণ করুক—লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করুক।

চতুর্থ খণ্ড: পুনর্বার শচীন্দ্র বক্তা

[এই খণ্ডে শচীন্দ্রের পীড়ার কথা বিবৃত হইয়াছে। পীড়ার ঘোরে শচীন্দ্র শুধুই বলে—ধীরে রজনী ধীরে। তাহার হৃদয়-মন্দিরে এখন শুধু রজনী আর রজনী।]

পঞ্চম খণ্ড : লবঙ্গলতার উক্তি

[শচীন্দ্রের এই ব্যাধির কারণে লবঙ্গলতা অতিশয় উদ্বিগ্ন ।]

রজনী কি করিয়াছে ? তা জানি না, কিন্তু রজনীর সঙ্গে এ চিত্তবিকারের কোন সম্বন্ধ নাই কি ? না থাকিলে সর্বদা রজনীর নাম করে কেন ?

[রজনীকে একবার শচীন্দ্রের নিকট আনিবার জন্য লবঙ্গ লোক পাঠায় ।]

দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল রজনী গৃহে নাই । অনেক দিন হইল স্থানান্তরে গিয়াছে । অমরনাথ বাড়ি আছে ।

শুনিয়া বিস্মিত হইলাম । স্থানান্তরে কোথায় গিয়াছে, কবে আসিবে, দাসী তাহা কিছুই বলিতে পারিল না । পরের ঘরের কথা, অত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেও পারি না । মনেও বড় সন্দেহ হইল । স্থূল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইলাম । কাহার নিকট জানিব ?

স্বয়ং অমরনাথ ভিন্ন আর কাহার নিকট জানিব ?

কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, অমরনাথকে কোথায় পাইব ? তাহার গৃহে স্ত্রীলোক নাই—আমি তাহার গৃহে যাইতে পারিব না । তবে কৌশলে অমরনাথকে আমাদিগের গৃহে আনা যায় । সেই কৌশলের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলাম ।

[ইহার আগে লবঙ্গ শচীন্দ্রের নিকট বসিয়া কথা প্রসঙ্গে কৌশলে জানিয়া লইতে চাহিল তাহার অসুখের সঙ্গে রজনীর কোনও প্রকার সম্পর্ক আছে কিনা ?]

একটা কথা স্থির হইল—রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের মনের ভাব যাহাই হউক—তাহার রাগ নাই । রাগ নাই, তবে কি—অনুরাগ ? তাও কি সম্ভবে ? অন্ধের প্রতি ? আবার এত দিনের পর ? যখন রজনী নিকটে ছিল—সুপ্রাপণীয়া ছিল, তখন ত ইহার কোন লক্ষণ দেখি নাই—এখন কেন হইবে ?

যাহা হউক, একবার রজনীকে আনিয়া বাছাকে দেখাইতে হইতেছে । উপায় কি ? তখন, কর্তার কাছে গেলাম । তাঁহাকে আমার মনের সন্দেহ সকল আভাস ইঙ্গিতে নিবেদন করিলাম । রজনীর যে সন্ধান করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছি, তাহাও বলিলাম । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে উপায় কি ? আমি বলিলাম, 'অমরনাথ ভিন্ন সবিশেষ সন্ধান আর কেহ বলিতে পারিবে না । তুমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আন ।' তিনি প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু আমার কথা কতক্ষণ ঠেলিবেন ? তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে স্বীকার করিলেন ।

অমরনাথও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, যদি উঁকি ঝুঁকি মারিয়া আমাকে একবার

দেখিতে পান সে লোভ ছিল। পরদিন প্রাতে আসিয়া, অমরনাথ সশরীরে আমাদিগের ক্ষুদ্র গৃহে দর্শন দিলেন। আমি স্বামীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে অনুমতি লইয়া অমরনাথের মনের সাধ পুরাইবার জন্য—তাহার আহারের নিকট পুতনা হইয়া বসিলাম। পুতনা—কেন না, বিষপান করাইবার ইচ্ছা বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু যেখানে বাক্য-বিষ আছে সেখানে অন্য বিষের প্রয়োজন কি?

নারী-জন্ম যেন কেহ গ্রহণ করে না। না করিতে হয় এমন কাজ নাই। যাহাতে মনের বড় বিরাগ, হাসিতে হাসিতে তাহাও করিতে হয়। বিষ, অমৃত উভয়ই প্রয়োগ করিতে হয়। সর্পী আমাদিগের অপেক্ষা ভাল—তাহার অমৃত নাই—কেবল বিষ আছে। সে ইচ্ছাধীন বিষপ্রয়োগ করে। লোকে সর্পীকে চিনে, তাহার নিকট দিয়া কেহ পথ হাটে না। নারী-সর্পীর অমৃত আছে—সেই লোভে তাহার নিকটে আসিয়া মূর্খ পুরুষজাতি অনায়াসে দংশিত হয়—বিশ্বাস-ঘাতিনী নারী অনায়াসে দংশন করে। হায়! লবঙ্গসর্পীর কি হইবে?

আমি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রজনী কোথায়?'

এটি যেন দুম্ করিয়া কামান দাগিলাম। অমরনাথ বিত্রস্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কথা কও না যে?'

অমর। এ কথা জিজ্ঞাসা কর কেন?

আমি। রজনীর সঙ্গে জানাশুনা ছিল, তাহাকে ভালবাসিতাম—না জিজ্ঞাসা করিব কেন?

অমর। স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাকে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ—সে কোথায় এ কথা জিজ্ঞাসা কেন?

আমি। রজনী তোমার ঘরে নাই, ইহা আমার কাছে বিশেষপ্রসিদ্ধ; কাল লোকের দ্বারা খবর আনিয়াছি, এজন্য জিজ্ঞাসা করি।

অমর। তবে সে স্থানান্তরে গিয়াছে।

আমি। কোথায় সে স্থানান্তর?

অমর। আমি যদি না বলি?

আমি। আমি যদি সকল কথা বলি?

অমর। তাহা হইলে আমার অনিষ্ট হইবে। তুমি এতদিন আমার যে অনিষ্ট কর নাই, এখন যে তাহা করিবে ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। তুমি আমাকে কেবল ভয় দেখাইতেছ, ইহা বুঝিয়াছি।

আমি। এখন তুমি আমার অনিষ্ট করিতেছ, আমি তোমার অনিষ্ট না করিব কেন?

অমরনাথ চমকিয়া উঠিল—'তোমার অনিষ্ট আমি কখন স্বপ্নেও কামনা করি না। তবে রজনীর বিষয়োদ্ধারের কথা যদি বল—'

আমি হাসিলাম। অমরনাথ বলিল, 'তা জানি। সে অনিষ্টের জন্য তোমাদিগের রাগ নাই। তবে তোমার কি অনিষ্ট?'

আমি। আমার পুত্রের অনিষ্ট।

অমর। শচীন্দ্রবাবুর? বিষয়ক্ষতি ভিন্ন আর কি অনিষ্ট করিয়াছি?

আমি। যদি তুমি মনোযোগ দিয়া সকল কথা শুন, তবে আমি বিশেষ বৃত্তান্ত বলি।

অমর। এক্ষণে আহারে আমার বিশেষ মনোযোগ।

আমি। আমি যাহা বলিব তাহাতে তোমার আহার বন্ধ হইয়া যাইবে।···

অমরনাথ হাসিল এবং বলিল, 'ধমক চমক কেন? কাজটা কি করিতে হইবে সহজে বল না? রজনীর সন্ধান বলিয়া দিতে হইবে?'

আমি। তাহা হইলে এক্ষণে যথেষ্ট হইবে।

অমর। সহজ কথা; সে এক্ষণে কাশীবাস করিতেছে। বাঙ্গালীটোলা গোপাল অধিকারীর বাড়িতে আছে।

আমি। এ কথা যদি মিথ্যা হয়?

অমর। যদি মিথ্যা হয়, তবে তুমি আমার কি করিবে?

আমি। এই কলিকাতা নগর মধ্যে রাষ্ট্র করিব যে, অমরনাথ চোর—চোর বলিয়া তাহার পিঠে লেখা আছে। পুলিস গিয়া কামিজ খুলিয়া পিঠ দেখিবে।

অমর। তুমি কি তাহাতে রজনীকে পাইবে?

আমি। না।

অমর। তবে?

আমি। তাইত! আহার কর।

অমরনাথ আহার সমাপন করিয়া আচমন করিল।

আচমনান্তে অমরনাথ বলিল, 'সত্য কথা তোমাকে বলি নাই। ধমক চমকে সত্য কথা আমি বলিব না—তত কাপুরুষ নই। তুমি আমার অনিষ্ট করিতে পার সত্য; তাহাতে তোমার লাভ হইবে না—আমার ক্ষতি হইবে। সত্য সত্য তুমি

আমার অনিষ্ট করিবে কি? একথা সত্য বলিও—আমি আন্তরিক সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমিও আন্তরিক সরলভাবে উত্তর দিও।'

অমরনাথ অতি বিনীতভাবে, সরল মধুরভাবে এই কথা বলিল। আমিও আর কপটতা করিতে পারিলাম না—আমি বলিলাম, 'না—তোমার অনিষ্ট করিব না—অনেক অনিষ্ট করিয়াছি—একথা আন্তরিক বলিতেছি। তুমি আমার উপকার করিলে না—না কর, আমি তোমার অনিষ্ট করিব না।'

অমরনাথের চক্ষে জল আসিল। গদগদ স্বরে অমরনাথ বলিল, 'লবঙ্গলতা তুমিই জিতিলে। আমি আবার হারিলাম। আমায় বিশ্বাস কর। আমায় কি বিশ্বাস করিতে পার?'

সে ত কঠিন কথা! যে তেমন গুরুতর অবিশ্বাসের কাজ করিয়াছিল, তাহাকে আবার বিশ্বাস করিব কি প্রকারে? কিন্তু সংসার অবিশ্বাসে চলে না। কেহ চিরদিন বিশ্বাসী নহে—কেহ চিরদিন অবিশ্বাসী নহে। কেন আবার অমরনাথকে বিশ্বাস করিব না? তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম—দেখিলাম সর্বাঙ্গ সুন্দর সরল বিশ্বাসভূমি। আমি বলিলাম, 'তোমায় বিশ্বাস করিব। শোন, যাহা আমার বলিতে বাকি আছে, বলি।'

এইকথা বলিয়া আমি তখন শচীন্দ্রের এই রোগের বিবরণ অদ্যোপান্ত বলিলাম। শচীন্দ্র যে সর্বদা প্রলাপকালে রজনীর নাম করে, তাহাও তাহাকে বলিলাম। যে জন্য রজনীর সন্ধান করিতেছিলাম, তাহাও বলিলাম। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অমরনাথ অনেকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, 'আজ আমি চলিলাম—আবার একদিন আসিতেছি, শীঘ্রই আসিব। আসিলে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ত?'

আমি। হইবে।

অমর। এইরূপ নির্জনে?

আমি। যদি আবশ্যক হয়, তবে তাহাও পারি।

অমর। তাহাতে তোমার স্বামী তোমার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না ত?

আমি চমকিয়া উঠিলাম। সন্দেহ? গুরুদেব জানেন! দ্রৌপদী সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন, প্রদ্যুম্ন শাম্ব তোমার পুত্র সম্বন্ধ হইলেও স্বামীর অসাক্ষাতে তাহাদের কাছে থাকিও না—আমি অমরনাথের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গোপনে সাক্ষাৎ করিলে

তিনি অবিশ্বাস না করিবেন কেন? বিশেষ আমি সপত্নীর ঘর করি! আমি যুবতী, আমার স্বামী বৃদ্ধ, অমরনাথ যুবা, আবার পূর্ব হইতে আমাতে অনুরক্ত—কেন সন্দেহ করিবেন না? আমি আপনিই কেন সন্দেহ করিতেছি না? অমরনাথ আজি আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেলিয়াছে—আমিও তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছি। দোষ নাই বটে, কিন্তু পাপ ছদ্মবেশেই প্রথম প্রবেশ করে। আমি কুলের বউ—ঘরের ভিতর থাকাই ভাল।

এই ভাবিয়া অমরনাথকে বলিলাম, 'যদি সে-কথা মনে করিলে, তবে আমার সঙ্গে তোমার আর সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। যতদিন তোমাকে অবিশ্বাস করিয়াছি—ততদিন দেখা সাক্ষাতে ক্ষতি ছিল না—আজি তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি—আজি হইতে তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করা কর্তব্য নহে।'

এই কথা বলিয়া, আমি অমরনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম—মনে করিলাম বুঝি সে বলিবে যে, 'তোমার বিশ্বাস তুমি ফিরাইয়া লও।' অমরনাথ তাহা বলিল না—আমি সন্তুষ্ট হইলাম—এবং বুঝিতে পারিলাম যে, অমরনাথও আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইল।

অমরনাথ বলিল, 'সাক্ষাৎ করা কর্তব্য নহে, আমি যেমন করিয়া হয়, তোমার কার্য সিদ্ধ করিব। তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব—আমার একটি ক্ষুদ্র ভিক্ষা আছে—এখন বলিব কি?'

আমি। কি?

অমর। না এখন না—আর একবার দেখা দিও—সেই সময় বলিব।

অমরনাথ প্রসন্নচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিল।

[পরদিন শচীন্দ্রের ব্যাধি লইয়া সন্ন্যাসীর সহিত লবঙ্গর যখন কথাবার্তা হইতেছে, সেই সময় রজনী লবঙ্গদের অন্তঃপুরে আসিয়া প্রবেশ করিল।]

রজনী অনিষ্টকারিণী কি ইষ্টকারিণী হইয়া আসিল, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যে অমরনাথকে বিশ্বাস করিয়া ভুল করি নাই, ইহা বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম।

অমরনাথ অবিশ্বাসী থাকিলেই আমার পক্ষে ভাল হইত? কোন্ মূর্খে একথা বলিবে? কন্দর্পের রূপ আর হরিশ্চন্দ্রের সত্যপরায়ণতা একত্রিত হইলেও ললিত-লবঙ্গলতা ললিতলবঙ্গলতাই থাকিবে। ইহলোকে লবঙ্গলতার এই গর্ব।

ষষ্ঠ খণ্ড : অমরনাথ বক্তা

[একদিন, যখন আর কেহ শচীন্দ্রের নিকট ছিল না, তখন অমরনাথ ধীরে ধীরে বিনা আড়ম্বরে রজনীর কথা তাহার নিকট পাড়িল।]

আমি বলিলাম, 'আমি আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য, তাহাকে আপনার স্ত্রী পরিচয়ে আপনার গৃহে রাখিয়াছিলাম। রজনীর সম্মতিক্রমেই রাখিয়াছিলাম। সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেইজন্য আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করার সহায়তা করিতে সম্মত হইল। কিন্তু আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে, সে আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মতা হইয়া, আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।'

শচীন্দ্র। তারপর বিবাহ হইল কি প্রকারে ?

আমি বলিলাম. 'বিবাহ হয় নাই। রজনী আমার স্ত্রী নহে।'

শচীন্দ্র প্রথমে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, তাহার পর তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

আমি তখন শচীন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া কথা আরম্ভ করিলাম। যে প্রকারে রজনার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ যে প্রকারে তাহাকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা বিবৃত করিলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্রও আমার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলেন। বলিলেন, 'আপনি বলিলেন, রজনা আপনা কর্তৃক পীড়িতা হইয়াছে। পীড়িতা নহে, বিশেষ উপকৃতাই হইয়াছিল।'

আমি বলিলাম, 'পরে শুনুন।' তখন আমি অবশিষ্ট কথা বলিলাম। যে প্রকারে রজনীর উত্তরাধিকারিণীত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম, যে প্রকারে রজনীর সন্ধান পাইয়াছিলাম, যে প্রকারে তাহার বিষয় উদ্ধারের জন্য যত্ন করিয়াছিলাম, যে প্রকারে সে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া আমার মতে সম্মত হইয়া আমার স্ত্রী-পরিচয়ে আমার গৃহবাসিনী হইয়া রহিল, তাহাও বলিলাম। তাহার পর যে প্রকারে রজনী আমাকে বিষয় দান করিয়া, আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মতা হইয়া, আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও বলিলাম।

শুনিয়া শচীন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, 'মহাশয়, এ সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন ?' আমি বলিলাম, 'আমি যে ধন সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষী তাহা আমার হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে রজনা আশ্রয়শূন্যা। তাহার কোন উপায় আমি করিতে পারিতেছি না।'

শচীন্দ্র বলিলেন, 'সেজন্য আপনি কাতর হইবেন না। যে অন্ধ অবলা স্ত্রী বঞ্চক কর্তৃক বঞ্চিত, তাহাকে আশ্রয় দানে আমার পিতা অদ্যাপি অক্ষম হয়েন নাই, অথবা বিমুখ হইবেন না।'

আমি বলিলাম, 'আশ্রয় যেখানে সেখানে পাইতে পারে। কিন্তু আমার দোষে তাহার বিবাহের পথ বন্ধ হইয়াছে।' যাহাকে লোকে আমার পত্নী বলিয়া জানে, এখন আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয়, এমন লোক পাওয়া ভার। যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে, সেইজন্য আপনাকে এত কথা বলিতেছি।'

শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিলেন, 'যদি আপনার কথা সত্য হয়, তবে রজনীর পাত্রের অভাব নাই। কিন্তু আপনার কথা সত্য কি না, তাহা কি প্রকারে জানিব? রজনী ত এসকল কথা এতদিন কিছু বলে নাই।'

আমি বুঝিলাম, রজনীর বরপাত্র কে। বলিলাম, 'রজনীকে আজি জিজ্ঞাসা করিবেন। আপনি স্বয়ং জিজ্ঞাসা না করিয়া, আপনার বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিবেন। বলিবেন, আমি সকল কথা প্রকাশ করিতে অনুমতি করিতেছি।'

[পরদিন পুনরায় মিত্রদের বাড়িতে গিয়া অমরনাথ লবঙ্গলতার সঙ্গে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করে যে গতকাল শচীন্দ্রকে যে কথা বলিয়া গিয়াছে তাহা সে শুনিয়াছে কি না।]

লবঙ্গ। শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয় পাষণ্ড।

আমি। সে কথা কে অস্বীকার করিতেছে? কিন্তু আমার কথায় বিশ্বাস হয় কি?

লবঙ্গ। কেবল তোমার কথায় বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু রজনীকে জিজ্ঞাসা করায়, সে সমুদায় বলিয়াছে। তাহার কথায় বিশ্বাস করি।

আমি। তাই বা কেন কর? মনে কর তাহাকে আমি এ সকল কথা শিখাইয়া আনিয়াছি।

লবঙ্গ। কি অভিপ্রায়ে তুমি শিখাইবে?

আমি। মনে কর আমাদের যথার্থ বিবাহ হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে উভয়ে উভয়ের উপর বিরক্ত। উভয়ে উভয়কে ছাড়িতে চাহি। বিবাহ অস্বীকার ভিন্ন, ইহার আর উপায় কি?

লবঙ্গলতা ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, 'যে চুরি করে, সে গৃহস্থকে ডাকিয়া বলে না যে আমি চুরি করিতেছি।'

আমি। চোরের অনেক কৌশল।

লবঙ্গ। তুমি অনেক কৌশল জান বটে, কিন্তু রজনী তত জানে না। রজনী যে-প্রকারে বলিল, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইল। সত্য কথা না হইলে, সে তত সবিস্তারে বলিতে পারিত না।

আমি। শিখাইলে বিচিত্র কি? আদালতে সাক্ষী জোবানবন্দি দেয় কি প্রকারে? শিখিলে সকলেই মিথ্যা কাহিনী সবিস্তারে বলিতে পারে।

লবঙ্গ। রজনী তোমার শিক্ষামতে কখন পারে না। কেন না, তুমি শিখাইলে, কোন না কোন কথায় আমি বুঝিতে পারিতাম যে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি শিখাইয়াছে। রজনী যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম যে, অন্ধ অন্ধের জ্ঞানমত সকল বলিতেছে।

আমি। তুমি দ্বিতীয় বেন্থাম বোধ হয়। সত্য সত্যই কি তুমি এ-কথা বিশ্বাস করিয়াছ?

লবঙ্গ। সত্য-সত্যই বিশ্বাস করিয়াছি।

আমি। শচীন্দ্র?

লবঙ্গ। তার আরও বিশ্বাস।

আমি। ভালই হইয়াছে। এক্ষণে রজনী আমার গৃহে যাইতে অসম্মত। তাহার বিবাহ সুকঠিন। আমি কি তোমাদিগকে নিঃস্ব করিয়া, রজনীকেও তোমাদিগের গলায় ফেলিলাম না কি?

লবঙ্গ। তুমি বিশেষ দয়ালু ব্যক্তি দেখিতে পাই। বিশেষ আমাদিগের ধন-সম্পত্তির উপর তোমার বড় মায়া। কিন্তু রজনীর জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না, সে আমাদিগের গলায় পড়িবে না।

আমি। তবে তাহার কি উপায় করিবে? জিজ্ঞাসায় রাগ করিও না। আমার একটু প্রয়োজন আছে।

লবঙ্গ। আমরা তাহার বিবাহ দিব।

আমি। সে বড় কঠিন। তোমাদের কথায় তাহাকে কুমারী মনে করিয়া বিবাহ করিবে, এমন লোক কি আছে?

লবঙ্গ। আছে।

আমি। থাকিতে পারে। এমন অনেক লোক আছে যে তাহাদের অক্ষ

প্রকারে বিবাহের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সে প্রকারের লোককে কি রজনী বিবাহ করিবে?

লবঙ্গ। যে পাত্র স্থির হইয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে রজনী রাজি হইয়াছে।

আমি। বটে? কে সে?

লবঙ্গ। আমার পুত্র শচীন্দ্র।

আমি। কাণাকে!

লবঙ্গ। কাণাকে। যাহাতে অমরনাথবাবু অনিচ্ছুক ছিলেন না, তাহাতে অন্যেও ইচ্ছুক হইতে পারে।

আমি বিস্মিত হইলাম না, কেন না শচীন্দ্র যে রজনীতে অনুরক্ত তাহা পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম। আমি নীরব হইয়া রহিলাম।

লবঙ্গকে [কিয়ৎকাল পরে] বলিলাম, 'আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই তোমার সঙ্গে এ সাক্ষাতের প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমি সরলান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিব, তুমিও সরলান্তঃকরণে উত্তর দিবে। আমি এই কলকাতা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তুমি কি যথার্থ সুখী হও?'

লবঙ্গ। সরলান্তঃকরণেই উত্তর দিব—যথার্থ ই সুখী হই। কেন না, তোমাকে যেমন করিতে চাহি, তুমি সেরূপ হইলে না। অতএব তোমাকে না দেখিলেই ভাল থাকি।

আমি। তুমি আমাকে কিরূপ দেখিতে চাও?

লবঙ্গ, কয়েকটা কথায় এক ঋষির চিত্র আঁকিল—জিতেন্দ্রিয়, অস্বার্থপর, পরোপকারী, বৈরাগী,— আমি বলিলাম, 'আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল করিতে চাও? আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল না দেখিলে দুঃখিত হও?'

[লবঙ্গ এ-কথার স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে না। 'যদি লোকান্তর থাকে—' বলিয়াই চুপ করিয়া যায়।]

আমি বলিলাম, 'রজনী আমাকে তাহার সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিল। সে দানপত্র এই। আমি রজনীর বিষয় পরিত্যাগ করিতেছি। এই সে দানপত্র তোমারই সম্মুখে নষ্ট করিতেছি।'

আমি সেই দানপত্র বাহির করিয়া লবঙ্গের সম্মুখে বিনষ্ট করিলাম।

লবঙ্গ বলিল, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমি তোমাকে অনর্থক বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু এ দানপত্র রেজিস্টরী হইয়াছিল কি?'

আমি। হইয়াছিল।

লবঙ্গ। শুনিয়াছি, রেজিস্টরী হইলে আর একটা নকল সরকারিতে থাকে।

আমি। এ দানপত্রেরও তা আছে। এইজন্য আমি আর একখানা দানপত্রে কাল দস্তখত করিয়া রেজিস্টরী করিয়া আনিয়াছি। ইহার দ্বারা আমার সমুদায় স্থাবর-সম্পত্তি আমি [যে ব্যক্তি রজনীকে বিবাহ করিবে, তাহাকে] দিতেছি।

লবঙ্গ। রজনী যাহা তোমাকে দিয়াছিল তাহা তোমার তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত। এক্ষণে তোমার মতি ফিরিয়াছে বলিয়া, তুমি তাহার বিষয় তাহাকে ফিরাইয়া দিতেছ। ইহা আমার পক্ষে বিস্ময়কর বটে, কিন্তু তবু বুঝিতে পারি। কিন্তু আমি জানি তদ্ভিন্ন তোমার নিজেরও অনেক জমিদারী আছে। তাহাও রজনীর স্বামীকে দিতেছ কেন?

[সে কথার উত্তর না দিয়া অমরনাথ বলে—বিবাহের পর রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও।] যদি ইহার অন্যথা কর তবে তোমার স্বামীর শপথ লাগিবে।

[এই কথা বলিয়া লবঙ্গের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া অমরনাথ বাহিরে আসিয়া একেবারে কাশ্মীরের পথে যাত্রা করে। ইহার দুই বৎসর পর অমরনাথ দেশে ফিরিয়া আসিলে শচীন্দ্র, শচীন্দ্রের চক্ষুষ্মতী স্ত্রী রজনী ও তাহাদের শিশু-সন্তানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। অমরনাথ শচীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে—ইহার নাম কি রাখিয়াছেন? শচীন্দ্র বলে—অমরপ্রসাদ।]

বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি অচলিত গ্রন্থের বিবরণ

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রথম ভাগের ভূমিকায় বলেছিলেন, "ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচনা' নামে আর কতকগুলি 'প্রবন্ধ পুস্তক' নামে প্রকাশিত করা গিয়াছিল। এক্ষণে উভয় গ্রন্থই অপ্রাপ্য। দুইখানি পৃথক সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সংকলন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ' নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্ব্বে 'বিবিধ সমালোচনে' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তকে' প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে।" 'বিবিধ সমালোচনা' গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'বিবিধ সমালোচন'। ১৮৭৬-এ বিবিধ সমালোচন এবং ১৮৭৯-তে প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ সালে বঙ্কিম নিজের ওই দুটি গ্রন্থকে 'অপ্রাপ্য' বলে ঘোষণা করলেও আমরা একালে বসেও তাঁর গ্রন্থ দুখানির সন্ধান পেয়েছি।

বিবিধ সমালোচন গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

বিবিধ সমালোচন।

(বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্ম্মুদ্রিত)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৬।

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪। সূচীপত্র নিম্নরূপ—

বইয়ের ভূমিকা ('বিজ্ঞাপন') নিম্নরূপ—

বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে স্থানে পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূল কথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয় বিবিধ সমালোচনের তিন বৎসর পর। প্রবন্ধ পুস্তক গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করি—

প্রবন্ধ পুস্তক।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৮৶০ মাত্র।

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৮। সূচীপত্র নিম্নরূপ—

বইয়ের ভূমিকা ('বিজ্ঞাপন') নিম্নরূপ—

এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল, তাহা সকলই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিত্যাগ করা গিয়াছে। কখনও বা প্রবন্ধের নাম পরিবর্তন করা গিয়াছে।

এই জাতীয় আরও কয়েকটি মৎপ্রণীত প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে সেগুলি এক্ষণে পুনর্মুদ্রাঙ্কনের অযোগ্য বিবেচনা করিলাম। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে তাঁর বইগুলির দাম কি রকম ছিল?

প্রবন্ধ পুস্তকের শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন গ্রন্থের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছিল একটি

স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায়। এই বিজ্ঞাপন থেকে তাঁর বইগুলি কোথায় কিনতে পাওয়া যেত এবং কোন্ বইয়ের কি দাম ছিল জানা যায়। বঙ্কিম-প্রণীত গ্রন্থগুলি নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যেত—

বঙ্গদর্শন কার্যালয়—কাঁটালপাড়া; সংস্কৃত ডিপজিটরি—৩নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা; মিত্র কোম্পানি—১নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা; কেনিঙ লাইব্রেরি—পটলডাঙ্গা কলিকাতা; পদ্মচন্দ্র নাথ—চীনাবাজার কলিকাতা; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বঙ্কিমচন্দ্র-প্রণীত বইগুলির দাম ছিল সে-সমস এইরূপ—

প্রবন্ধের বই : প্রবন্ধ পুস্তক—চৌদ্দ আনা; বিজ্ঞানরহস্য—দশ আনা; বিবিধ সমালোচন—বার আনা; সাম্য—ছয় আনা; কমলাকান্তের দপ্তর—বার আনা; লোকরহস্য—বার আনা।

কবিতা : কবিতা পুস্তক—দশ আনা।

উপন্যাস : দুর্গেশনন্দিনী—এক টাকা চার আনা, কপালকুণ্ডলা—এক টাকা; মৃণালিনী—এক টাকা দুই আনা; বিষবৃক্ষ—এক টাকা দুই আনা; চন্দ্রশেখর—এক টাকা দুই আনা; রজনী—বার আনা; কৃষ্ণকান্তের উইল—এক টাকা দুই আনা; উপকথা (ইন্দিরা যুগলাঙ্গুরীয় রাধারাণী একত্রে)—আট আনা।